পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ

চিত্তরঞ্জন দেব

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা * * *

পিতৃ পিতামহের

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

আশা রইল ভবিষ্যতে এইরকম কোন সুযোগ এলে আমাদের সংগৃহীত পূর্ববঙ্গের অবশিষ্ট গানগুলিও আপনাদের কাছে উপস্থিত করতে পারব।

আশার কথা, লোক-সাহিত্য সেদিনের মত আজ আর অপাংতেয় নয়। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিষয়ে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে পঠন পাঠন শুরু হয়েছে। জানিনা আমাদের এই প্রচেষ্টা তাদের কোন কাজে আসবে কিনা।

পুনরায় লোক-সংগীত ও সাহিত্য-প্রিয় জনসাধারণের কাছে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে আমাদের বক্তব্য শেষ করলাম

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

কার্যোপলক্ষে পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণের সময় আমি মুগ্ধ হয়ে যাই এঁদের স্বতঃস্ফূর্ত গানে। কখনও দেখেছি ক্ষেতে কাজ করতে করতে তারা গাইছে মেঠো গান, কখনওবা গহীন গাঙে নৌকো ভাসিয়ে দিয়ে অচিন দেশের রূপকুমারীর উদ্দেশ্যে তারা ধরে ভাটিয়ালি।

আমি এঁদের কিছু কিছু গান সেই সময়ই সংগ্রহ করি এবং পরে শ্রীযুক্ত নলিনীকিশোর গুহ সম্পাদিত 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় 'ফরিদপুরের পল্লী-গীতি' শীর্ষক একটি নিবন্ধ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করি। এরপর আমার বহু হিতৈষী বন্ধুবান্ধবের পরামর্শ, অনুরোধ ও উৎসাহে গভীরভাবে এবিষয়ে আত্মনিয়োগ করি, যার ফলে আমায় পুনরায় পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঘুরে স্থানীয় বন্ধুবান্ধবদের সহায়তায় বহুকষ্টে সেই লুপ্তপ্রায় সম্পদের যতটুকু উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি তাই নিয়েই এই গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করি। পরে এই গ্রন্থের প্রায় সমুদায় অংশই বিভিন্ন শিরোনামায় আনন্দবাজার, সোনার বাংলা, বঙ্গশ্রী, তরুণের স্বপ্ন, হিমাদ্রি প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত ও সুধী সমাজ কর্তৃক সমাদৃত হয়।

রাজনৈতিক কারণে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের ভিতর ব্যবধান ঘটলেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অবিভক্ত থাকবে চিরকালই। পূর্ববঙ্গের পল্লী কবিগণের অফুরন্ত গীতি ও গান হিন্দু বা মুসলমান কারও একার সম্পত্তি নয়—উভয়েরই। তাঁরা পল্লীকবি এই তাদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তাদের এই অমূল্য সম্পদ শুধু পূর্ববঙ্গ-বাসীদের একচেটিয়া নয়—সমগ্র বাঙালী জাতিরই গৌরবের বস্তু। আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় তাদের সেই গীতি ও গাথার পরিচয় আপনাদের কাছে পৌঁছে দেবার যে চেষ্টা করেছি তাতে সফলকাম কতদূর হয়েছি তা' জানিনা—সুধীবৃন্দের হাতেই থাকবে সে বিচারের ভার।

সাহিত্য-সেবক সমিতির বিভিন্ন অধিবেশনে এই গ্রন্থ সংক্রান্ত আলোচনায় যাঁদের কাছ থেকে পেয়েছি বহু মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ তাঁদের মধ্যে সু-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীকিশোর গুহ, ডক্টর সুধাংশুকুমার সেনগুপ্ত, পি. এইচ. ডি.

অধ্যাপক শ্রীশীতাংশু মৈত্র ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অগ্রণী কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন ও সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী মহাশয় যথাক্রমে মুখবন্ধ ও ভূমিকা লিখে দিয়ে এ গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। তাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ দাশগুপ্তের কথা, যাঁর সাহায্য ও সহায়তা ভিন্ন এ-গ্রন্থ প্রকাশ একরূপ দুঃসাধ্যই হ'ত।

আমাদের যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও পল্লী কবিদের সঠিক ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা গেল না। পল্লীগীতির দস্তুরই এই। এমনকি পাশাপাশি দু' জেলার বিভিন্ন গায়কের কণ্ঠে একই গীতি ধ্বনিত হতে দেখেছি, এতে কে যে ঐ গীতটির আসল রচয়িতা তা ধরবার কোন উপায়ই নেই বা কোন্ গান যে প্রকৃত পক্ষে কোন্ জেলার সে বিষয়েও কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব নয়। তাই আমরা এ গ্রন্থে সংকলিত যাবতীয় গীতি ও তার পদকর্তাগণকে একত্রে পূর্ববঙ্গ পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গের পল্লীকবি আখ্যা দিলুম। সুতরাং এ গ্রন্থের আদৌ যদি কোন প্রশংসা পাওনা হয় তবে তা আমার নয়—সম্পূর্ণই পূর্ববঙ্গের সেই অখ্যাত, অজ্ঞাত পল্লীকবিগণের। আমি তাদের বাণী আপনাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি মাত্র।

মহালয়া
২০শে আশ্বিন ১৩৬০ বঃ অঃ — চিত্তরঞ্জন দেব
কলিকাতা—৩

সূচনা

শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দেব পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া, পুঁথিপত্র ঘাঁটিয়া বাঙালী পাঠককে "পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ" উপহার দিতেছেন। বইখানা পূর্ববঙ্গে প্রচলিত গীতি সংগ্রহ। গানগুলি পল্লী কবির রচনা। অনেকগুলির মধ্যে যথেষ্ট কবি প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। সংগ্রহকর্তা নিজের বক্তব্য দিয়া সেগুলিকে মালার আকারে গাঁথিয়াছেন, ভাষ্যকারের কাজও করিয়াছেন।

সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে বাংলা আজ দ্বিধাবিভক্ত। বাঙালীর সংস্কৃতি নানা ভাবে বিপন্ন। কিন্তু সংস্কৃতির দিক দিয়া বাংলা দ্বিধা বিভক্ত ছিল না। বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতি ছিল মূলতঃ এক। বহু মুসলমান কবি দেবদেবীর গান বাঁধিয়াছেন, হিন্দু গাহিয়াছেন গাজীর গীত। ইহাই অবিভক্ত বাংলার রূপ। চিত্তবাবুর সংগ্রহ গ্রন্থ তার উজ্জল স্বাক্ষর। এই গীতি সংগ্রহের জন্য তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, ভবিষ্যৎ-বংশীয়দের জন্য, বিশেষ করিয়া ভাবীকালের ইতিহাস লেখকের জন্য তিনি যে মাল মসলা রাখিয়া গেলেন তাঁরা সেইজন্য তাঁর নাম কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিবে।

আমার উপন্যাস 'গৌরীগ্রামে' কতকগুলি গান আছে, তার মধ্যে কয়েকটি চিত্তবাবুর সংগ্রহ হইতে উদ্ধৃত। এইজন্য আমি তাঁর নিকটে ঋণী।

চিত্তবাবু নিষ্ঠাবান সাহিত্যসেবী। "পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ" সেই নিষ্ঠার উজ্জল নিদর্শন। আমরা তাঁর নিকট এই ধরনের আরও অনেক সংগ্রহ আশা করি।

কলিকাতা ২৬।৮।৫৩ রমেশচন্দ্র সেন

ভূমিকা

যেদিন বাংলার উপেক্ষিত লোক-সাহিত্য শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, সেই দিন হইতে তাহারা এক অনাবিষ্কৃত, সৌন্দর্যময় লোকের সন্ধান পাইয়াছে। আধুনিক যুগের শিক্ষিত বাঙালী যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে উহার সৌন্দর্য সযত্নলালিত উদ্যানলতার সৌন্দর্যের মত, আর বাংলার নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিত জনগণের চিত্ত হইতে স্বভাবতঃ যে সাহিত্য জন্মলাভ করিয়াছে, উহার সৌন্দর্য অযত্ন বর্দ্ধিত বনলতার মত। এক হিসাবে, এই লোক-সাহিত্যের কোন রচয়িতা নাই; ইহা পল্লীর চিত্ত হইতে স্বভাবতঃ উদ্ভূত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বাংলার সামাজিক ইতিহাস, সুতরাং সমাজ তত্ত্ববিদ বা নৃতত্ত্ববিদের নিকট ইহাদের মূল্য অপরিসীম, কিন্তু যিনি শুধু কাব্যরস পিপাসু তাহাদের নিকটও ইহাদের মূল্য অল্প নয়। লোক-সাহিত্যের যাঁহারা স্রষ্টা তাঁহারা কলা-কৌশলের দিকে নজর দেন নাই, তথাপি তাহাদের রচনার স্থানে স্থানে অন্তরের গভীর অনুভূতির পরিচয় মেলে। দুঃখের বিষয়, লোক-সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডারের অতি সামান্য অংশই আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর হইয়াছে কিন্তু উহার সৌন্দর্যে আমরা মুগ্ধ না হইয়া পারি নাই।

শ্রদ্ধেয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় একদিন বলিয়াছিলেন—'বাঙালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি'। বাঙালীর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আজিও একেবারে মিথ্যা হইয়া যায় নাই। তদুপরি বাঙালীর জীবনের চরম অভিশাপ আসিয়াছে সেই দিন, যেদিন বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। বাঙালী সংস্কৃতিতে পূর্ববঙ্গের দান নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের চোখে নিশ্চয়ই উপেক্ষণীয় নহে; বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের লোক-সংস্কৃতির যে পরিচয় আমরা 'ময়মনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকার' মধ্য দিয়া পাইয়াছি, তাহাতে পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে যথার্থ কাব্যরসিক ও ঐতিহাসিকের কৌতূহল জাগ্রত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু পূর্ববঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে আজিও লোক-সংস্কৃতির যে সমস্ত উপকরণ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, সেই সকল সংগ্রহ করিয়া ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের পথ সুগম করিয়া দিতে পারেন,

এরূপ উৎসাহী তরুণের দল আজ আর চোখে পড়িতেছে না। যাহারা পশ্চিমবঙ্গবাসী, এই ব্যাপারে অগ্রণী হইবার পথে তাহাদেরও দুর্লঙ্ঘ বাধা রহিয়াছে। তাই আশঙ্কা হয়, ইতিহাসের এই মূল্যবান উপদানগুলি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, ফলে বাঙালী সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস কোন দিনই রচিত হইবে না।

বাঙালী সংস্কৃতির এই সঙ্কটের দিনে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দেব মহাশয় পূর্ববঙ্গের পল্লী-গীতি সংগ্রহ করিয়া বাঙালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। মধুকর শুধু ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহ করে না, সে মধুচক্র নির্মাণ করিয়া সঞ্চিত মধু যথাস্থানে রক্ষা করে। চিত্তরঞ্জন বাবুও অনেকটা 'মাধুকরী বৃত্তি' অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি পল্লী-গীতি সংগ্রহ করিয়াছেন, ইহাদের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন এবং পাঠকবর্গকে এই উপেক্ষিত, অনাদৃত গানগুলির রস আস্বাদন করাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন। বিশেষতঃ বাউলের দেহতত্ত্ব, গাজীর গান, কবি, জারী, রয়ানী বা ভাসান, কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ গান, পাঁচালি ও অত্যাধুনিক সমস্যার উপর রচিত অকস্মাৎ গীতগুলি যাহা ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই তাহা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়া রস পিপাসু পাঠকগণের চিত্ত পরিতৃপ্তি করাইতে সক্ষম হইয়াছেন।

আশা করি গ্রন্থখানি বাঙলার যথার্থ কাব্য রসিক ও ঐতিহাসিকগণের নিকট উপযুক্ত সমাদর লাভ করিবে।

২৫শে ভাদ্র ১৩৬০ বঃ অঃ

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড

অকস্মাৎ

পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ

প্রথম খণ্ড

বারমেসে

প্রথম পরিচ্ছেদ

"বঙ্গে হিন্দু ধর্মের অভ্যুত্থান কালে বোধ হয় শৈব ধর্মই সর্বপ্রথম শির উত্তোলন করে।"

৺দীনেশ চন্দ্র সেন।

মহানগরীর আলোকরশ্মির গণ্ডি ছাড়িয়ে নদী নালা, খাল বিল, ঝোপে ঝাড়ে ঘেরা পূর্ববাঙ্গলার পল্লী অঞ্চল। বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর বুকের উপর ঘটে গেল কত না বিচিত্র ব্যাপার, কিন্তু এই পরিবর্তনের কোন ছোঁয়াচই লাগলনা সেই সব জায়গায় এবং সেই জায়গার অধিবাসীদের মনে।

এক কথায় নিতান্তই পল্লীবাসী তারা। শহরের আবহাওয়ায় তাদের নিজস্ব পল্লীগত প্রাণ এখনও শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়নি। তাই তারা এখনও সারা বছর ধরে গান বাঁধে এবং সেগুলি গায় তাদের নিজেদেরই গড়া আসরের মাঝে। এ গানের রচয়িতা ও শ্রোতা নিজেরাই, কাজেই সমালোচনার অপেক্ষা না রেখেই তারা গায়।

বার মাসে তের পার্বণের দেশ এই বাঙ্গলা। শহরে আমরা সবগুলি খেয়ালও করি না, সময়ও পাই না। কিন্তু পল্লীমার স্নেহ কণায় পরিপুষ্ট পল্লীবাসী তাদের উৎসবের দিনগুলি ভোলে না। এই গোটা বছর ধরে যেমনি তারা পালন করে তাদের উৎসবের দিনগুলি তেমনি বাঁধে গান সেই উৎসবের জন্য।

এই (বার মেসে) গানগুলির ভিতর ৺নীল বিষয়ক গানগুলিই সবচাইতে বেশী প্রচলিত। নীলপুজোর ব্যাপার মিটবার পরও অনেকদিন পর্যন্ত এর গানগুলি শোনা যায় গাঁ এর লোকের মুখে মুখে।

এই নীলের গান বিষয়ে কিছু বলবার আগে আমাদের মনে হয়, নীল সম্বন্ধে আগে কিছু বলে নেওয়া দরকার।

নীল বা নীলকণ্ঠের অর্থাৎ মহাদেবের বিবাহ উৎসব উপলক্ষেই হয় এই উৎসবের সূচনা। চলতি ভাষায় একে বলে পাট-গোঁসাই। এর পুজো উপলক্ষে যে উৎসব হয় তাকে গাঁএর উৎসবগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান স্থান দেওয়া চলে। এক খণ্ড সরল নিম অথবা বেলগাছ থেকে তৈরী হয় এই মূর্তি। কোনখানার দৈর্ঘ্য দেড় হাত থেকে সাড়ে চার হাত, প্রস্থ ১২ ইঞ্চি থেকে এক হাত পর্যন্ত হয়ে থাকে।

এর মাথা অর্থাৎ অগ্রভাগ থাকে খুব মসৃণ ও ছুঁচালো এবং সমগ্র কাষ্ঠখণ্ডটির উপর থাকে লোহার তৈরী চক্র এবং ত্রিশূল। গোটা দেহটা (অগ্রভাগ অর্থাৎ ছুঁচালো মসৃণ জায়গাটি বাদে) থাকে লাল শালু দিয়ে ঢাকা। মাথাটি সব সময়ই সিঁদুর ও তেলে মিলে চক্ চক্ করতে থাকে।

পুজো হয় ২৯শে চৈত্র। এর অন্ততঃ তিনদিন আগে থেকে তিন সপ্তাহ আগে পর্যন্ত নীল নামান হয়। গোটা বছর নীল থাকে কোন এক মণ্ডপে। যেদিন নীলকে সেই মণ্ডপ থেকে নীচে নামান হয় সেদিন তাকে কোন স্রোতস্বতী নদী বিকল্পে দীঘির পারে নিয়ে, গঙ্গাপূজা দিয়ে স্নান করিয়ে নূতন কাপড় (লালশালু) পরিয়ে দেওয়া হয়। সেইদিনই বিকেলে অন্তঃপক্ষে সাতবাড়ি নীলকে ঘোরান হয়।

নীল যে বাড়িতেই যাক সেই বাড়ির বধূ এবং গৃহকর্তৃগণ পরম ভক্তি সহকারে পরিষ্কার আসন পেতে দেয়—দেয় আলপনা অত্যন্ত সুন্দরভাবে তাদের উঠোনের মাঝখানে নীলকে বসাবার জন্যে। এনে হাজির করে তেল ও সিঁদুর নীলের মাথায় পরিয়ে দেবার জন্য। গান শেষ হলে দেয় চাল ও টাকা পয়সা। হয় সেখানে গানবাজনা ও সঙ। বাজে ঢাক ঢোল, কাশী, বাঁশী। এই গানগুলিকে চলতি ভাষায় বলে 'অষ্টক গান'। "বারমেসে" গানের মধ্যে এই অষ্টক গানগুলিই সবচাইতে নাম করা। এ গানের প্রধান যন্ত্র ঢাক ও কাশী।

নীলের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে যেসব লোক তাদের বলে নীলসন্ন্যাসী। পরনে তাদের লাল কাপড়, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় থাকে পাগড়ি। এদের দলপতিকে বলে বালা। গানগুলি সাধারণতঃ ইনিই প্রথমটায় গেয়ে থাকেন। নীল বিষয়ক গানে এরা ওস্তাদ।

এই বালাদের কাজ অনেক। বাড়ি-বাড়ি ঘুরে গান গাওয়া ছাড়া ধূপ পোড়াতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করতে হয় শ্রীকৃষ্ণের দশ অবতার স্তোত্র। দিনের শেষে নীলকে আবার স্নান করাবার ভারও থাকে তারই উপর। এই

স্নানের সময়ও আছে অনেক মন্ত্র ও ছড়া। তারা নিরক্ষর হলেও এই সব মন্ত্রতন্ত্র তাদের মুখস্থই থাকে।

যেহেতু শিবের বিবাহ উপলক্ষেই এই পূজার সৃষ্টি, সেই হেতু এই উৎসবের যাবতীয় গানগুলিই প্রায় শিবের বিবাহ বিষয়ক এবং হর-গৌরীর গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বনেই রচিত। শ্রোতৃবৃন্দ বছরের শেষে নূতন ভাবে, নূতন আনন্দে শুনতে থাকে এই গান।

যারা পেশাদারী গাইয়ে তারা গোটা বছর ধরে তালিম দিতে থাকে নূতন নূতন গানের। অনেক সময় দু'খানা নীল পাশাপাশি হ'লে কাদের দলের গান ভাল এবং কাদের বালা অধিকতর শক্তিসম্পন্ন এই নিয়ে চলে প্রতিযোগিতা।

নীলপুজোর আগের দিন রাত্রে হয় 'হাজরা পুজো'। অর্থাৎ যেহেতু পরদিন শিবের বিবাহ, সেই হেতু পূর্বদিন হাজার দেবতাকে পূর্বাহ্নে বিবাহ সভায় উপস্থিত থাকবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়।

পুজোর দিন সন্ধ্যাবেলা নীলকে পুনরায় ঘটা ক'রে স্নান করান হয়। পুজোর জন্য স্থান নির্দিষ্ট হয় গৃহস্থের বাড়ি ছাড়িয়ে এক উন্মুক্ত প্রান্তরে কোন এক ক্ষণস্থায়ী মণ্ডপের মাঝে।

পুজো হয় সাধারণতঃ মাঝ রাতে। আরতি ও ঢাকের বাজনা চলে প্রায় সারা রাত ধরেই। যারা বৈষ্ণব পন্থী, তাদের পুজোয় বিশেষ কোন ঝঞ্ঝাট নেই। কিন্তু শাক্তপন্থীদের পুনরায় একখানা গৌরীমূর্তি আনিয়ে নীলের মণ্ডপের পাশেই বসিয়ে পুজো করতে হয়। সে জায়গায় শক্তি পূজার উপকরণ স্বরূপ হয় পাঁটা বলি। চলে সিদ্ধি, ভাঙ, গাঁজা ও কারণের মহোৎসব।

সাধারণতঃ কোন বাড়িতে নীল গেলে, নীলকে পাটপিঁড়ির উপর বসিয়ে রেখে মূল বালাই গান শুরু করে। এই বালারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরক্ষর। কিন্তু তাদের কবিত্ব শক্তি অসাধারণ। অসংখ্য গান তারা রচনা করে এবং মনেও রাখে। কারণ মনই তাদের একমাত্র খাতা, এর সাহায্যেই তারা বছরের পর বছর ধরে একইভাবে শিবসঙ্গীত গায়। আবৃত্তি করে সংস্কৃত ও প্রাকৃতে গঠিত এক অদ্ভুত ভাষায় দশ অবতারের রূপ। পরে চৈত্র সংক্রান্তির দিন চড়কের মেলার শেষে নীলকে পুনরায় তেল হলুদ মাখিয়ে স্নান করিয়ে এক বছরের মত তাকে রেখে দেয় তার স্থায়ী মণ্ডপে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় একবার করে ধূপধুনা দেয়, এই পর্যন্তই থাকে তাঁর সঙ্গে গৃহস্থের সম্বন্ধ।

সাধারণতঃ নীলের মিছিল কোন বাড়ি গিয়ে পিঁড়ির উপর নীলকে বসিয়ে দিয়েই গান শুরু করে :—

শুন সবে মন দিয়ে, হইবে শিবের বিয়ে
কৈলাশেতে হবে অধিবাস।
(ও) তাতে নারদ করে আনাগোনা, কৈলাশে বিয়ার ঘটনা
বাজে কাশী, বাঁশী, মোহন বাঁশরী।

মূল বালা এই পর্যন্ত বলেই একটু থামেন। এই সুযোগে বেজে ওঠে ঢাক ও বাঁশী, তান ধরে কাশী একটুক্ষণের জন্যে। কিন্তু বাজনার বিরতির পরই সহকারী বালা বলে ওঠে (ভাবটা অনেকটা যেন সেই শিব) :

ভাইগ্‌না আমি ভাঙ্গা ঘরে শুইয়া থাকি
চাহিয়া দেখি দু'টি আঁখি,
উশি পুশি করে রাত্রি কাটাই।
(ও) আমি দুই ধারে দুই বালিশ দিয়া
মধ্যখানে থাকি শুইয়া
চক্ষেব জলে বক্ষ ভাইসা যায়।
(তাই) ভাইগ্‌না যদি উপকাবী হও
তবে বিয়া দিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও।

গীতের বিরতিতে আবার বেজে ওঠে ঢাক ও মৃদু কাঁশী। এর পরেই মূল বালা সুর ধরে :—

তখন নারদ মুনি হেঁকে কয়,
শুন মামা মহাশয়,
(ও) আমি নারদ হইলাম ঘটক
তোমার বিয়ার কিসের আটক ?
(ও) তোমায় দিনের মধ্যে দিব বিয়ে
নয়ত, নারদ মুনি নহেক আমার নাম।

এই পর্যন্ত বলেই গান শেষ হয়। এ খানাকে বলা হয় সাধারণতঃ প্রস্তাবনা অর্থাৎ বিবাহের পূর্বেকার ঘটনা। এর পর অন্য কোন বাড়িতে বা সেই বাড়িতেই শ্রোতৃবৃন্দের অভিলাষক্রমে বালা আবার গান ধরে :—

শিব চইলাছে বিয়া করতে
বাজেরে ঢোল ডগর কাঁড়া
(ও) তার সঙ্গে চলে দৈত্য সেনা
আরও আছে দেব সেনা।
(ও) তাদের হাতে কইলকা, নেংটি পরা
গলায় দিছে সাপের মালা
দেখলে ডরায় লোক।
এমন জামাই দেখিয়া সবে কানাকানি করে,
(ও) সে শ্মশানে মশানে ঘোরে
আইছে একটা দামড়ায় চইড়ে
হাইটা আইলে যাইত বুড়া মইরে;
(ও) তাতে আমরা লজ্জায় মইরা যাই
বুইড়ার দেখি দন্ত নাই
(আবার) গলায় দেখি সাপের মালা
পরনে তার বাঘের ছালা
পিঁড়ির উপর দেখি এক সাপুইড়ারে।
(তখন) নারদ মুনি রেগে কয়—
এ যে দেবের দেব মৃত্যুঞ্জয়
শমনকে করে পরাজয়
আবোল তাবোল বল কাকে তোমরা ?
তোমরা নারী শীঘ্র কর
কন্যা দাও যোগ্য বর
শুভক্ষণের সময় বয়ে যায়।
(তখন) শুনিয়া নারদের বাণী
আসিলেক যতেক নারী
জামাই বরিতে যায় গিরি রাণী।

শিবের বিবাহ শুনবার পর যখন শ্রোতারা আরও কিছু শুনতে চায় তখন বালাকে বাধ্য হয়েই মহাদেবের গার্হস্থ্য জীবনের একটি ছবি এঁকে দেখাতে হয়।

এই শিবায়নের প্রত্যেকটি গীতের প্রতি নজর দিলেই দেখা যাবে এই নিরক্ষর কবিকুল তাদের গীতে শিব মাহাত্ম্য বর্ণনা করলেও তারা আমাদের কাছে যে শিবের কথা বলছে, সে শিব পৌরাণিক শিব নয়, এ শিব যেন আমাদেরই ঘরের লোক। এ শিব বা গৌরীকে তারা তাদেরই মনের মত করে গড়ে নিয়েছে কাজেই পৌরাণিক চিত্রের সঙ্গে এই গ্রাম্য কবিদের রচনার তুলনা করলে একটু বাধ বাধ ঠেকবেই। কিন্তু সেটা আমাদের কাছে এক্ষেত্রে বড় কথা নয়। আমরা দেখতে পাব এই সব নিরক্ষর কবিকুলের ভাষায় হর-পার্বতীকে তারা কতখানি আপনার করে নিতে পেরেছে।

শিবের বিয়ের পাট চুকে গেলে তিনি যখন আর দশজনের মত পার্বতীকে নিয়ে ঘর সংসার শুরু করে দিলেন সেই সময় আমাদের আর দশজনের ঘরের মতই একদিন সামান্য শাঁখা পরার ব্যাপার নিয়ে গৌরীর সঙ্গে কিরকম ঝগড়া বাঁধিয়ে ফেললেন সেটা বাস্তবিকই উপভোগের ব্যাপার।

একদিনে শিবানী হরেকে কহেন ডাকি
শঙ্খ পরিতে বড় সাধ যায় মনে,
(ও) সে শঙ্খ চুড়ি হীরার বালা
বিয়ার বয়সে কতই দিলা
শুনিয়া পড়শীরা সব হাসে।
(তখন) কহিলা শূলপাণি,
খাদ্য আমার ভাঙের লাড়ু
বাহন আমার বুড়া গরু
টাকা পয়সা কোথায় বল পাই ?
(আবার) চুল পাকা দাঁত নড়া
তার মাগীর কেন হেত ঘটা ?
(আবার) শঙ্খ যদি পড়তে চাও
বাপের বাড়ি চইলা যাও।
(আমি) শ্মশানে মশানে ঘুরি
ভাঙ ধুতুরা গিলি
শঙ্খ দেওয়া আমার সাধ্য নয়।

(তখন) শুনিয়া হরের বাণী
ক্রুদ্ধ হইলেন মা ভবানী
এক লম্ফে চড়িলা সিংহের পর।
দেবী তখন কাউকে কিছু না বলিয়া
সিংহের পৃষ্ঠে আরোহিয়া
কোলে লইয়া পুত্র গজানন
দেবী চইল্‌লা গিরিপুরে।
(তখন) নারদ মুনি যুক্তি করে,
(বলে) মামা শঙ্খ রাখ তোমার ঘরে
শাঁখারি সাজিয়া শীঘ্র দেহ দরশন।
তখন শাঁখারি কয়,
আমার কাছে ভাল চুড়ি
আর শাঁখা আছে
পরতে পারেন যত নারীগণ।
শুনিয়া শাঁখারির কথা
দেবী দিলেন হাত বাড়াইয়া
হরের শঙ্খ উঠল ভবানীর গায়
এই রূপেতে শঙ্খ পরান হয়।

যাক্ মিটে গেল হরপার্বতীর বিবাদ। আগেই বলেছি এই সব গীতিকারগণের অধিকাংশই নিরক্ষর। বার মাস তাদের কাজ থাকে ক্ষেত খামারের; বছরের মাত্র এই কটা দিনই তারা অবসর নেয়। তাদের কর্ম্মমুখর জীবনের ফাঁকে ফাঁকে তারা রচনা করে এই রকম নূতন নূতন গান এবং তাই পরিবেশন করে এই রকমই একটা উৎসব উপলক্ষে। তাই তাদের ভাষা ও ছন্দ অমার্জিত। আমাদের উপরের গীতটি কবে প্রথমে রচিত হয়েছিল তা' ঠিক বলা যায় না। তবে অঞ্চল বিশেষের অতি বৃদ্ধদের মুখেও এ গান শুনেছি। এতে অনুমান করা শক্ত নয় এ গান ন্যূনকল্পে উনবিংশ শতকে রচিত।

সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয় যে সময় এ গীতি রচিত হয় পূর্ববাংলার কোন এক অখ্যাত গ্রাম্য কবির দ্বারা—ঠিক সেই সময়ই বাঙলার শ্রেষ্ঠ শিবসংহিতার রচয়িতার রচনাও প্রকাশিত হয়। এতেই মনে হয় যুগধর্মের গুণে সমস্ত ভাবুকমনে

একই চিন্তাধারা খেলতে থাকে—বঙ্কিম ও স্কট, জগদীশ ও মার্কনী এই রকম উদাহরণের অভাব নেই। এক্ষেত্রে যদি এক অজ্ঞাত অখ্যাত পল্লীকবির কাব্যের সঙ্গে বঙ্গের তৎকালীন অন্যতম প্রসিদ্ধ শিবায়নের রচয়িতা রামেশ্বর ভট্টাচার্যের ক্যব্যের তুলনা অন্যায় মনে না হয় তা'লে আমরা রামেশ্বরবাবুর শিবায়ন থেকে ঠিক যে জায়গায় পার্বতী শিবের কাছে শাঁখা পরবার বায়না ধরেছেন সেই জায়গাটা উদ্ধৃত করতে চাই। এতে আমরা দেখতে পাব সভ্য শিক্ষিত সমাজের কবি বামেশ্বর বাবুব ঝরঝরে উচ্চাঙ্গের ভাষায় যে গীতি রচিত হয়েছিল, ঠিক সেই ভাব ও আদর্শ নিয়ে পূর্ববঙ্গের নিরক্ষর কবিও গীত রচনা করেছিল।

রামেশ্বব বাবুর শিবায়নে গৌরী যেখানে মহাদেবের কাছে শঙ্খ পরবার বায়না ধবেছেন সেই জায়গাটা এই রকম :—

"হৈমবতী হর পাশে হাসে মন্দ মন্দ।
কান্ত সনে করিয়া কথার অনুবন্ধ ॥
প্রণমিয়া পার্বতী প্রভুর পদতলে।
রঙ্গিণী সে রঙ্গনাথে শঙ্খ দিতে বলে ॥
গদগদ স্বরে হরে করে কাকুবাদ।
পূর্ণ কর পশুপতি পার্বতীর সাধ ॥

* * *

শঙ্খের সংবাদ বলি শুন শৈলসুতা।
অভাগার কাছে ইহা অসম্ভব কথা ॥
গৃহস্থ গরীব যার সাত গেঁটে ট্যানা।
সোহাগে মাগীর কানে কাঁটি কড়ি সোনা ॥

* * *

ভিখারীর ভার্যা হয়ে ভূষণের সাধ।
কেন আকিঞ্চন সঙ্গে করে বিসম্বাদ ॥
বাপ বটে বড়লোক বল গিয়া তারে।
জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে ॥

* * *

দেবী দণ্ডবৎ হইয়া দেবের দুটি পায়।
কান্ত সনে ক্রোধ করে কাত্যায়নী যায় ॥

কোলে করি কার্তিকেয় হস্তে গজানন।
চঞ্চল চরণে হৈল চণ্ডীর চলন॥
গোড়াইল গিরীশ গৌরীর পিছু পিছু।
শিব ডাকে শশিমুখী শুনে নাহি কিছু॥
নিদারুণ দারুণ দিব্য দিলা দেবরায়।
আর গেলে অম্বিকা আমার মাথা খাও॥
করে কর্ণ চাপি চলিলা চণ্ডবতী।
ভাষিল ভাইএর কিরা ভবানীর প্রতি॥
ধাইয়া ধূর্জটি গিয়া ধরে দুটি হাতে।
আড় হইয়া পশুপতি পড়িলেন পথে॥
"যাও যাও যত ভাব সব জানা গেল" বলি।
ঠেলিয়া ঠাকুরাণী গেল চলি॥
চমৎকার চন্দ্রচূড় চারিদিকে চায়।
নিবারিতে নারদ পাশে ধায়॥
রামেশ্বর ভাবে ঋষি দেখ বসে কি।
পাথারে ফেলিয়া গেল পার্বতীর ঝি॥

আমরা কিছুক্ষণ আগে শিবের বিবাহ এবং তার পারিবারিক জীবনের দু' একটি গান আপনাদের শুনিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে শিব-বিষয়ক গানে কোথাও কোন পালা গানের প্রচলন নেই। সব জায়গায়ই এই রকম খণ্ড খণ্ড গীতি বা গানের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে যতটা সম্ভব মিছিল করে আমরা আপনাদের কাছে উপস্থিত করেছি।

যদিও এই সমস্ত খণ্ড খণ্ড গীতিকে সুসংবদ্ধ অবস্থায় নাটকের আকারে দেখান খুবই কষ্টের ব্যাপার তথাপি আমরা গানগুলিকে এইভাবে ভাগ করে নিচ্ছি যথা :—দক্ষযজ্ঞে সতী স্বামীনিন্দা শুনে মারা গেছেন। তারপর অনেকদিন চলে গেছে শিব একাকীই বাস করেন। কিন্তু একাকী থাকা শিবের পক্ষে খুব বেশীদিনের জন্য সম্ভব হল না। তাই তিনিও ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বিয়ের জন্য। এমন সময় শিবের এই সঙ্কট দূর করবার জন্যে সেখানে এসে হাজির হলেন দেবদূত নারদ। নারদের ঘটকালীতেই হল শিবের বিয়ে। শিবও সংসার পাতলেন। কিন্তু এদিকে শিব যে সকলের অজ্ঞাতে গঙ্গাকে বিয়ে করেছেন সে খবর তাঁর

শ্বশুরবাড়ি বা দুর্গার কাছেও বলেননি। কাজেই এ বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই গঙ্গা যখন ফিরে এলেন তখনই শুরু হল দুই সতীনে বিবাদ।

বিবাদও অবশ্য একদিন মিটল। গঙ্গাও দুর্গার প্রতাপে বিদায় নিলেন। হর-গৌরী মনের সুখে বাস করেন, এই সময় আসে দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার, পার্বতী বিনা নিমন্ত্রণে হাজির হন বাপের বাড়ি এবং পতিনিন্দা শুনে করেন দেহত্যাগ, এইখানেই পালা শেষ।

তা'লে আমাদের পরিকল্পনা অনুসারে গানগুলিকে এইভাবে সাজাতে চাই। প্রথম মনে করুন, শিব দুর্গাকে হারিয়ে বড়ই কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন। এমন সময় সেখানে নারদ এসে হাজির :—

শিব হইয়াছে গৌরী হারা, দক্ষযজ্ঞে গেছে মারা
শিব ঠেকেছে গৃহ শূন্যের দায়।
এ ভবে যার গৃহ শূন্য, তারে কেবা করে মান্য
গৃহ শূন্য সন্ধ্যাকাল উদয়॥
যার গুণবতী নারী মরে, কেমনে সে ধৈর্য ধরে
মনের দুঃখে কাঁদিয়া বেড়ায়।
ভাবে, এই ছিল আমার কপালে, ঘুম আসে না শয়ন কালে
চক্ষের জলে বক্ষ ভেসে যায়॥
পত্নীর শোকে জরা জরা, রাগ হয়ে যায় অনেক চড়া
পুত্র কন্যা কথা কয়না ডরে।
চিন্তা করে দিবা নিশি ছেড়ে গেছে প্রাণ প্রেয়সী
কেমন করে রব এই ঘরে॥
পুত্র কন্যা থাকলে পরে, যদি পুত্র-বধূ রান্না করে
তবে মনে মনে করে আনাগোনা।
যদি সুধা সম রান্না করে, লবণ পোড়া কয় তাহারে
মুখে কিছুই ভাল লাগে না॥
ছেড়ে গেছে ভগবতী, গৃহ শূন্য পশুপতি
নারদেরে করিল স্মরণ।
জানতে পেল নারদ মুনি, ডাকিছেন শূলপাণী
সত্বরেতে এল তপোধন॥

শুন নারদ কই তোমারে, তল্লাশ কর ঘরে ঘরে
কার কন্যা রূপসী কেমন।
আমি ভাগ্নে করব বিয়া, যাও হে তুমি ঘটক হইয়া
বিলম্ব না করিও কখন ॥
আমি কি করিতে কিনা করি, মনের দুঃখে ঘুরি ফিরি
মন বলে করিব আমি বিয়ে।
চুল আমার সব পেকেছে, দন্তগুলি নড়ে গেছে
বুড়া বরে কেউ কি দিবে মেয়ে ॥
তখন নারদ বলে হলেম ঘটক, মামা তোমার বিয়ার কিসের আটক
কৌশলে করিয়ে দিব কাম।
মামা তোমারে সাজায়ে নিয়া, দিনের মধ্যে দিব বিয়া
তবে নারদ মুনি আমার নাম ॥
নারদ বলে যাব কাল, নিরূপিত বিয়ার ফল
গিরিপুরে যাইব সত্বর।
সেই গিরি রাজার আছে কন্যা, ত্রিজগৎ আর মহী ধন্যা
সেই মেয়ের সঙ্গে বিবাহ তোমার ॥
ভাগ্নে মুখে মুখে দিলা বিয়া, আমাকে প্রবোধিলা
চেষ্টায় তুমি করনাক কসুর।
"আমি দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে, মনের মত পাই না মেয়ে
কেবল মাত্র যাই নাই গিরিপুব ॥
যদি গিরি রাজার থাকে কন্যা, রূপে গুণে অধিক ধন্যা
তাইলে মেয়ের চেয়ে হবে সুন্দর মেয়ের মায় ॥"
"ভাগ্নে গৌরীরে আমারে দিয়া, তুমি কর তার মায়েরে বিয়া
তাতে আমার কিবা আছে কাম ॥
বিয়ার কথা মনে পড়লে, প্রাণ আমার রয়না ঘরে
একে পাগল আরও পাগল হই।
আমি দুই ধারে দুই বালিশ দিয়া, মধ্যখানে থাকি শুইয়া
উশি পুশি করে রাত্র কাটাই ॥

ভাগ্যে বিয়ার আছে কত ঝুক, কেমন মেয়ের নাক মুখ
আমি রাজার মেয়ে দেখি নাই।'
শুনিয়া শিবের বাণী, ঢেঁকি হস্তে নারদ মুনি
কৈলাসপুরে চলিল গোঁসাই॥

আমরা বিপত্নীক মহাদেবের অবস্থা শুনলুম। চলুন এইবার আমরা দেবদূত নারদ মুনির ঘটকালি দেখে আসি। আমাদের পল্লী কবির গানে স্বর্গের দেবদূতকে মর্তের ঘটক বানাতে খুব বেশী বেগ পেতে হয় নি।

শুন সবে মন দিয়ে হইবে শিবের বিয়ে
কৈলাসেতে হবে অধিবাস।
নারদ করে আনা গোনা কৈলাসে বিয়ার ঘটনা
শুন শিবের বিয়ার ইতিহাস॥
দক্ষ যজ্ঞে মৈলা সতী কেঁদে আকুল পশুপতি
নয়ন জলে বক্ষ ভেসে যায়।
সতী জন্মিল পুনরায় গিরি রাজার কন্যা হয়
ধ্যান যোগে তাই নারদ জানতে পায়॥
দেবগণ সব সঙ্গে নিয়া করিতে বিয়ার সম্বন্ধ
নারদকে পাঠাল গিরিপুরে।
চলিল ব্রহ্মার পুত্র করিবারে লগ্ন পত্র
মগ্ন হয়ে হরিগুণ স্বরে॥
করি ইষ্ট আলাপন বিবাহের উত্থাপন
করেন মুনি গিরি রাজার কাছে।
রাজা তোমার নাকি আছে কন্যা রূপে গুণে অতি ধন্যা
তারে দিবা নাকি বিয়া শিবের কাছে॥
তোমার কন্যা যোগ্য তার তিনি যোগ্য জামাতার
শুনিয়া কহেন হিম গিরি।
পঞ্চানন বিবাহের ছেলে রাণীর অনুমতি হলে
তবেই আমি পত্র * করিতে পারি॥

* পূর্ববঙ্গে বিবাহের পাকা কথা দেওয়াকে 'পত্র' করা বলে। অনুষ্ঠানটা অনেকটা দলিল রেজেষ্টারী করার মত। যদিও কোর্টে যেতে হয় না।

অন্তঃপুরে গিয়ে গিরি রাণীকে জিজ্ঞাসা করি
বলে শুন মেনকা সুন্দরী।
নারদ মুনি এল দ্বারে গৌরীর বিবাহের তরে
জামাই হবে সেই ত্রিপুরারি॥
রাণী কেন্দে বলে উচ্চৈস্বরে শুন রাজা কই তোমারে
কি কথা বলিলে তুমি আমায়॥
আমার কাঁচা মেয়ে উমাশশী সে হয় শ্মশান বাসী
একি আমার প্রাণে সহ্য হয়॥
এ কথা শুনিয়া গিরি চক্ষে বহে দুঃখের বারি
মেনকারে বুঝায়ে বলে।
দেবের দেব সে পঞ্চানন তারে কর গৌরী দান
নইলে পুরী ছাড়খারে যাবে॥
মনেতে ভাবনা করি সাজিয়ে আনিল গৌরী
দেখাতে লাগিল মুনির ঠাঁই।
নারদ বলে দেখলাম ভাল রূপে-গুণে ভুবন আলো
(আমার) জ্ঞান হয় মেয়ের চক্ষু দুটি নাই॥
আমার বিশ্বাস যেন বোবা মাইয়া চক্ষু থাকলে দেখত চাইয়া
জিজ্ঞাসা করিত নাম ধাম।
তোমার মেয়ে যদি করিত দৃষ্টি রক্ষা হত ধরার সৃষ্টি
প্রাপ্তি আমার হত গোলক ধাম॥
মেনকা কয় ঘটকের পো মেয়ে মন্দ বলিস না লো
তুই পড়েছিস বিয়া ঘুল্লার পাকে।
আমাদের সব ঝি বউ কালে কেহ মেয়ে দেখতে এলে
নয়ন মুদিয়া রহিতাম লাজে॥
শুনিয়া রাণীর বাণী হরষিত নারদ মুনি
শিবের কাছে চলিল তখন।
গিয়ে মহাদেবের সাক্ষাৎ হেটমুণ্ডে করে প্রণিপাত
ধীরে ধীরে বলিছে বচন॥

শুন দেব শূলপাণি তোমার হৃদয় মণি
জন্মিয়াছে গিরি রাজালয়।
গিয়েছিলাম আমি তত্র করে এলাম লগ্ন পত্র
এখন বিয়ার সাজে সাজ মহাশয়॥

শিবের বিয়ের ত পাকাপাকি বন্দবস্ত হয়ে গেল। আর হবেই বা না কেন? যেখানে নারদ মুনি হেন ঘটক সেখানে 'বিয়ার কিসের আটক'? আমাদের পাঠকদের ইতিমধ্যেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে কিনা জানিনা। যদি না ঘটে থাকে তবে চলুন একবার শিবের বিয়ের আসরটা দেখে আসা যাক। নেহাৎ মন্দ লাগবেনা— যেন আমাদের কোন বন্ধুর পল্লীগ্রামের বিবাহ সভায় আমরা উপস্থিত হয়েছি। আমাদের বন্ধুবর যেন পাট-পিঁড়ীর উপর দাঁড়িয়ে আছেন, মেয়ে পক্ষীয়েরা একে একে আসছে বরকে বরণ করতে।

ভোলা শিঙ্গা ডম্বুর লয়ে হাতে ভূতগণ সব সঙ্গে তাতে
বিয়া করতে চলে হিমালয়।
গেল গিরি রাজার অন্তঃপুরে গিরি রাণী চক্ষে হেরে
কেন্দে রাণী ধূলাতে লোটায়॥
রাণী কেন্দে বলে উচ্চৈঃস্বরে শুন রাজা কই তোমারে
কি কার্য করিলে নৃপবর।
চারি চক্ষের মাথা খাইয়া বুড়ার কাছে দেব বিয়া
এও কি আমার প্রাণে সহ্য হয়॥
এ কথা শুনিয়া গিরি চক্ষে বহে ব্যথার বারি
কেঁদে কেঁদে ছাড়িতেছে হাই।
বলে দ্বন্দ্ব ঘটা নারদ মুনি মিথ্যা কথার শিরোমণি
ঢেকী গোঁসাই ঘটাল বালাই।
সাজিয়া সব নারীগণে চলে গিরি রাজার ভবনে
দেখিতে রাজার জামাই সুন্দর।
কোন কোন রসবতী পড়েছে জামদানি ধুতি
কাপড় আর বুটশালের চাদর॥
এক রমনী রূপের ডালা স্বামী দিয়েছে মটর মালা
নাকে দিছে সার্কেল নাকছাবি।

তারা দেখিয়া ঐ বিয়ার বরে বলে দিদি এমন বরে
তুই এক জন্মের ভাগ্যে কি পাবি ?
বর নয় সে কি অদ্ভুত সঙ্গে শতাবধি ভূত
দেখে আমার ভয়ে এল জ্বর।
বয়স হবে তার আশী নব্বই রূপ যেন ঠিক বনেরই বানর
চলল দিদি আমরা সবাই ঘর ॥

শুনিয়া এ সব ভাষা দেখে নারীগণের রং তামাসা
নারদ মুনি ভাবে মনে মন।
নারদ দেয় ইসারা করে শিব মদনমোহন রূপ ধরে
অপূর্ব রূপ ভুবন মোহন ॥

দেখিয়া এসব কাণ্ড পঞ্চানন রসেরই ভাণ্ড
রাজ নন্দিনীর হরিষ অন্তর।
পান গুপারী হাতে দিয়া সখীগণ সব সঙ্গে নিয়া
বরণ করতে চলে মহেশ্বর ॥

মহাদেবের পঞ্চ মাথায় বরণ মালা পরাইতে
তুই হাতে বাধল বিষম জ্বালা।
তখন অন্তরে ভাবিয়া শিবে গিরিপুরে নব্যভাবে
দশভুজা হল গিরি বালা ॥

হর পার্বতীর মিলন হল আনন্দে পুরী ভরিল
মহানন্দে শালা শালীগণ
করে কত স্ত্রীআচার পাশা খেলা দেশাচার
আগামী দিন হইবে বরণ ॥

এই পর্যন্ত বলেই বালারা সাধারণতঃ গানের বিরতি টানে। এই সময় তারা খায় পান, তামাক, মধ্যে মধ্যে বাজে ঢাক ঢোল এবং তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচতে থাকে পায়ে ঘুঙুর বাঁধা ছোকরার দল। অধীর আগ্রহে শিবের বরণ শুনবার বাসনায় দাঁড়িয়ে থাকে বাড়ির বৌ-ঝিরা। শিবের বরণ না শুনে তারা কেউ ছাড়বেই না। তাই বালাকেও আবার গান ধরতে হয় :—

পড়ল কৈলাশেতে বিয়ার সাড়া বাজছে ঢোল ডগর কাঁড়া
সাঁনাই শঙ্খ বাজে শত শত।
সেতারা চৌতারা বাজে জগঝম্প মাঝে মাঝে
মৃদঙ্গ তানপুরা শত শত॥
সঙ্গে চলে যত জনা ঠিক যেন সব যুদ্ধের সেনা
ঢাল তলোয়ার ঘোরে উল্টা পাকে।
করে চলে তলোয়ারে কাটাকাটি কেহ কারে মারে লাঠি
কেহ জোর করিয়া পুরীর মধ্যে ঢোকে॥
লাগল কত বিয়ার গণ্ডগোল মহাযুদ্ধে মহারোল
ঘটক দৌড়ায় ছিড়ে মশারী।
বসল সব শান্ত হয়ে বিয়ার লগ্ন যায় বয়ে
ঐ যে বরণ ডালা নিয়ে যায় রাণী।

এর পরের টুকু এতই সংক্ষিপ্ত যে তার বর্ণনা না করলেও চলবে। বোধহয় সেই জন্যই পল্লী কবি বিবাহের রাত্রের ঘটনা আর বেশী করে বলেন নি।

কিন্তু পূর্ববঙ্গে বিবাহের চাইতে বাসী বিয়ের গুরুত্ব বড় কম নয়। কোন কোন অঞ্চলের প্রথানুসারে বাসী বিয়েই আদত বিয়ে। এর কারণ পূর্ববঙ্গে কুশণ্ডিকা সাধারণতঃ বিয়ের পর দিনই হয়। যেহেতু কুশণ্ডিকা না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ ঠিক শাস্ত্র সম্মত হয় না, সেই জন্য তারা যদি বাসী বিয়েকেই আদত বিয়ে বলে ধরে নেয় তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। পশ্চিম বঙ্গে কুশণ্ডিকা সাধারণতঃ বিয়ের রাত্রেই হয়, তাই এখানে বাসী বিয়ের উপর তেমন কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। আমাদের পল্লী কবিরা পূর্ববঙ্গের সমাজের সঙ্গেই পরিচিত তাই শিবের বিয়েকেও তারা পূর্ববঙ্গীয় প্রথায়ই শেষ করতে চায়।

শিবের বিয়ে আমরা দেখলাম। কিন্তু বাসী বিয়ে ত এখনও হল না। আর ঘটকই বা গেল কোথায়? তাকেত আমরা এর আগে মশারী ছিঁড়ে দৌড়োতে দেখলাম। কিন্তু বাসী বিয়েরও ত সময় আসন্ন। তাই গিরিপুরের নারীরা সব বরণ ডালা নিয়ে চলেছে শিবকে বরণ করতে। যদিও আমরা এর আগের গীতটিকে শিবের বরণ বলে বর্ণনা করেছি, কিন্তু প্রকৃত বরণের গীতটির রূপ নিম্নে দেওয়া হল :—

শুন সবে মন দিয়ে হয়ে গেল শিবের বিয়ে
বাসী বিয়ের করল আয়োজন।
তখন ধেয়ে যায় মেনকা রাণী এয়োগণ ডাকিয়া আনি
বলে কর গৌরীর বিবাহের বরণ ॥
তখন আসিয়া সকল রমণী করে সবে উলুধ্বনি
রাজার জামাই বরবে মনের সুখে।
নিয়ে ধান্য দূর্বা বরণ ডালা, পুরবাসী কুল বালা
দাঁড়াইল শিবের সম্মুখে ॥
তখন দেখিয়া শিবের মূর্তি হাস্য করে সব যুবতী
বসন দিয়া ঢাকল সবাই মুখ।
বলে, এই নাকী মেনকার জামাই এমন জামাই আর ত দেখি নাই
তোরা দেখল দিদি জামাইর পাঁচখানা মুখ ॥
দেখ ঐ পাঁচ মুখেতে পাকা দাড়ি এই জামাইর ত আদর ভারী
আবার দন্তগুলা যেন মূলার মত হয়।
ঐ দেখ তাও বাতাসে হেলে পড়ে দাড়ি যেন তুলা ধরে
আবার চক্ষের জলে গাল ঢাকিয়া যায় ॥
জামাইর মাথায় দেখি সাপের হেড়ে জামাই বুঝি হয় সাপুড়ে
সাপ খেলায়ে বেড়ায় দেশে দেশে।
পরা দেখি বাঘাম্বরী পেটে হইয়াছে আম উদরী
বুকটা ধড়ফড় করে হাঁপি কাসে ॥
ঐ দেখ ঘন নিশ্বাস ছাড়ে জামাই বুঝি রাত্রেই মরে
এই ছিল কি গৌরীর কপালে।
গৌরী এমন সোনার মাইয়া বুড়ার কাছে দিল বিয়া
(রাজা) সোনার পুতুল ফেলাইল জলে ॥
বরতে প্রথম এল স্বর্ণরেখা গৌরীর হাতে দিল শাঁখা
হেলাইয়া বুক মাজা দোলাইয়া।
আবার নথনী নাকে মাজন দাঁতে গোঁদানী লয়েছে তাতে
যেন ঘোমটার তলে খেমটা নাচিয়া ॥

চলিল শতাবধি যুবতী　　　আসিল জামাইকে বরি
উর্বশী অপ্সরা রম্ভাবতী।
এলো সাবী কৃতি অনুরাধা　　　আদ্রা ভদ্রা আর যশোদা
(মধ্যে) রোহিণী ভরণী হৈমাবতী ॥
এলো দুলী বালী চিত্ররেখা　　　ধনিষ্ঠা জ্যেষ্ঠা বিশাখা
অশ্বিনী ভরণী তিলোত্তমা।
এলো শ্রবনা পুষ্যা রেবতী　　　বরতে শিব আর ভগবতী
(এল) ঘণ্টাকালী আর সত্যভামা ॥
এলো হ্যালানি প্যালানি গেদী　　　মালঞ্চী ছেদী আহ্লাদি
যোগী লাবি ইলা পুত্তনা।
এলো মঞ্জুরাণী নিস্তারিণী　　　দিনতারিণী অলকমণি
এলো ধুনী মুনী কুড়ি খেস্তির মা ॥
হল সব রমণীর বরণ সারা　　　গিরি রাণী এলেন ত্বরা
জামাই বরতে করিলা মনন।
তখন নারদ মুনি ডেকে বলে　　　শুন মামী কই তোমারে
(আমার) মামার বিয়ার আছে এক নিয়ম ॥
জানি শাশুড়ি বরতে গেলে　　　ঈশার মূল লাগিবে কাজে
তবে মামার করিবে বরণ।
তখন শুনিয়া নারদের বাণী　　　ঈশার মূল লইয়া আনি
রাণী বরতে গেল জামাই পঞ্চানন ॥
রাণী বরণ ডালা নিয়ে কাঁখে　　　দাঁড়াইয়া শিবের সম্মুখে
বরিতে লাগিল তালে তাল।
অমনি ঈশার মূলের গন্ধ পেয়ে　　　শিব ছেড়ে সাপ যায় পালায়ে
তখন খসিয়া গেল পরা বাঘের ছাল ॥
তখন শিব ঠাকুর হইল নেংটা　　　নারীগণে দিয়া ঘোমটা
সরমে কেউর নাহি সরে বাক।
নারদ বলে নারীগণ　　　শুন ত আমার বচন
সকাল সকাল আন একখানা কাঁথা
ঘরে নিয়া জামাইরে ধরিয়া ঢাক ॥

শিবের বিয়ে এতক্ষণে শেষ হল। শিবও গৌরীকে নিয়ে কৈলাশে চলে গেলেন। আমাদের শিবায়নের কল্পিত নাটকের এইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটা উচিত। কিন্তু আমাদের পল্লী-শ্রোতারা শিবের বিয়ের পর তার পারিবারিক ঘটনাও দু'একটা না শুনে বালাকে বিদায় দিতে রাজী নয়।

শিবের পারিবারিক ঘটনার মধ্যে গৌরীর শাঁখা পরার ব্যাপারটা আগেই বলে নিয়েছি, সে জন্যে ও বিষয়ে আর কিছু বলার দরকার নেই। কিন্তু শিব যে এই বিয়ের আগে গঙ্গা নাম্নী একজনকে পত্নী করে ঘরে এনে রেখেছেন সে খবর তো তিনি এতদিন প্রকাশ করেন নি। কিন্তু সত্য কি কোনদিন চাপা থাকে ? একদিন গঙ্গাও বাপের বাড়ি থেকে ফিরে এসে শুরু করল গৌরীর সঙ্গে বিবাদ। বিবাদের ফলাফল আমরা একটু পরেই জানতে পাবব।

আমাদের গ্রন্থের গোড়াতেই বলে নিয়েছি এই নীলের গানের ভিতর যে শিব, গৌরী, গঙ্গা নারদের দেখা পাই এদের ঠিক দেবতা বলে স্বীকার করতে আমাদের বাধে। এর কারণ বোধ হয় বৌদ্ধযুগ শেষ হবার পরই যখন পুনরায় হিন্দুধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখন এই শিব গীতিকাই সর্ব প্রথম প্রচলিত ও প্রচারিত হয়। ধারণা করা অসম্ভব নয় যখন থেকে পুনবায় হিন্দু দেবদেবীর পূজা অর্চনা শুরু হয় তখন বোধহয় শিবপূজাই সর্বপ্রথম প্রচলিত হয়। হয়ত ঠিক এই কারণেই সভ্য সমাজের উপযুক্ত শিবায়ন কিংবা পল্লী কবি রচিত নীলপূজার গানে মেঠোসুরটাই বেশী করে ধরা পড়ে। এর ভিতর মনস্তত্ত্বের বিশেষ অবকাশ নেই। গাঁএর চাষা-ভূষা সরল গ্রামবাসীর সহজ জীবন যাত্রার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে পল্লী কবিরা শিব-দুর্গা তথা স্বর্গ লোকের সকল অধিবাসীকে আমাদের ঘরের লোক বানিয়ে ছেড়েছেন। তাই শিব বিষয়ে কিছু বলতে বসে শিবের ঘরের গঙ্গা-দুর্গা নামে যে দুই সতীন বাস করছেন তাদের পরস্পরের ভিতর যে ঝগড়া চলে সেই ঝগড়ার বিষয়ও কিছু বলা দরকার।

আধুনিক নিয়ম অনুসারে এ বিবাদটা হয়ত দুর্গা আর মহাদেবের ভিতরই প্রথমে হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সাধারণতঃ বিবাদটা দুই সতীনেই হয়। মেয়েরা সব সইতে পারে, পারে না শুধু স্বামীর ভাগ দিতে। শ্রীকৃষ্ণলীলায় তাই আমরা পাই শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণের উপর মানের ব্যাপার এবং পরে শ্রীকৃষ্ণকে সেই মান ভাঙ্গতে বিশেষ চেষ্টা পেতে হয়। এ ক্ষেত্রেও অবশ্য আমরা একটু পরেই দেখতে পাব পার্বতী রাগ করে বাপের বাড়ি যাবার উপক্রম করলে মহাদেব তাকে ফিরিয়ে

আনবার জন্ম কি চেষ্টাই না করলেন! বংশ রক্ষার জন্ম একাধিক বিবাহ অবশ্য হিন্দুধর্মে অনুমোদিত। কিন্তু মহাদেবের ত' সে ভয় ছিল না, তা হলে মহাদেব কি করতে আবার কার্তিক গণেশ থাকতেই গঙ্গাকে বিয়ে করলেন এবং গঙ্গার মত স্ত্রী থাকতে আবার বিয়ের জন্ম উতলা হলেন। এ সব প্রশ্নের জবাব নেই। কোন কালে কোন দেশেই এ প্রশ্নের জবাব সহজ ভাষায় দেয়নি। কেন যে দেয়নি, আমরা সে সব জটিল প্রশ্নের হাত থেকে রেহাই নিয়ে এখন পল্লীকবিদের বর্ণনানুসারে গঙ্গা দুর্গার বিবাদ নিয়ে আলোচনা করলে আশা করি আমাদের এগুবার সুবিধা হবে।

শুন সবে মন দিয়ে এ ভবে যার দুই বিয়ে
তার শান্তি হয় না কোনদিন।
আছে শিবের ঘরে দুই রমণী গঙ্গা আর সেই কাত্যায়নী
তারা ঝগড়া করে রাত্রদিন ॥
একদিন হরের অগ্রে বিদায় হয়ে কার্তিক গণেশ সঙ্গে নিয়ে
নায়রে চলিল ভগবতী।
তখন শিবের জটায় থেকে গঙ্গা বলিছে ডেকে
একি কর্ম কর পশুপতি ॥
পুরুষ শূন্য একা নারী কেমনে যায় বাপের বাড়ি
তুমি শঙ্কর যাও পিছে পিছে।
এ নব যৌবন কালে একা যাবে দূরদেশে
পথে কত ভাল মন্দ আছে ॥
শুনিয়া গঙ্গার বাণী ক্রোধান্বিতা ত্রিনয়নী
রক্তচক্ষে কহে জাহ্নবীরে।
তুইলো সতীন কইসনা কথা যথা ইচ্ছা যাব তথা
তুই কেন তায় মরিস্ জলে পুড়ে ॥
শোন লো সতীন তোর যে রঙ্গ উথলিলে তোর তরঙ্গ
শিবের পক্ষে থামান বড় দায়।
শিব কথা কয়না তোর ডরে থাকে কোচ নারীর ঘরে
তোর মত ছেদার আর কোথায় ॥

তুইলো সতীন কেমন নারী শিবের সঙ্গে সদাই আড়ি
শিব যখন কোচপাড়াতে যায়।
আড়ি দিয়া তার সাথে রঙ্গ করিস ডোমের সাথে
কেউ কি কোথায় ডোমেব অন্ন খায় ॥
পূর্বে শান্তনু রাজা গিয়া তোরে করিল বিয়া
তার সাক্ষী ভীষ্ম তোর ছেলে।
শান্তনু রাজারে ছাড়ি হলি আবার শিবের নারী
তোর মতন আর পূর্ণ সতী কে ?
শোনলো সতীন তোর যে ঘটা ব্রহ্মলোকে আছে খোটা
যখন ছিলি ব্রহ্মার সভায়।
হেথা মহাভীষ্ম রাজা ছিল তাবে দেইখা মন মজিল
উলঙ্গিনী হইলি রাজসভায় ॥
সতীন তুই বলিস অসতী তবু আমি পুত্রবতী
আমাব বশে থাকে পঞ্চানন।
নলিনী কয় ও মাতঙ্গে শীতল বাবি দানবঙ্গে
তোমরা মাগো মোদেব দুইই সমান ॥

উপরোক্ত গীতটি কোন কোন অঞ্চলে নিচেব রূপেও গাইতে শোনা যায়। তবে মনে হয় নিম্নোক্ত গীতটি পূর্বোক্ত গীত অপেক্ষা অধিকতর পুরাতন।

শোনেন যত জ্ঞানীজনা
দুই বিয়ার প্রস্তাবনা।
(আর) এ ভবে যাব বিয়া দুই
তার সুখ নাই কপালে কিছুই ॥
(ঐ) শিবের ঘরে গঙ্গা-দুর্গা দুই রমণী
তারা বিবাদ করেন দিবা রাতি।
(ঐ) একজনের থালে দুইজন বইসে
প্যাট না ভরলে কান্দন আইসে
(আর) অভিমানে কথা কয় না
গাল ফুলাইয়া রয় ॥

সাধারণতঃ দেখা যায় মেয়েরা রাগ করে বাপেব বাড়ি চলে যায়—তার রাগের

বহর দেখাবার জন্যে। এ জায়গায়ও আমরা ঠিক সেই জিনিসটিই দেখতে পাই পার্বতী গঙ্গার সঙ্গে বিবাদ করে মহাদেবের উপর রাগ করে বাপের বাড়ির দিকে রওনা দিচ্ছেন।

কিন্তু ঐ রওনা দেওয়াটাই সব নয়। আমরা গৌরীর শাঁখা পরাবার বেলায় যেমনটি দেখেছি এবারেও অনেকটা তাই দেখতে পাব। কিন্তু এখন সমস্যা হয়েছে কিভাবে যাবেন। গঙ্গা ত' বলেই দিয়েছে একে পার্বতী হ'ল কুলবধূ, তায় বয়স অল্প, এ অবস্থায় একা একা কোন নারীর পক্ষেই পথ চলা নিরাপদ নয়। সেইজন্যেই দুর্গার আবার একটু কৌশলের প্রয়োজন হয়ে পড়ল।

আমরা একাধিকবার লক্ষ্য করেছি, পল্লী কবিরা শিব-দুর্গাকে সব সময়ই তাদের ঘরের লোক, এবং দেবতাদের ক্ষমতাও তাদের ক্ষমতারই সমান বলে ধরে নিয়েছে। সেই জন্যেই পার্বতীর পক্ষে একা একা পিত্রালয়ে যাবার ব্যাপারটায় এত গণ্ডগোল ঠেকছে। কিন্তু এ গণ্ডগোলের মীমাংসাও তারাই করে নিয়েছে। সঙ্গীত রচয়িতাগণ নিরক্ষর হলেও তারা একেবারে বুদ্ধিহীন নয়। কাজেই যখ ই তারা কোন অসুবিধাজনক অবস্থায় এসে পড়ে তখনই তারা তাদের শিব-দুর্গার অলৌকিক শক্তির কথা স্মরণ করে নেয়। এতে সমস্যারও খুব দ্রুত সমাধান হয়। তাই দুর্গাকে যখন তারা একাকীই বাপের বাড়ির দিকে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন তখন পথিমধ্যে দুর্গা কী-ভাবে নিজেকে গোপন রেখে চলতে লাগলেন আমরা এখনই তা' দেখতে পাব।

পার্বতী মহাদেবের সঙ্গে বিবাদ করে ডোমনীর বেশে এক মায়া নৌকো সৃষ্টি করে তার দাড় বেয়ে চলতে লাগলেন। এমন সময় মহাদেব সেখানে এসে উপস্থিত।

মায়া লৌকায় উইঠা দেবী
বইসল লৌকার পরেতে
(আর) হর বইলাছে ডুমনী সই
পার করেদে আমাকে।
তখন সিদ্ধির কইলকা ভাঙের লাড়ু
থুইল লৌকার পরেতে
(আর) হর বইলাছে ডুমনী সই
পার করে দে আমাকে।

দেবীর ইচ্ছাতে নৌকা
চলে পবন বেগেতে।
(আবার) হরের কৌশলে নৌকা
ঠেকিল চড়াতে।
এত বলি ক্ষ্যান্ত দিল
মদন গোঁসাই
হর পার্বতীর বিবাদ কথা
শুন শুন ভাই।

আমাদের পাঠকবর্গ এবার হর-পার্বতীর বিবাদ শুনবার জন্য তৈরী হয়ে নিন। দুই সতীনে ঝগড়া শুনে যা'রা বিরক্ত হয়ে উঠেছেন আশা .করি তারা এবার স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া শুনে আরও বেশী বিরক্ত হবেন।

শিবের বিয়ের কথা আমাদের মনে আছে, বিয়ের জন্য মহাদেব কি ভীষণ উদগ্রীবই না হয়ে পড়েছিলেন। এখন যদি আবার সেই এত কষ্টের ধন তাকে ফাঁকি দিয়ে বাপের বাড়ি চলে যায় তাহলে তার কী রকম অবস্থায় পড়তে হয় তা' সবাই জানে। তাই শিব যখন দেখলেন বেগতিক, তখনই ছুটলেন পার্বতী যেখানে নৌকোয় করে বাপের বাড়ির দিকে রওনা দিচ্ছেন সেই দিকে। আমরা উপরোক্ত গীতটিতেই জানতে পেরেছি ডুমনী বেশে পার্বতী নৌকায় করে রওনা দিচ্ছেন বাপের বাড়ির দিকে এমন সময় মহাদেব সেই নৌকাতেই এসে চেপে বসে পড়লেন। তারপর যা হয় অর্থাৎ কমতি ত' কেউই নয়। তাই নৌকাব উপরেই দু'জনের ভিতর শুরু হয়ে গেল বাক্যুদ্ধ। পার্বতী এতক্ষণ বেশ খানিকটা গায়ের ঝাল ছেড়েছেন মহাদেবের উপর। কিন্তু মহাদেব ভোলানাথ হলেও তারও একটা সহ্যের সীমা আছে। তাই পার্বতীর কটুকথার উত্তরে মহাদেবকেও বলতে শুনি ঃ—

দুর্গে আমি জানি তোমার গুণের কথা
আমি খাই ভাঙ ধুতুরা
তুমি খাও দুর্গে রুধি।
(ঐ) অসুর বধিতে যোগিনী সঙ্গেতে
যখন গেলে দুর্গে তুমি।

তখন তোমারে হেরিয়ে দেবকুল যত
ভয়েতে অস্থির হইল।
(তখন) তোমারে রুখিতে এ বক্ষ পাতিয়ে
শয়ন করিলাম আমি।
তখন আমারে হেরিয়া লজ্জা পাইয়া
রণে ক্ষান্ত দিলা তুমি
দুর্গে আমি জানি, জানি তোমার গুণের কথা।

স্বামী-স্ত্রীর ভিতর যদি অন্তরের মিল থাকে তবে আর বিবাদ মিটতে খুব বেশী দেরী হয় না। তাই হর-পার্বতীর বিবাদের পর এখন তারা আবার ঘর-সংসার করছেন। কোন দিকে কোন ঝঞ্ঝাট নেই। ইতিমধ্যে ঘটল এক বিষম ব্যাপার। পার্বতীর বাবা রাজা দক্ষ মেয়ের বিয়ের পর থেকেই জামাইর উপর ভীষণ চটা। তাই জামাইকে জব্দ এবং অপদস্থ করবার জন্য এক যজ্ঞের আয়োজন করলেন। যজ্ঞে তিনি নিমন্ত্রণ করলেন সমগ্র দেবলোকের অধিবাসীদের। কিন্তু কিছু বললেন না শিবকে। শিব হয়ত ও বিষয়ে ভ্রূক্ষেপও করতেন না। কিন্তু গোল বাধালেন দেবদূত নারদ। তিনি এসে সালঙ্কারে বলতে শুরু করলেন পার্বতীর কাছে তার বাপের বাড়ির বিরাট যজ্ঞের কথা। পার্বতী এক পাগলের স্ত্রী বলে তাকে তাঁরা নিমন্ত্রণই করতে চায় না। পার্বতী অনেকদিন বাপের বাড়ি ছাড়া। তার উপর বাপের বাড়িতে অমন যজ্ঞ তাই মহাদেবের বিনা অনুমতিতেই গিয়ে হাজির হলেন সেখানে। কিন্তু সেখানে গিয়ে যখন শুনলেন পতিনিন্দা তখনই তার দেহত্যাগ করতে হল। মোটামুটি ভাবে শিবায়ন তথা পল্লী কবিদের নীলের অষ্টকগানের এইখানেই পরিসমাপ্তি :—

একদিন বলে দক্ষ নৃপমণি   শুন শুন নারদ মুনি
(আমি) করেছি এক যজ্ঞের আয়োজন।
তুমি যাও চলি অতি সত্বরে   শিবহীন যজ্ঞ করব বলে
ধরায় সব দেবেরে করবে নিমন্ত্রণ॥
তখন শুনিয়া দক্ষের বাণী   দ্রুত চলে নারদ মুনি
স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে যায়।
ত্রিলোক নিমন্ত্রণ করে   উদয় হল কৈলাশপুরে
যথায় আছেন মাতুল মহাশয়॥

শুন মামা পঞ্চানন দক্ষ রাজার করণ কারণ
করেছে এক যজ্ঞের আয়োজন।
মামা যজ্ঞ হবে মহাযজ্ঞ একটি কাজ বড় অযোগ্য
(এই যে) মামা নিমন্ত্রণ ভিন্ন ত্রিলোচন॥

নারদ তথা হতে চলে ধেয়ে পার্বতীর কাছে গিয়ে
বলে শুন অপূর্ব ঘটন।
স্বামী তোমার পিতা রাজা দক্ষ করিতেছে শিবহীন যজ্ঞ
তোমাকে করেছে নিমন্ত্রণ॥

এ কথা শুনিয়া সতী মনে ভাবে ইতি উতি
উপনীত যথা মৃত্যুঞ্জয়।
বলে শুন প্রভু শ্মশান বাসী আমার পিতার যজ্ঞ দেখে আসি
প্রভু অনুমতি করহ আমায়॥

তখন শুনিয়া সতীর বচন ধীরে ধীরে কয় ত্রিলোচন
বারণ করি যেওনা ত্বরা।
ওগো তুমি বাপের বাড়ি গেলে কেমন করে শূন্য ঘরে
(বল) কে বাটিবে আমার ভাঙ্গ ধুতুরা॥

তখন শিবের বাক্য লঙ্ঘন করে চলে সতী দক্ষপুরে
উপনীত দক্ষের ভবন।
দেখে দক্ষ বলে ও পাগলী কার কথায় তুই হেথায় এলি
তোরে কে গিয়ে করিল নিমন্ত্রণ॥

জামাই পাগলা ভোলা শ্মশানবাসী গায়ে মাখিয়া ভস্মরাশি
ভূতের সঙ্গে নাচে নিরন্তর।
ওলো তুই নাচিস ভূতের সঙ্গে কৈলাশপুরে পরম রঙ্গে
তাইতে এলি বুঝি না পেয়ে খবর॥

ইত্যাদি নিন্দাবাদ শুনে দক্ষ প্রমুখাৎ
সতী বলে শুন পাপিষ্ঠ রাজন্।
তুমি নিন্দা করলে যে মুখে পাঠার মুণ্ড হবে তাতে
এইক্ষ আমি ত্যজিছি জীবন॥

এ দিকে নারদ মুনি চেয়ে দেখে দাক্ষায়ণি
শিব নিন্দাতে ত্যাজিল অঙ্গ।
তখন সভা হতে শীঘ্র উঠি বাজাইয়ে দুটি কাঠি
কৈলাশে যায় বাধাতে রঙ্গ॥
বলে শুন মামা শূলপাণি তোমার নিন্দা শুনে শিবাণী
দক্ষপুরে ত্যাজিল জীবন।
তখন শুনিয়া নারদের কথা রাগে শিবের কাঁপে মাথা
গেল পাগলের প্রায় সে দক্ষ ভবন॥
তখন উদয় হল দক্ষপুরে দক্ষ যজ্ঞ নষ্ট করে
যুদ্ধে হল দক্ষরাজ নিধন।
হয়ে দক্ষরাণী উন্মাদিনী পদে পড়ে শূলপাণি
কেঁদে বলে প্রভু দাও পতির জীবন॥
তখন সতীর বাক্য রাখতে বজায় পাঠার মাথা এনে ত্বরায়
শিব দান করিল দক্ষের জীবন।
দেবের নিন্দাচর্চা করে যেই সমুচিত ফল পায় সেই
মোদের বাঞ্ছা যেন না হেরি বদন॥

সব শেষ।

শিবের বিয়ে থেকে শুরু করেছিলাম আমাদের আলোচনা আর সতীর মৃত্যুতেই করলাম তার সমাপ্তি। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখতে হবে আমাদের আলোচনার মূল বিষয়-বস্তু শিবের বিবাহ নয়—নীলপূজা সম্বন্ধীয় গীত। নীলপূজার যাবতীয় গীতি বা গাঁথা সম্বন্ধে বলতে গেলে এখনও কিছু বাকী আছে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি নীল-গান শেষ হলে বালাদের অন্যতম কাজ থাকে শ্রীকৃষ্ণের দশ অবতার বর্ণনা করা।

এই প্রসঙ্গে অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন শিবলীলা গাইতে গাইতে আবার শ্রীকৃষ্ণকে ধরে টানাটানি কেন? এর উত্তর দেওয়া সহজ নয়, সম্ভব নয়। আর সম্ভব হলেও আমরা ইচ্ছে করেই সে প্রসঙ্গ ত্যাগ করছি। কারণ আমরা ভূমিকাতেই বলে নিয়েছি আমাদের গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য পূর্ব বাংলার গ্রামে গ্রামে সারা বছর ধরে যে সব গীতি বা গানের প্রচলন দেখা যায় তারই সঙ্কলন করা।

নিতান্ত প্রয়োজন না হলে আমরা সেই গীতি বা গাথা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে চাইনা। এই সমস্ত অজ্ঞাতনামা কবিকুলের রচনার ঐতিহাসিক তত্ত্ব বা তাদের বাস্তব ভিত্তি সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ নয়। তথাপি সাধারণ জবাব স্বরূপ এইটুকু বলে নেওয়া চলে, হিন্দু ধর্মের যে কোন দেবদেবীর বা মূর্তির পূজা হ'ক না কেন নারায়ণ বা শালগ্রাম শীলার আবির্ভাব যেমন সেখানে অবশ্যম্ভাবী তেমনি যে কোন পর্ব অনুষ্ঠানই হউক না কেন তারা একটু সুযোগ পেলেই শেষটায় নমঃ গোবিন্দায়, বাসুদেবায় নমঃ বলে ইতি করবেই। হয়ত এই রেওরাজ রক্ষার জন্যই তারা নীল গানের শেষে ধূপ পোড়াতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করে শ্রীকৃষ্ণের দশ অবতারের স্তোত্র।

শ্রীকৃষ্ণের দশ অবতার স্তোত্রের কথা মনে হলে আমাদের মনে পড়ে মহাকবি জয়দেব বিরচিত শ্রীকৃষ্ণের দশ অবতার স্তোত্রের 'প্রলয় পয়োধি জলে ধৃত বানসি বেদং……' ইত্যাদি শ্লোকের কথা। সভ্য শিক্ষিত ও ভদ্র সমাজের এই শ্লোকের সঙ্গেই পরিচয় আছে। কিন্তু আমাদের এই নিরক্ষর পল্লীকবিরা সংস্কৃতের ধার ধারে না। তারা তাদের উপযোগী করে নিজেরাই রচনা করে নিয়েছে শ্রীকৃষ্ণের দশ অবতারের রূপ।

মহাকবি জয়দেবের শ্লোকের সঙ্গে অবশ্য এদের রচা গীতি বা গাথার তুলনার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ভগবানকে ভক্তি অর্ঘ্য জানাবার রীতি একই।

প্রথম কালেতে গোসাঁঞী একরূপ শরীর।
কোমল শরীরে গোসাঁঞী কত পেয়েছে দুঃখ॥
ক্ষীর নদী সাগরের জল কেমনে হল পার।
কোন অবতারে গোসাঁঞী উদ্ধারিলা নর।
সেই সব বৃত্তান্ত কথা কহ এই স্থানে।
দেব হয়ে দশবিধ রূপ ধরিলা কেমনে॥

এক

বেদ উদ্ধারিতে প্রভু মন করিলা সার।
অগাধ জলেতে প্রভু ধরিলা অবতার॥
চারি বেদ বানাইয়া জীব করিলা স্থির।
তং প্রণমামি দেব মীন শরীর॥

দুই

মমধ কবাট পৃষ্ঠ তপট ধর ফণী।
যাহার উপরে ভার রেখেছে মেদিনী॥
মেদিনীতে রেখে ভার জীব করিলা স্থির।
ত্বং প্রণমামি দেব কুর্ম শরীর॥

তিন

শক্তিতে সমান দন্ত বিদারিলা ক্ষিতি।
দৈর্ঘ্য প্রস্থ চতুঃপার্শ্ব হেট মুণ্ডে গাটি॥
কোটি ব্রহ্মাণ্ড যার এক লক্ষ ফুট।
ত্বং প্রণমামি দেব ববাহ রূপ॥

চার

কুঠার লইয়া হাতে দুর্জ্জয় অপার।
ক্ষত্রিয় নিঃক্ষত্রিয় কবে তিনশত বার॥
পিতাব আজ্ঞা পেয়ে বীর মার কাটিল শির।
ত্বং প্রণমামি দেব পরশুবাম বীর॥

পাঁচ

জন্মিল কশ্যপের ঘবে অপূর্ব মূরতি।
বলিব লইল যজ্ঞ পিতার সংহতি॥
ত্রিপদ ভূমি দানে বলি রাখিল পাতাল।
ত্বং প্রণমামি দেব বামন গোপাল॥

ছয়

হিবণ্যকশিপু দৈত্য মহা বলবান।
ত্রিভূবনে নাহি বীব তাহার সমান।
নখে চিরি বিদারিল উরুপরে ধরি।
ত্বং প্রণমামি দেব নরসিংহ হরি।

সাত

গোকুলে জন্মিল হরি রোহিণী উদরে।
করিলা গোকুলে অদ্ভুত কাণ্ড বাসরে॥

মহাকাল প্রাণ পেল সুমার গম্ভীর।
জং প্রণমামি দেব হলধর বীর ॥

আট

নাহি মানে বেদ শাস্ত্র ধর্ম অনুরীতি।
জীব হিংসা করে তারা দুর্জয় আকৃতি ॥
হয়ে বুদ্ধি হইল বচন প্রচার।
জং প্রণমামি দেব বুদ্ধ অবতার ॥

নয়

অবতার অবণীতে মোক্ষ মহীতে।
জগৎ মোহিনী ধনী মূর্তি বিপরীত ॥
ভক্ষণে নাহি বিচার দুরাচার মতি।
জং প্রণমামি দেব কল্কিকেশ মতি ॥

দশ

সূর্যকুলে জন্ম নিলে দশরথের ঘরে।
চরণ বাড়াইয়া দিলে পাষাণ উদ্ধারে ॥
সবংশে বধিলা প্রভু রাবনাদি অরি।
জং প্রণমামি দেব রাম রাজীব লোচন হরি ॥

বারমেসে গানের ভিতর নীল বিষয়ক গান এইখানেই শেষ। নীলপুজো হয় চৈত্র মাসে। কিন্তু ঠিক নীলেরই আরেক নাম 'কালবৈশাখী'।' তার আকৃতি বা পূজাপদ্ধতি নীলেরই মত। শুধু মাসভেদে নাম বিভিন্ন। যেমন দুর্গা আর বাসন্তী। এই 'কালবৈশাখী নীল' বৈশাখের মাঝামাঝি নামান হয় এবং বৈশাখের সংক্রান্তিতে হয় এর পুজো, তবে এর প্রচলন খুব বেশী নেই। এদের গানগুলিও প্রায় একই। তবে আমরা যে যে জায়গায় তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেছি এখানে সেই সব গানের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।

মনে করুন শিব'ত হিমালয় গেছেন বিয়ে করতে। এখন বিয়ে হবে সেই রাত্রিকালে, কিন্তু তার আগেই যদি শিবের পাত্রী দেখবার সখ হয় তখন কী রকম অবস্থা হয় তাই একবার শুনুন :

তখন কৈলাশপুরে দেখ দেব মহেশ্বরে
ভবানীর কথা পড়ে মনে।

দেখিবারে ভগবতী চঞ্চল হইল মতি
পশুপতি উঠিলেন তখনে ॥
পূর্ব তপ ব্রহ্মচারি হইয়াছে বল্কলধারী
বৃষপরি হইয়াছে আসন।
গিরীন্দ্রপুরেতে আসি উদয় হইল উল্লাসী
ছল করে ছলিবারে মন ॥
জটায়ে লোটায়ে পরে বাতাসেতে দন্ত লড়ে
মুখে রাম রাম বলে কামিনী দিল কুতহলে।
(আরও) কামিনী মহলে উতরিল গিয়া সন্ন্যাসীকে নেহারিয়া
সব সখী মিলিত হইয়া ভয়ে।
নিকটেতে গিয়া হর নিশ্চসেতে বাঘাম্বর
হাসিয়া হাসিয়া শুইয়া রয় ॥
অজানিল ভিটে ছটা কপালে রুধির ফোঁটা
রুধির অগ্রে চন্দ্র ভালে।
খুলে ফেলে বাঘাম্বর করিল বসন রক্তম্বর
পরিল রুদ্রাক্ষের মালা গলে ॥
কন্যা এল শব্দ শুনি রাণী দুঃখে ভাসেন ধনী
কেঁদে কয় সখী সনে গিয়ে।
ওগো এই বেলা অবশেষে পেয়ে অশেষ গর্ত্ত ক্লেশে
বৃদ্ধকালে প্রসবিলাম মেয়ে ॥
গৌরী আমার সোনার মেয়ে তাহার ভাগ্যে এই বিয়ে
এত কেবল আমার কপালেরই লিখন ॥

যাই হ'ক নারদ মুনি যখন বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করে ফেলেছেন তখন ত' আর বিয়ে না দিয়ে উপায় নেই। কাজেই মহাদেবও বিয়ের সভায় এসে হাজির হন এবং তারপর যা হয় সব জায়গায়, এখানেও তাই :—

শিব বইলাছে নারদ মুনি শুন দিয়া মন
তোমার মতন ভাগ্যে নাই এ ত্রিভুবন।
তুমি সঙ্গে থাকলে পরে নারদ সব করতে পারে
পারে সে অসাধ্য সাধন ॥

(এত বলি) হাসিয়া বলেরে নারদ বিয়া করবা তুমি
অবশ্য তোমার বিয়া দিয়া দিব আমি।
এত বলি নারদ মুনি করিল যে গমন
সীমান্তের পারে গিয়া দিল দরশন।
হাসিয়া বলেরে নারদ বেটার বড় সখ
বৃদ্ধকালে করবি বিয়া বড় তার রস।
বৃদ্ধ হয়েছিস বেটা পরনের ছাল পড়ে লোটাইয়া
তবু বিয়া করতে চাশ॥

এতেক বলিয়া নারদ করিল গমন
গিরি রাজার পুরে গিয়া দিল দরশন।
নারদ বলে শুনরে গিরি তোমার কাছে এসেছি
তোমার কন্যার যোগ্যপাত্র একটি পেয়েছি।
গিরি বলে শুন মুনি শুন দিয়া মন
রূপে গুণে কেমন পাত্র কহ বিবরণ॥

মুনি বলে শুন গিরি কোন দোষ নাই তোমার কন্যার যোগ্যপাত্র
তিনিই নিশ্চয়।
এইরূপে ঠিক করিয়া মুনি উপনীত শিবের নিকট
শিবের নিকটে গিয়া সব করিল বর্ণন॥

শুন বলি ওগো মামা বিলম্ব আর কেন
বিয়ার সাজে সাজিবে তুমি এখন।
(তখন) ভূত প্রেত নিয়া সঙ্গে বরযাত্রী চলে রঙ্গে
দেখে সবে লাগে চমৎকার।
শিব চইলাছে বিয়া করতে নারদ চলে সাথে সাথে
দেখতে আসে নারীগণ-সব।
দেখতে আসে গিরি রাণী এলোকেশী, আন্নাকালী
আরও যারা যারা রয়।
তখন দক্ষ বলে হেসে হেসে শোনরে নারদ বলি যে তোরে
দন্ত লড়া বুড়া জামাই কেন?

এই যদি তোর যোগ্য হয়, অযোগ্য তোর কিবা রয়
যোগ্যাযোগ্য তোর কোন জ্ঞান নাই।
তুইত মুনি বেজায় ঠেটা সর্ব কার্যে বাধাস লেঠা
এখন ঠেলা সামলান দায় ॥
এদিকেতে দক্ষপুরে স্ত্রী আচার করিবার কালে
নারীগণ সব বলাবলি করে।
(ও সে) কী খাইয়া কী দেখিয়া সোনার প্রতিমা মাইয়া
ত্রিলোকের এই বুইড়ার হাতে দিল।
গৌরীর হবে যখন বয়স কাল বরের আসবে দীর্ঘ কাল
কালরক্ষা কেমনে হবে লো ॥
আবার তালুক মদন উঠবে লাটে বর যাবে যে শ্মশান ঘাটে
লাটের খাজনা কে যোগাবে লো।
(আবার) বাকী পরা মহাল হলে কত লোকে কত বলে
(আবার) বন্দবস্তের কথা কেউ বলে লো ॥
(আবার) মদন রাজা করবে তসিল কে করবে তার খাজনা হাসিল
গৌরীর বয়স রক্ষা কেমনে হবে লো ॥
(ও তার) কফেতে বুক ঘড ঘড করে আইছে একটা দামড়ায় চড়ে
হেটে আইলে যাইত বুড়া মইরে ॥
(তখন) নারদ মুনি রেগে কয় শুন বলি মহাশয়
আবোল তাবোল বল কাকে তোমরা।
এ যে দেবের দেব মৃত্যুঞ্জয় শমনকে করে পরাজয়
কন্যা বিধবা হইলে কহিও আমায় ॥

নীল এবং 'কালবৈশাখী' গানের এই খানেই শেষ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"বন্ধুর বাড়ি আমার বাড়ি মধ্যে ক্ষীর নদী
উইড্যা যাওয়ার সাধ ছিল, পাঙ্খা দেয় নাই বিধি—"
—রাখালী গান

অসহ্য গরম। রোদে খাঁ খাঁ করে ধরিত্রীর মাটি। খাল, বিল, নদী, নালা, পুকুর পুষ্করণী সব একদম শুকিয়ে কাঠ। জলাভাবে কৃষাণদের চষাভূমিতে যে নূতন বীজ রোপণ হয়েছে তাও শুকিয়ে যাবার উপক্রম। এই বীজ একদিন রূপ নেবে গাছে, ফলবে তাতে সোনার ফসল। জমিতে লাঙ্গল জুড়ে দিয়ে তারা গান ধরে :—

আয়লো ত'রা ভূঁই নিড়াইতে যাই,
ভূঁই মোরগো মাতা পিতা, ভূঁই মোরগো পুত,
ভূঁইর দৌলতে মোরগো আশী কোঠা সুখ।
(এই) পৌষ মাসে দেলাম পূজা বাস্তু দেবতার পায়
মাঘ মাসে বসুমতীর চরণ ছোঁয়ায়।
ফাল্গুন মাসে দেলাম লাঙল চৈত্র মাসে বীজ,
বৈশাখেতে চিকচিহানী জ্যৈষ্ঠে ধানের শীষ।
আষাঢ় মাসে সোনার ধান, সোনার ফসল ফলে,
ছেরাবনে আউস ধান গেরহস্তেতে তোলে।
ভাদ্র গেল, আশ্বিন আইল, কার্তিকে দেয় সাড়া,
অগ্রাণেতে ক্ষ্যাতের পরে দেখরে আমন ছড়া।
আমন ওঠে ঘরে ঘরে দুঃখ কিছু নাই
আইস এবার যাবার বেলা চরণ বন্দি তার
(ওগো) সপ্তডিঙা মধুকরে যত ধান্য ধরে
এবার যেন সোনার ধানে আমার গোলা ভরে।

কখনও কখনও বা গায় :—

(ও ভাই) এবার লক্ষ্মীদেবী হয়ছে দয়া দুঃখ কিছু নাই
সোনার জমির মধ্যে যে ভাই সুখের বাতাস পাই,
বাপ আমার লক্ষ্মীন্দর সেরা মানুষ ছেলো
লক্ষ্মী ঠাইরনের দয়াতে ভাই রাজা উজীর হইলো।
(ও ভাই) তানার ছাওয়াল আমরা ক' ভাই মিথ্যার বেসাত বুনি
বিরথা সময় নষ্ট হইরা কপালেরে দুষি।
(ও ভাই) উদায় অস্ত খ্যাইট্যা মোরা কাজের পাইনা শ্যাষ
আইলস্যা কুইড়্যা, ভোজন দাইড়্যা, ঘুমায় বার মাস।
(ও ভাই) দিন গেল বিরথা কামে, সময় গেল চলি
যৈবান গেল জোয়ার মত বয়সে পড়ল ভাটী।
দিন থাকতে গুরুচাঁদরে ভজলা না মন তুমি
এখন সময় থুইয়্যা বিহাল বেলা ফেল চক্ষের পানি।
(ও ভাই) পিরোজপুরের যদুনাথ বড় জোতদার ছেল
তাহার দেখ গরু দুইডা কেমন হইরা মইল।
যদুনাথ সাধু মশয় সগ্‌গে চলিয়া গেল
তাহার পুত্তুর রতিনাথ পাথারে ভাসিল ;
আইস ভাই, শোন ভাই হাচা কথা কই
মোন দিয়া কর চাষ দুঃখ কিছু নাই।

জমিচাষ শেষ হয়। এইবার বীজধান বুনবার সময়। কৃষাণেরা খুব ভোরে উঠে মঙ্গলাচারের সঙ্গে ক্ষেতে গিয়ে হাজির হয়। দলীয় প্রধান একটি ঘট স্থাপনা করেন তার দলীয় লোকের জমির মাঝখানে। অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে তারা প্রণাম করে মাতা বসুমতীকে। অন্যদিকে ঠিক ঐ দিনই কৃষাণী বা চাষী গৃহস্থ বধূবা সারাদিন উপবাসী থেকে বিকেলের দিকে বাড়ির সংলগ্ন এক খোলা মাঠের মাঝে বসে আরো কয়েকজন নারীর সঙ্গে একত্রিত হয়ে করে 'ক্ষেত্তর ব্রত' ('ক্ষেত্র ব্রত')।

ক্ষেত্রব্রতে পুরোহিত সব সময় দরকার হয় না। বিশেষতঃ নমঃশূদ্র, বাউরী, মালো শ্রেণীর চাষীরা ত এ ব্যাপারে পুরোহিত ডাকেই না। আর তা'ছাড়া পুরোহিতের কাজও যে খুব বেশী কিছু থাকে এমনও নয়। বিশেষ কোন এক

বাড়ির সংলগ্ন মাঠে কয়েক বাড়ির ঝি বউরা মিলে ঐ রকমই একটি ঘট প্রতিষ্ঠা করে। তাতে আঁকে সিঁদুর পুত্তলি, দেয় আম্র পল্লব। কচিৎ কখনও ডাব বা এক আধটা ছোটখাট ফলও তার উপর দেখা যায়। এদের ভিতর যিনি প্রাচীনা সাধারণতঃ তিনিই হন মূল ব্রতী। অর্থাৎ পুরোহিতের কর্মটি তাকেই সমাধা করতে হয়। তিনি গল্প করে বুঝিয়ে দেন ব্রতের মহিমা। হাতে ফুল ও দূর্বো নিয়ে তন্ময় হয়ে ব্রতকাহিনী শুনতে থাকে ব্রতীর দল। শেষটায় কথা সাঙ্গ হলে যে যার হাতের ফুলগুলি চাপিয়ে দেয় ঘটের উপর। অবশেষে সমবেত কণ্ঠে ধরে ব্রতের গান :—

বন্দে মাতা বসুমতী পুরাণে মহিমা শুনি
অগতির গতি মাগো মোরে কর ত্রাণ।
চাষার ছাওয়াল মোরা যে ভাই
চাষ বিনা আর জানি নাই
এবার ধররে লাঙল শক্ত কইর‍্যা
জেবন থাকতে ছাড়া নাই।
(ওই) পূর্বকালে মিথিলাতে
জনক নামে রাজা ছিল
চাষের গুণে লক্ষ্মীদেবী
গোলক থুইয়্যা ঘরে আইল।
(মোরা) আসল থুইয়্যা নকল লইয়া
কাটাই বারোমাস
হেইতে মোরগো দুঃখেরও নাই শেষ।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। ব্রতীরা উলুধ্বনি দিয়ে ব্রত সমাপন করে। ঐখানে বসেই খায় চিড়ে, গুড়, মুড়ি, খই ও দই। সেদিন বাড়িতে কোন ঝি-বৌ ভাত খায় না। ভোজন পর্ব সমাধান করে যে যা'র ফিরে আসে বাড়িতে। এদিকে ক্ষেতে নূতন ফসলের বীজ বুনে কৃষাণ খুশীতে ডগ্‌মগ্‌ করতে করতে রওনা দেয় ঘরের দিকে।

মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিতর বাস্তুপূজা বা ক্ষেতে ঐ রকম ভাবে কোন মঙ্গলঘট স্থাপনা করে চাষে নামবার ব্যবস্থা নেই সত্য। কিন্তু এদিনে তারাও দূরে বসে থাকে না। এই দিনেই এদের ভিতর ঘটে সত্যিকারের মিলন। হিন্দুচাষীর পাশে

বসে একত্রেই হয়ত তারাও ডাকে আল্লা বা খোদাকে। শিন্নি মানত করে পীরের দরগায়, বৃষ্টির কামনায় গায় ঃ

"আসমানেতে নাইরে পানি
(এ আল্লা)
খন্দের দশা দেইখ্যা কান্দে
সোনা মিঞার নানী…"

এইদিনে হিন্দু-মুসলমান চাষী বেলা শেষে একত্রে ঘরে ফিরবার সময় সমস্বরে গান ধরে ঃ—

ও আমার আহ্লাদী
ও তোব সোহাগ বড ভারী
এবাব ক্ষেতে যদি সুফল ফলেত'
কিন্যা দিমু ঢাহাই শাড়ি
(ও আমাব আহ্লাদী)।
শাড়ি দিমু, গামছা দিমু
দিমু নাহেব নাক ছাবি
ও আমাব আহ্লাদী
তোর সোহাগ বড ভারী।
(ও) আমি শুভক্ষণে দেলাম পূজা
বাস্তু দেবতার পায়
জমি জিবাত সবই যে ভাই,
হেনাবই দয়ায়।
মাটির মানুষ, মাটিই খাঁটি
মবলে পরে দেবে মাটি—
এহন সময় থাকতে ধররে লাঙ্গল
নইলে শেষে হবে গণ্ডগোল।

কিন্তু সব শেষ। কৃষাণেব এত আশা, আকাঙ্ক্ষা, এত ভরসা আজ সবই বুঝি বিফলে যায়। তা'রা মাথায় হাত দিয়ে বসে। বৈশাখের প্রথম সপ্তাহ যায় অথচ দেশে একফোঁটা বৃষ্টিব নামগন্ধ পর্যন্ত নেই। এমন কি মেঘশূন্য নির্মল আকাশে একখণ্ড কালো মেঘ পর্যন্ত দেখা যায় না। অজন্মার হাত থেকে রক্ষা

পাবার বুঝি আর কোন উপায়ই নেই। ঠিক এই নাটকীয় মুহূর্তে কৃষাণ ঘরের মেয়ে ও অল্পবয়সী বৌদের দেখা যায় 'মেঘারাণী'র কুলো নামাতে।

'কুলো', 'জলঘট' প্রভৃতি নিয়ে তারা দলে দলে বেরিয়ে পড়ে। নীলের গানের মতই তাদের দেখা যায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান গাইতে। গান গেয়ে তারা পায় চাল, তেল, সিঁদুর, কখনও কখনও পায় দু'চারটে পয়সা এবং পানগুপারী।

কেউ সাতদিন, কেউ তিনদিন ধরে কুলো নামায়। বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান গায় :—

হ্যাদে লো বুন ম্যাঘারাণী
হাতপাও ধুইয়্যা ফ্যালাও পানী।
ছোট ভুঁইতে চিণচিনানী
বড ভুঁইতে হাটু পানী।
মেঘারাণীর ঘরখানি পাথরের মাঝে
হেই বৃষ্টি লামেলো ঝাঁকে ঝাঁকে।
কাইল্যা ম্যাঘা, ধইল্যা মেঘা বাড়ি আছ নি?
গোলায় আছে বীজ ধান বুনাইতে পার নি?

এর সঙ্গে মনে পড়ে :—

কালো মেঘা নামো, ফুল তোলা মেঘ নামো
ধুলট মেঘা, তুলট মেঘা তোমরা সবাই নামো।
কালো মেঘা টলমল, বাব মেঘার ভাই
আরো ফুটিক জল দিলে চীনার ভাত খাই।
কালো মেঘা নামো—নামো চোখের কাজল দিয়া
তোমার ভালে টিপ আঁকিব মোদের হ'লে বিয়া।
আড়িয়া মেঘা, হাড়িয়া মেঘা, কুড়িয়া মেঘার নাতী
নাকের নোলক বেচিয়া দিব তোমার মাথার ছাতী,
কৌটা ভরা সিঁদুর দিব, সিঁদুর মেঘার গায়
আজকে যেন দেয়ার ডাকে মাঠ ডুবিয়া যায়।

এইভাবে তারা রচে নূতন নূতন গান গায় বছরের পর বছর ধরে। ব্রত উদযাপনের দিন তাদের দেখা যায় কোন এক খোলা মাঠের মাঝে বসে

'মেঘারাণীর' ব্রত করতে। তাদের মধ্যে যিনি প্রাচীনা আসরের তিনি হন কর্ত্রী। এর জন্য পুরোহিতের প্রয়োজন নেই। 'ক্ষেত্র ব্রতর' মতই সভানেত্রীই মেঘারাণীর ব্রতের গল্প করেন। ব্রতীর দল হাতে দূর্বো নিয়ে নীরব আগ্রহে পরম ভক্তি সহকারে শুনতে থাকে ব্রতকথা। শেষটায় সাঁঝবাতী দিয়ে করে অনুষ্ঠান সমাপন।

দিন পাল্টে যায়। যুগ পাল্টে যায়। বদলে যায় দেশের রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি। কিন্তু এসব যেন চন্দ্র-সূর্যের মতই এদেশবাসিন্দার চিরন্তন সাথী। জল বায়ুর মতই যেন তাদের পুষ্টির সহায়ক—জীবন ধারনের অন্যতম উপকরণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"পল্লীর কোলে নির্বাসিত এই ভাই বোনগুলা হায়,
যাহাদের কথা আধ বোঝা যায়, আধ নাহি বোঝা যায়।
তাহাদেরই এক বিরহীয়া বুকে কি ব্যথা দিতেছে দোল,
কি করিয়া আমি দেখাইব তাহা, কোথা পাব সেই বোল ॥"

—জসীমউদ্দীন।

এল বর্ষাকাল। কবিমনে ফুটে উঠে অনন্ত রূপরাশি—ছন্দে ও গানে। জাগে বিরহী যক্ষের বুকে দয়িতের তরে আকুল ক্রন্দন। পূর্ববাংলার অধিকাংশ জায়গায়ই এই সময় থাকে জলের তলায়। বিলান দেশে এক একটা বাড়ি যেন ছোটখাট এক একটা দ্বীপ। আঁধার রাতে বাড়িতে বাড়িতে আলো জ্বললে মনে হয় সেগুলি যেন এক একটা ছোটখাট 'বাতিঘর' (Light House)। কৃষাণদের দেখা যায় এই সময় পাটগাছ কেটে (কোন কোন অঞ্চলে চলতি ভাষায় বলে 'কোষ্টা') জলের তলায় ভিজিয়ে রাখতে হয় কিছুদিনের জন্য। এই পাটগাছ সম্পূর্ণভাবে পচে গেলে তা থেকে বের হয় যে আঁশ, সেই আঁশ ভাল করে জলে ধুয়ে, রোদে শুকিয়ে যে বস্তুর দর্শন ঘটে তাকেই আমরা বাজারে চলতি 'পাট' বলি।

এই পাট পচাবার সময় যেমনি হয় বিশ্রী পচা গন্ধ, তেমনি যারা এই পাটকে এত কষ্ট করে রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, শুকিয়ে বাজারে হাজির করে তাদের হাতে পায় ধরে হাজা। তাই পচা পাট নৌকোয় তুলে আনবার সময় তাদের গাইতে শোনা যায়ঃ—

(মনে করুন যেন কোন কৃষাণ তার স্ত্রীর কাছে বলছে)

'হাত পাও খাইয়া করল সারা কোষ্টার জলেতে
কোষ্টা লওয়া হিতোইলা কাম এই ছিল কহালে।
সারা দিন কোষ্টা লইয়া ভাত খাই বৈহালে

(এ-আহায়-এ)

(মনে করুন তখন তার স্ত্রী যেন এর পা্ল্টা উত্তর দিচ্ছে)
'আমি বাড়ি গিয়া দিব আগুন লো
(ও) তোর কোষ্টারই কহালে
(এ-অহায়-এ)
(পত্নীর রাগ দূর করবার জন্য কৃষাণকেও আবার বলতে হয়)
'তখন মিঞাজী কন বিনয় হরে
বধূর কাছেতে
(ও) তুমি রাগ কইরো না, চুপ কইরা থাহ
খাড়ুগা দিমু পায়
যদি খোদার মর্জি হয়
(আর) কোষ্টায় দর হয়
(তয়) পান শুপারী, গুয়ামহবী লো
খাবি যতই মনে লয়।
(এ-আহায়-আয়)
(আবার) কলি কালের কাণ্ড দেইখ্যা
বাঁচিনা লজ্জায়
(ও) তারা ছলে বলে বল কৌশলে
বৌরে বাপ ডাকায়
(এ-আহায়-আয়)
(ও) তারা বাপের বাড়ি নাইওর দিয়ালো
নাহের ফুর ফুরি গড়ায়
(এ-আহায়-আয়)
(আবার) হাশুরী জিজ্ঞাসা হরে, বধূর কাছেতে
'বউ, ফুরফুরি গডাইয়াছ, ট্যাহা দিছে কে ?'
বউ কয়, 'ট্যাহা দিছে বাজানে'
(এ-অহায়-এ)

বর্ষাকালটাকে পূর্ব বাংলার পল্লী অঞ্চলে বলে অবসর মাস। এই সময় লোকের হাতে করণীয় বিশেষ কোন কাজই থাকে না। সে ক্ষেত্রে বাড়িতে বসে নেহাৎ গল্প ও গাথা ছাড়া আর কিই বা চলতে পারে ?

এই সময় দলে দলে বেদে ও বেদেনীকে দেখা যায় নৌকো করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাপ খেলা দেখাতে। সাপের ঝাঁপি মাথা থেকে নামিয়েই তারা সুর করে গান ধরে :—

সাপ খেলা দেখবি যদি
আয় লো সোনা বউ
সাপ খেলা দেখবি যদি আয়।
(আবার) সাপে যখন ফনা ধরে
আলকাতরার মায় চিকরাইয়া মরে
মোডাইতে মোড়াইতে সাপ
গদে চইলা যায়,
লো সোনা বউ।

এরপর শুরু করে গান, এবং তার সঙ্গে দেখায় সাপ। জাতি, কেউটে, চন্দ্রচূড়, দুধরাজ, লাউডগা, সিলিন্দে, কালনাগ কত রকমেরই না সাপ থাকে ওদের ঝাঁপির মধ্যে। এই সাপই তাদের দোসর, এই সাপই তাদের ব্যবসার পুঁজি। কাজেই একে এরা খাতিরও করে কম নয়।

এই বেদে বেদেনীদের জীবনযাত্রা প্রণালীও বিচিত্র ধরনের। নৌকোতেই এরা কাটায় বারটা মাস। নৌকোতেই এদের ঘর কন্না, রান্না বান্না এমন কি সন্তানের জন্মও হয় ঐ নৌকোর ভিতরেই। এরা এক কথায় স্থলচর জীব হয়েও যেন জলচর। এদের ভিতর বেদেদের স্বভাব আরও বিচিত্র। শোনা যায় এরা নাকী তাদের পরিবারের চাইতেও তাদের পোষা সাপকে বেশী ভালবাসে। এ ব্যাপারে বেদেনীর পক্ষে বেদের উপর রাগ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। তাই হয়ত তাকে গাইতে শুনি :—

আমি বলি এই সভাতে
মইজাছি বাইদার পীরিতে।
(ও) আমার কি ক্ষণে দেখা হইল
বাইদার সাথে।
(ও) আমায় বাহির করে আনলো
বড় দুঃখেতে মইজাছি বাইদার পীরিতে।
(ও) সে আমারে গাওয়ালে দিয়া

বাইদা করল আরেক নিহা গো।
(ও) আমি ঘরে আইস্যা দেখি
আরেক সতীন লো
বড় দুঃখেতে মইজাছি বাইদার পীরিতে।

আক্ষেপটি বড়ই জোর। এ সব জায়গায় জগতের যেটা চিরন্তন নিয়ম অর্থাৎ নারী সকল রকম ত্যাগস্বীকার করতে প্রস্তুত থাকলেও তার প্রেমাস্পদের ভাগ দিতে রাজী নয়। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে বেদেনীর পক্ষে বেদেকে ওকথা বলাটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে আমরা বেদেকেই বা একেবারে রক্ত মাংসে গড়া মানুষের পর্যায় থেকে বের করে দি কী বলে? বেদেনীর মান ভাঙ্গাবার জন্য তাকেও ত বলতে শুনা যায়ঃ—

ওলো আমার রসের বাইদানী
রসবতীর মালা নিবিনি
(ও আমার আহ্লাদী)
আয়না আনছি, চেরন আনছি,
আরও আনছি লোলা ঝুম ঝুমি
(আবার) চুল বান্ধনের ফিতা আনছি
রাঙা গুতার কাপড় কিনছি
রসবতীর মালা নিবিনি
(ও আমার আহ্লাদী)।

পূর্ববঙ্গ সর্পবহুল দেশ। সাপের দেবতা মনসাদেবীর প্রতাপ ও প্রচার এখানে খুবই বেশী রকমের। তাই পহেলা শ্রাবণ থেকে এর সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রায় প্রতি ঘরেই দেখা যায় মনসা-মঙ্গলের পুঁথি পড়তে। এ বিষয়ে আমরা গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 'রয়ানী' বা 'ভাসান' অংশে বিস্তৃত আলোচনা করব। আপাততঃ পূর্ব বাংলার জনসাধারণ বিশেষ করে গাঁয়ের মেয়েদের মনের উপর মনসা-মঙ্গলের নায়ক নায়িকা 'বেউলা লক্ষীন্দরের' প্রতি তাদের সহানুভূতির কথা জেনেই এই সব বেদে এবং বেদেনীরা কীভাবে গান গেয়ে পয়সা রোজগার করে সে বিষয়ে কিছু বলা দরকার।

বারোয়ারী যাত্রা বা থিয়েটারে যেমন আসর ভরা লোক না হলে অনুষ্ঠান বিশেষ জমে না তেমনি এই বেদে বেদেনীরাও বাড়ি ভর্তি অর্থাৎ উঠোন ভর্তি

লোক না হলে বিশেষ কিছু খেলা দেখায় না বা বেশীক্ষণ গানও গায় না। কিন্তু জায়গা মত হলে তারা গান ধরে :—

এইনা শাবণ মাসে
ঘন বৃষ্টি পড়ে।
কেমন করে থাকবো লো আমি
অন্ধকার ঘরে।
(আর) সোনার বরণ ন'খাইরে আমার
বরণ হইল কালো
কিনা সাপে দংশিল তারে
তাই আমারে বল
(বিধি এ কি হইল)।
(আবার) কাইল হইয়াছে ন'খাইর বিয়া
মালীর মুকুট দিয়া
কেমন করে যাবোলো আমি
মালী পাড়া দিয়া
(বিধি এ কি হইল)।
(আবার) কাইল হইয়াছে বেউলার বিয়া
বাইনার সিঁদুর দিয়া
(হারে) কেমন করে যাবালো আমি
বাইনা পাড়া দিয়া
(বিধি এ কি হইল)।

লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যু হল। কিন্তু তাই বলে বেদেনীদের কাজও কি ফুরিয়ে গেল ? তা' নয়। স্থানীয় চলতি প্রবাদ অনুসারে লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যু শোনালে তার পুনর্জন্মও শোনাতে হয় তা' নইলে নাকী দোষ হয়। তাই গৃহস্থ বধূরা যখন লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যু শোনে তার পরেই তারা বায়না ধরে লক্ষ্মীন্দরের 'জীয়ন' অর্থাৎ প্রাণ ফিরে পাওয়ার কথা শুনতে। বেদেনীরা এ খবর জানে। তাই তারাও তৈরী থাকে। কূল লক্ষ্মীদের অনুরোধক্রমে আবার তাদের গাইতে শুনি :—

যেনা বরে বাঁচেরে আমার
ভোলা মহেশ্বর

সেইও বরে বাঁচেরে আমার
সোনার লক্ষীন্দর।
শূলপানি শিব দুর্গা
কৈলাশেতে বাস
মনসা তাদের পাশে
রহেন বার মাস ॥
মনসা দেবীর দয়ায়
লক্ষীন্দর পায় প্রাণ
সপ্ত ডিঙ্গা মধুকর পাইয়া চাঁন্দর
দেবীর গুণ গান।

বর্ষাকালের গানের ভিতর এই বেদে বেদেনীব গানই একমাত্র উল্লেখযোগ্য বারমেসে গান। এ ছাডা যে সব গানের প্রচলন আছে আমরা সে গুলিকে সাময়িকী গীতির মধ্যে ফেলেছি, কাজেই সে গানগুলির বিষয় পৃথক ভাবে এবং সময়ান্তরে আলোচনা করা যাবে। কারণ ঐ সমস্ত গীতি বা গাঁথাকে প্রতি বছর ঠিক একই সময় গাইতে শোনা যায় না।

তবে বর্ষাকালে এই সমস্ত গীতি বা গাথা ছাডা যে আর অন্য কোন গানই হয় না এ কথা এক নিঃশ্বাসে বলা সহজ নয়। এই সময়ও দু'একজন স্বভাব কবির দেখা পাওয়া যায় যারা আপনার মনে আপনিই গান রচনা করে, নিজেরাই হয় তার শ্রোতা।

চাবিদিকে জলে জলময়। নৌকো করে যে বৈরাগী বোষ্টমরা বাডি বাডি ঘুরে ভিক্ষে করবে এমন সম্ভাবনা কম। কারণ একখানা নৌকো যত ছোটই হোক তা সংগ্রহ করা তাদের গোটা বছরের আয়েও কুলোয় না। কিন্তু তারা ত একেবারে গাছ পাথর নয়! ক্ষুধা তৃষ্ণা তাদেরও আছে। গোটা বছরের অর্থাৎ এই বর্ষার ক'মাসের খাবার তারা আগেই সংগ্রহ করে রাখতে পারে না। তাই তাদের একখানা তালের গুড়ি কেটে ডোঙ্গা তৈরী করে নেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। এই তালের ডোঙ্গা চালাতে হয় অতি সন্তর্পণে। দু'জন পাতলা গোছের লোক অতি কষ্টে চলাফেরা করতে পারে। আমাদের পল্লীর স্বভাব কবি বৈষ্ণবেরা ঐ ডোঙ্গায় করেই বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান গায়। এই গানগুলির অধিকাংশই দেহতত্ত্ব বিষয়ক ঃ—

গুরুজী ভাঙ্গা ঘরে মন টেঁকেনা
উপায় কী করি ?
তার চালেতে করেছে ছেঁদা
জল পড়ে টিপি টিপি
উপায় কী করি ?
ওসে চৌদ্দ পোয়া ঘর
আছে দুই খুটির উপর
আছে যৌবন মেঘের বাড়াবাড়ি
(তাতে) মদন তুফান মাঝে মাঝে দেয় ফাঁকি
গুরুজী ভাঙ্গা ঘরে মন টেঁকেনা
উপায় কী কবি ?
অধম নিবারণ কয়, এই ঘর চিরদিন না রয়
ভাইরে কেহ শত, কেহ পঞ্চাশ, কেহ অল্পেতেই রয় ।
(আবার) এ যেন ভাই খাঁচা ছেড়ে উড়ে যায়
সাধের প্রাণ পাখী
গুরুজী ভাঙ্গা ঘরে মন টেঁকেনা
উপায় কী করি ।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"How pleasent the life of a bird must be
Whoever it listeth these to flee"

—Mary Howrth.

বর্ষা গেল। ধরিত্রী আবার হেসে উঠল তার নূতন রূপে। আকাশ হল নির্মল মেঘশূন্য। শরতের সোনালী আলোকে বিহঙ্গের কলকূজনে শরৎ রাণীর আবাহন গীতি জানাল দূব দূরান্তরে। আমাদের মনে হয় গীতিমুখর পূর্ব বাংলার এই ঋতুতেই গানের চর্চ্চা হয় সব চাইতে বেশী।

ভাদ্র সংক্রান্তি। পশ্চিম বঙ্গে বিশেষতঃ কোলকাতা সহরে এই দিন যেমন দেখা যায় ঘুড়ি ওড়ানোর হিড়িক পূর্ববঙ্গে তেমনি এই দিন দেখা যায় নৌকো বাইচের ঘটা।

ছোট বড়, ডিঙ্গি ও ছিপ (চলতি কথায় বলে 'বাচারী') হরেক রকম নৌকোর আবির্ভাব ঘটে সেদিন। এই নৌকো বাইচকে স্থানীয় যুবকেরা তাদের একটা জাতীয় ক্রীড়া বলে মনে করে। তবে নৌকো বাইচের বড় প্রতিযোগিতা হয় বিজয়া দশমীর দিনে। এই সময় দেখা পাওয়া যায় সব বড় বড় নৌকোর। তাদের এক একখানা গলুই সমেত আশী নব্বই হাত পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। অনেকটা প্রাচীন ছিপ নৌকোর মত। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ জন জোয়ান গোছের লোক হাতে একখানা করে বৈঠে নিয়ে শুরু করে নৌকো বাইচ দিতে। এই বাইচের সময় নৌকোর গতিবেগ কুড়ি থেকে পঁচিশ মাইল পর্যন্ত হয়ে থাকে।

এই সমস্ত নৌকো বাইচ ওয়ালাদের ভিতব হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। প্রতিযোগিতার রেশ স্বরূপ কখনও কখনও খুনোখুনি পর্যন্ত হয়ে থাকে। যে পক্ষ প্রতিযোগিতায় হারে তারাও অন্য কোন অবকাশে এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রস্তুত থাকে। এই সমস্ত নৌকোবাইচ ওয়ালাদেরও সন্ধ্যেবেলা খেলা সাঙ্গ করে ঘরে ফিরবার সময় দামামা এবং কাশী বাজিয়ে গাইতে শোনা যায় :—

জয় দেলো রামের মা তোর
গোপাল আইছে ঘরে
ধান্য দূর্বা বরণ কূলা
দেলো ঐ গলুয়ার কপালে।
নড়িয়া বড়িয়া তোমার
গোপাল নে যাও ঘরে
জয় দেলো রামের মা তোর
গোপাল আইছে ঘরে।
সাত সাগরের পার থিকা সে
আনছে বরণ মালা
দুধের বাটী ক্ষীরের লাড়ু
আনো থালা থালা।
(আবার) যেই দেবতার দয়ায় আসে
তোমার গোপাল ঘরে
সেই দেবতা পবন ঠাকুর
পেন্নাম যাই তারে।
জয় দেলো রামের মা তোর
গোপাল আইছে ঘরে।

এই গানটায় একটা জিনিষ লক্ষ্য করবার আছে। নৌকো বাইচ শেষ করে জয়তিলক নিয়ে ফিরল যে ছেলে কবি ধান দূর্বো বরণ ডালা তার মাথায় না ছুঁইয়ে সেগুলি ছোঁয়াতে বললেন গলুয়ার (নৌকার মাথায়) মাথায়। এর কারণ আর কিছুই নয়, যে জলতরী নিজের ক্ষমতা গুণে তার ছেলেকে জয়ের তিলক পরিয়ে এনেছে এবং নিরাপদ নির্বিঘ্নে তার কাছে পৌছে দিয়েছে ধান দূর্বো বরণ ডালা এবং আশীর্বাদ ত' সর্বপ্রথম তারই পাওনা।

ভাদ্র গেল। এল আশ্বিন। দূর দূরান্তরের যাত্রী সব চলেছে বিশালাকায় দো মাল্লাই থেকে আট মাল্লাই ষোল মাল্লাই নৌকো করে। দিনের পর দিন রাতের পর রাত তারা চলেছে। কোনখানা চলেছে বঙ্গোপসাগরের দিকে, কোনখানা আড়িয়ালখাঁ দিয়ে মধুমতী হয়ে পদ্মার সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। এক এক সময় মনে হয় তারা বুঝি দিক্ হারিয়ে ফেলে অনির্দেশের পানেই ছুটে

চলেছে। কিন্তু তা' নয়, যান্ত্রিক ঘড়ি তাদের না থাকলেও সূর্য ঘড়িই তাদের সব। এই সূর্য ঘড়ির সাহায্যেই তারা দিক্ ঠিক করে। এতে তাদের ভুল বড় একটা হয় না।

এই সময় নদী থাকে খুবই শান্ত। হঠাৎ ঝড় তুফান উঠে তাদের কোন বিপর্যয় ঘটায় না। তাই দাঁড়ী মাঝিদের দেখা যায় 'গহীন' গাঙের পাড়ি ধরতে। নৌকোর পাল তুলে দিয়ে জ্যোৎস্না ঝলকান রাতে তারা গান ধরে :—

বিশ্বাশেতে রইলা মোর বন্ধুরে
ও আমার পরাণ বন্ধুরে।
তোমার সঙ্গে আমার মনের
মিল যেন হয় পর পারে।
(আর) বিধি যদি দিতরে পাখা
উইড়া যাইয়া দিতাম দেখা
আমি উইড়া পড়তাম সোনা বন্ধুর দেশে।
আমরা ত অবলা নারী
তরুতলে বাসা বান্ধিরে
আমার বদন চুয়ায়ে পরে ঘাম রে।
বন্ধুর বাড়ি গাঙের পার
গেলে না আসিবে আর
আমার বন্ধু না জানে সাঁতার রে॥
বন্ধু যদি আমার হও
উইড়া আইস্যা দেখা দাও,
তুমি দেও দেখা আমার জুড়াক পরাণ রে।

কিংবা কখনও কখনও শোনা যায় :—

ও আমার দরদী
আগে জানলে তোর এই
ভাঙ্গা নৌকোয় চড়তাম না।
আর দূরের পাড়ি ধরতাম না
(আর) এ নব যৌবনের বেসাত
ঐ নায়ে বোঝাই করতাম না।

কখনও কখনও দাঁড়ি মাঝিদের আক্ষেপের সঙ্গে এইরূপও বলতে শোনা যায় :—

চাচা কইও মোর জরুর কাছে
তার সেলাম জানাই পায়।
এখন বড় নৌকার মাঝি হইয়া
বইছিরে পাছায়।
(চাচা কইও মোর জরুর কাছে···)
যখন আমার কুদিন ছিল
ওসে ঠেলিল পাছায়
(ওসে) ঠেলিল বেশ করিল
ঠেকিল যে দায়।
চাচা কইও মোর জরুর কাছে
সেলাম জানাই পায়।

এসে গেল তুর্গো পুজো। বাড়িতে বাড়িতে বাজছে ঢাক, ঢোল। শোনা যায় শাঁখের মঙ্গল ধ্বনি। নদী পাড়ে ফুটে ওঠে কাশফুল, দীঘি পাড়ে ভোর বেলা নজর পড়ে ঝরা শিউলির দল। আনন্দের বুঝি বান ডেকেছে বাংলার ঘরে ঘরে। এই সময় নবমীর দিন রাত্রে পুজো বাড়িতে বাড়িতে শোনা যায় জারী ও খেউর গাইয়াদের গলা। জাতীতে তারা মুসলমান হলেও হিন্দু দেব দেবীর বিষয় গান গাইতে তারা ওস্তাদ। পূর্ববাংলার পল্লীগীতিকার কথা তুললে এই জারী গানগুলির বোধ হয় সব চাইতে বেশী দৌড়াত্ম্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষতঃ আমাদের এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের 'অকস্মাৎ' গীতগুলির অধিকাংশই এই জারী-গান। আমরা প্রসঙ্গান্তরে সে বিষয়ে বলব। আপাততঃ তুর্গো পুজো উপলক্ষে বাড়িতে বাড়িতে জারী ও খেউর গাইয়েরা যে গান গেয়ে থাকে সে বিষয়ে কিছু বলতে চাই। এই জারী গানের নমুনা স্বরূপ ধরা যাক :—

মানা হরছে তানার মায়
তিলাক জামাই হশুর বাড়ি যায়।
তিলাক যাবে হশুর বাড়ি
করে আয়োজন
ওসে টুপি কেনে তিন ডজন,

(আবার) জুইগ্যা গামছা লয় চেহন।
(আবার) ছেঁড়া পেরন তিনডা গায়
তিলাক জামাই হশুর বাড়ি যায়।
(আবার) তিলাক যাবে হশুর বাড়ি
সঙ্গে নাইকো টাহা কড়ি
(ও) সে টাহা জোগার হরছে
তানার মায়
তিলাক জামাই হশুর বাড়ি যায়।
(আবার) তিলাক যাবে হশুর বাড়ি
পয়সা আছে আনা চারি
(ও) সে পয়সা জোগার হরছে
তানার মায়
তিলাক জামাই হশুব বাড়ি যায়।
(ও) তিলাক ওঠছে গিয়া এক খান ভাঙ্গা নায়
(ও) তার নাই দাডের গুড়া
আছে এটটা পাইলমস্তরা
(ও) তিলাক ওঠছে গিয়া সেই নায়
তিলাক জামাই হশুর বাড়ি যায়।
(আবার) হাশুরী তাই দেখতে পাইয়া
কুদীরে কয় বোলাইয়া
'ও কুদী কমনে গেলি, অমনে আয়'
তিলাক জামাই হশুর বাড়ি যায়।
(ও) তারে শুইতে দিছে ভাঙ্গা ঘরে
মটকা বাইয়া জল পড়ে
এ পাশ ও পাশ কইরা গৈড়ায় রে
তিলাক জামাই হশুর বাড়ি যায়।

এবং :—

আইজ বুঝি তোরে যাবে লইয়ালো বুবুজান্
আইজ বুঝি তোরে যাবে লইয়া।

ও তুই কাঙ্খি কোনায় কাঁদিস ক্যানে
ঘোমটা মুড়া দিয়া লো বুবুজান
আইজ বুঝি তোরে যাবে লইয়া।
ও তুই রাগ করিস না ঘরে আয় বউ
চুল বাইন্ধা দেই
রাঙা ফিতা দিয়া
আইজ বুঝি তোরে যাবে লইয়া।
(আবার) পায় আলতা চোখে কাজল
খোঁপাটি বাঁধিয়া লো বুবুজান
আইজ বুঝি তোরে যাবে লইয়া।
টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ে
নায় নায় শুইয়া লো বুবুজান
আইজ বুঝি তোরে যাবে লইয়া।
ও তোর গলাতে হাশুলী দিব
নাহে নাক ছাবি লো বুবুজান
আইজ বুঝি তোরে যাবে লইয়া।

আমরা আগেই বলে নিয়েছি, জারী ও খেউড একই বস্তু। তবে এর মধ্যে যেটুকু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় আমরা তা দেখাচ্ছি :—

হিন্দুগো দুগ্‌গি পূজা
বেলপাতা তায় বোঝা বোঝা।
(ঐ) এক মাগী হিঙ্গের পরে
অসুরেরই টিক্কি ধরে
গলায় দিছে হাপ জড়াইয়া
বুকে মারছে খোঁচা
(আর) দুগ্‌গি দেখলাম চাচা।
এক বেটা তুম্বা বদন
দাঁত দুইডা তার মূলার মতন
কান দুইডা তার কুলার মতন
মাথাডা নেপা পোঁছা

(আর) তুগ্‌গি দেখলাম চাচা।
আছে ডাইনে বায়ে তুইডা ছেমরি
পইরা আছে ঢাহাই শাড়ি
ঘোরতে দেখছি বাড়ি বাড়ি
ঠসক দেহায় ভারী।
(আবার) আল্লায় যদি হবত দয়া
হরতাম নিহা তাবে।
(আবাব) মযুবেব পবে বইছেন যিনি
হেনাব বড কিচ কিচানী
(আবাব) গুটি কচ্ছেন কোচা
আহা তুগ্‌গি দেখলাম চাচা।
তায় হিন্দুগো তুগ্‌গি পূজা
বেলপাতা তায় বোঝা বোঝা
আবাব চন্নমেত্ত খাইয়া দেখলাম
ঽদা গাঙেব পানী
আহা) তুগ্‌গি দেখলাম নানা।

কিংবা:-

বাছা তোব বুঝি মা নাই বে
(ও) চাচায় পবছে সিমলাই ধুতি
চাচীর কানে সোনা বে
বাছা তোব বুঝি মা নাই বে।
(ও) চাচাব পোলায় পরে নূতন পিবান্
আর তবগো দেহি ছেডা তেনীব নেত।
বাছা তোব বুঝি মা নাই বে।
চাচায় চাবায় চডব মডব
চাচী খায় কডব মডব
কাঁসাব থালে কইরা
আবাব তবগো তুভাইর জন্য বুঝি
পোডা চাউলের গুডা
বাছা তোর বুঝি মা নাই রে।

এবং :—

আমার জাইত গেল বাইদার সাথে।
(ও) আমার জাইত গেল, মান গেল
কুলে রইল খোঁটা।
(আমি) পান খাইলাম, চূণ খাইলাম
তাতে না যায় জাতি
শ্যাষে জাইত গেল বাইদার সাথে।
(ও) আমি চিডল দাঁতে দিয়া মাজন (গো)
শ্যাষে চৌদ্দ নিহার পরে হইলাম
বুড়া বাইদার ঘরণী
আমার জাইত গেল বাইদার সাথে।

জারী গান কখনও কখনও নিম্নলিখিতরূপেও শোনা যায় :—

দোহার গন :— (ধুঁয়া)
ও পিয়াল বনের পাখী
কাইল আসিবে বলে গেলে
আমায় দিয়া ফাঁকি।
(ও পিয়াল বনের পাখী)।

১ম গায়ক :— আমি পেরথমে বন্দনা করি
শিক্ষা গুরুর পায়
গুরু ভক্তিতে বিদ্যা লাভ
জানিবে নিশ্চয়।

২য় গায়ক :— আমার গুরু কেনারাম বালা
জলিরপারে ঘর
তার কাছেতে আমার ঋণ
থাকবে জীবন ভর।

১ম গায়ক :— তার পরে বন্দনা করি
দেবী সরস্বতী।
যার দৌলতে ছাশ বিদাশে
জারী গাহেন করি।

দোহার গন :— ও পিয়াল বনের পাখী
কাইল আসিবে বলে গেলে
আমায় দিয়া ফাঁকি।

এই ধরনের গানগুলিকে বলে সভা বন্দনা। এই সভা বন্দনার ব্যাপারে এক এক দলের এক একটা স্বতন্ত্র রীতি আছে। আমাদের আগের গানে দেখেছি সভাবন্দনা প্রথমে শুরু করে দোহারবৃন্দ, পরে গায় মূল গায়ক। কিন্তু অধিকাংশ জায়গায় দেখা যায় মূল গায়কই প্রথমে গায়, দোহাররা তার কথার তান ধরে মাত্র। নিম্নের গীতখানা লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে মূল গায়ক কোন একটি কথা বলে সর্বপ্রথম পট উত্তোলন করে, পরে দোহাররা তার সেই গানের কলিরই প্রতিধ্বনি করে। আর বক্তব্য যা কিছু মূল গায়কই বলে :—

মূল গারক :— গুণের ননদ লো
পাখী ডাকে বৌ কথা কও।
দোহারগণ :— পাখী ডাকে বৌ কথা কও লো ননদী
পাখী ডাকে বৌ কথা কও।
মূল গায়ক :— আমি পেরথমে বন্দনা করি
ব্রাহ্মণেরি পাও
ঐ লুচি মণ্ডার গন্ধ পাইলে
পাহাড় ভাইঙ্গা ধাও
দোহার :— গুণের ননদ লো
চাউল কাড়াইতে দোসর পাইলাম না। (২)
মূল গায়ক :— আমি তারপরে বন্দনা করি
বোষ্টমেরি পাও
(ঐ) দধি চিড়ার গন্ধ পাইলে
বিল সাঁতরাইয়া ধাও।
দোহার :— গুণের ননদ লো
পাখী ডাকে বউ কথা কও। (২)
মূল গায়ক :— আমি তার পরে বন্দনা করি
বড় বড় পান

অন্যায় যদি বলেন কিছু
তয় কাইট্যা দিমু কান।

দোহার ঃ— গুণের ননদ লো
পাখী ডাকে বউ কথা কও। (২)

মূল গায়ক ঃ— আমি তার পরে বন্দনা করি
বড় বেতের শীষা
অন্যায় যদি বলিস কিছু
তয় ঐ বেটা তার পিশা।

দোহার ঃ— গুণের ননদ লো
চাউল কাড়াইতে দোসর পাইলাম না। (২)

মূল গায়ক ঃ— আমি তার পরে বন্দনা করি
সভা জনের পাও
(ঐ) যার দৌলাতে চৈত্র মাসে
ছাতু চিড়া খাও।

দোহার ঃ— গুণের ননদ লো
চাউল কাড়াইতে দোসর পাইলাম না। (২)

মূল গায়ক ঃ— আমি তার পরে বন্দনা করি
টিনের ঘরের কোণা।
অন্যায় যদি বলিস কিছু
খাবি তয় টাট্টু ঘোড়ার চোনা।

দোহার ঃ— গুণের ননদ লো
পাখী ডাকে বউ কথা কও। (২)

মূল গায়ক ঃ— আসি তার পরে বন্দনা করি
বড় বড় শুপারী
অন্যায় যদি বলিস কিছু
তয় বাইস্থানী তোর হাশুড়ী।

দোহার ঃ— গুণের ননদ লো
পাখী ডাকে বৌ কথা কও। (২)

মূল গায়ক :— আমি তার পরে বন্দনা করি
পার্বতীর পাও
এই হারা রাত্তির জারী গাইয়া
কালাইনা ভাত খাও।

দোহার :— আহা—বেশ—বেশ।

মূল গায়ক :— আমার এ গানের তারিফ করে কেডা ?

দোহার :— ঐ ক্যাফাউল্লার মায়

মূল গায়ক :— (ও) তাই নাস্তার থামার (বাসন) ঠেইল্যা থুইয়া
বাতাস দেয় মোর গায়।

দোহার :— আহা—বেশ—বেশ।

মূল গায়ক :— আমার এই গানের যে করিবেন হেলা
কত শত দুঃখ পাবেন বাহি যাবার বেলা।

দোহার :— আহা—বেশ—বেশ।

মূল গায়ক :— যত কিছু কর ভাই আগে আর পাছে
কোন যুক্তি খাটিবেনা ঘর পোড়ার কাছে।
এখনও ভাই সময় থাকতে সভাতে জানাই
ঐ যা কিছু কইছি মোরা তানারই দয়ায়।

দোহার :— আহা—বেশ—বেশ।

মূল গায়ক :— এই খানেতে এই সভাতে
কথা সাঙ্গ করি
খোদাতাল্লার নাম লইয়া ভাই
যাবার যেন পারি।

পূর্ব বাংলার শরৎকালীন গানের মোটামুটি পরিচয় দিলেও, শরৎকাল সম্বন্ধে আমাদের পিপাশু পাঠকের মনে জেগে থাকে আগমনী গানের কথা। পশ্চিমবঙ্গের পল্লী অঞ্চলে এবং শহরেও যেমন শোনা যায় :—

"আয় মা উমা করি কোলে"

কিংবা "যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী
উমা আমার কত কেঁদেছে"

পূর্ববঙ্গে ঠিক তেমনটি শুনতে না পেলেও ঐ ধরনেরই কিছু গানের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায় পল্লীর উদাসী বাউলদের মুখে। তাকে ঠিক আগমনী আখ্যা দিতে না পারলেও প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি :—

গিরি রাজার কইন্যা গো উমা, কেঁদে কেঁদে হলেন সারা
অশ্রু ধারায় নদী বয়ে যায়।
বছর একটি গেল ঘুরে, বাপের বাড়ি যাবাব তবে
অভিমানে কথা কয় না, গোসা ঘরে ধায়।
মর্ত্যলোকে গিরি রাণী, বাজাকে কহেন ডাকি
উমা বিহনে আমি কেমন করে থাকি ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"মেরে তো গিরি ধারী গোপাল
দু সরা না কোই।
যাঁকো শির ময়ুর মুকুট
পতি সোই।"
—মীরাবাঈ

সুখের পর দুঃখ। এই নাকি জগতের রীতি। শরৎ চলে গেল তার হাসিমাখা দিনগুলি নিয়ে। মাঠ ঘাটের জল শুরু হল কমতে। কিন্তু পথঘাট তবুও একেবারে শুকোয় না। নৌকোও সব জায়গায় চলাচল করতে পারে না। চারিদিক কাদা আর নোংড়া জল। দেখা দেয় কলেরা মহামারী রূপে।

কলেরা চিরকালের ব্যাপার না হলেও, আষাঢ় শ্রাবণ মাসে যেমন উদরাময় রোগের দৌড়াত্ম্য লক্ষ্য করা যায়, এই কার্তিক মাসটাকেও তেমনি একটি ভীতিজনক মাস বলে ধরে নেয় এই সব অঞ্চলে—কলেরার প্রাদুর্ভাব ঘটে এই সময়ই বড্ড বেশী রকমের।

ঘরে ঘরে রোগ। কে কার সেবা করে? গভীর থম থমে রাতে অনবরত কানে আসে 'হরিধ্বনি' ও কান্নার রোল। ঘরে বসেও শান্তি নেই। মৃত্যুর ছায়া যেন ঘুরে বেড়ায় ঘরের আনাচে কানাচে। এর সঙ্গে ঐকতান বাজিয়ে ডেকে ওঠে রাতচোরা পাখী, গাছ কাটার শব্দ হয় খট্ খট্ খটাস্—গ্রামের উপর ছড়িয়ে পরে একটা বোবা নিস্তব্ধতা।

কিন্তু তাই বলে মানুষের বাঁচার প্রচেষ্টাও কম নয়। দেশে যখন এই রকম একটা ভীতিজনক পরিস্থিতি তখন দেশের যুবক ও প্রৌঢ়ের দল একযোগে শুরু করে কীর্তন গাইতে। এদের মূল উদ্দেশ্য হরিনামের অভয় বাণীতে দেশের লোকের মন থেকে দূর করে দেবে ভয়, আনবে তাদের মনে আশা, শমনকে করবে তারা পরাস্ত।

শমনকে দূর করা সম্ভব কিনা জানিনা। তবে এই রকম দুর্যোগের দিনে সারা রাত ধরে যদি বাড়ির পর বাড়ি, উঠোনের পর উঠোনে এই রকম গান

বাজনা চলে তৱে স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে যে অন্ততঃপক্ষে কিছুটা সাহসের সঞ্চার করে এ◌ংবিষয়ে আমরা একমত।

দল তাদের বেশ পুষ্ট হয়। সঙ্গে থাকে খোল, করতাল, জুরী আর থাকে পাঁচ মিশালী গলার সমবেত সঙ্গীত। কোন কোন বড দলে বেহালাও দেখতে পাওয়া যায়। তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান গায় :—

আমার হরিবোল বলা হল না।
আমি মুখে বলি হরি, কাজে অন্য করি
প্রেম বারি চোখে বহে না।
(ও) প্রাণ গোবিন্দ বলিয়ে দু বাহু তুলিয়ে
মন প্রাণ কেন কাঁদে না।
মধুর হরিনাম রসে বেড়াইব ভেসে
রূপ রসে হব মগনা।
শুনেছি পুরাণে সাধু গুরুস্থানে
হরিনামের নাই তুলনা।
আমার দশে ছয়ে ষোল তারা বাদী হল
ভুলাইতে করে ছলনা।
আমি যখনি যা করি যাত্রা কালে হরি
শ্রীহরির নাম যেন ভুলি না।

এবং :—

হরি বল মন রসনা, তোর সময় বয়ে যায়।
দিন থাকতে জগৎবন্ধুর যুগল চরণ কররে আশ্রয়॥
নিতাই নিত্য কল্পতরু, দয়াল নিতাই প্রেম দাতা গুরু
জীবের জন্য অবতীর্ণ হল নদীয়ায়।
এই যে মধুর হরিনাম গোলোকে গোপন ছিল
শ্রীমতীর ভাণ্ডারের ধন নিতাই এনে জীবকে বিলায়
জীবকে বিলায় গো এই সুধামাখা হরিনাম।

কিংবা :—

নেচে নেচে চলে বাহু তুলে
করে মধুর সঙ্কীর্তন।

গৌর নিতাই দুভাই এসে
নাম বিলাইছে দেশে দেশে।
জাতীর বিচার নাই তার কাছে
যে জনে বলে হরিবোল
তাবে ধরে দিচ্ছে কোল
তারা আমার প্রেমের পাগল।
জীবের জীবন হরিনাম যে করে গো
নেচে নেচে বাহু তুলে তুলে।

কখনও বা :—

জীব তবাতে গৌর নিতাই হরিনাম দেয়,
নদেবাসী পুরুষ নারী পিছে পিছে ধায়।
ধর নেও,ধর নেও বলে প্রেমধন যাচে,
নদেবাসী পুরুষ নারী হরি বোলে নাচে,
নেচে বেড়ায় গো হরিনামের প্রেম হিল্লোলে।

অথবা :—

নদেবাসী পুরুষ নাবী কবে মধুব নাম সঙ্কীর্তন
নিত্যানন্দের গলা ধবে, মহাপ্রভু করে রোদন।
ক্ষণেক ক্ষণেক উন্মাদের প্রায়
হাসে কাঁদে নেচে বেড়ায়।
ক্ষণেক গড়াগড়ি ধূলায়
রাধা বলে হয় সচেতন।
দেখে যত কুল বালা, কাঁদছে ফেলে কোলেব ছেলে
মুখে হরি হরি বলে গৌর পদে নিল স্মরণ।
হরিনাম যে কবে গো, ভক্তবৃন্দ সঙ্গে করে।

আতঙ্কের ভাবটা কিছু কমে। তখন তারা শুরু করে কোন এক প্রকাশ্য স্থানে—সাধারণতঃ কোন বড় গৃহস্থের আটচালায় বসে হরির লুট দিতে। এই হরির লুট দিয়েই তারা সে বছরের মত তাদের নগর কীর্তনের পালা শেষ করে। ধূপ, দীপ জ্বালিয়ে বাটায় করে বাতাসা সাজিয়ে দিয়ে তারা গান ধরে :

লুট পইরাছে লুটের বাহার
লুটে নেরে তোরা।
চিনি সন্দেস ফুল বাতাসা
মোণ্ডা জোরা জোরা।
দুইদিকে খোল করতাল বাজে
মধ্যে নাচে ব্রজের ননী চোরা।
(আবার) লুট পইরাছে লুটের বাহার
লুটে নেরে তোরা।

গেল ভয়েব দিন। পথ ঘাট যেটুকু শুকতে বাকী ছিল এবার তাও গেল শুকিয়ে। যেন কোন গৃহস্থ বধূ এইমাত্র নিজ হাতে তার আঙ্গিনা পরিষ্কার করে ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে।

অগ্রহায়ণ মাস। শুরু হয়ে গেছে ধান কাটা। প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়িই আজ কর্মমুখর। বাড়িতে বাড়িতে উঠোনের মাঝে দেখা যায় ধানের বোঝা। আর সেই তরুণ শীতেব শেষ প্রহরে গাঁএর উদাসী চারণ কবি খোল করতাল সহযোগে শুভ নববর্ষের প্রভাতে বাড়ি বাড়ি ঘুবে (আগে অগ্রহায়ণ মাসই ছিল বছরের প্রথম মাস। সেই থেকেই এই রেওয়াজ চলে আসছে) ঘুম ভাঙ্গায় গৃহস্থ ও কুল বধূদের :—

ভোর সময় কালে শ্রীবাস আঙ্গিনা মাঝে
গহুর চাঁদ নাচিয়া বেড়ায় (রে)
উঠ উঠ শচীমাতা নিতাই এল প্রেম দাতা
জগৎ মাতাইল হরি কাঁদিয়া রে।

ভোর হয়। কৃষাণেরা অনেক আগেই ক্ষেতে চলে গেছে। গৃহস্থেবাও সব বার হয় ক্ষেতের কাজ দেখতে নয়ত ব্যস্ত থাকে সদ্য আনীত ধানগুলির ব্যবস্থা করতে। সময় যেন আর তাদের এক মূহুর্তও নেই। সারাদিনই এইভাবে ধান ঝাড়াই ও ধান তোলা নিয়ে থাকে ব্যস্ত। কিন্তু এই ব্যস্ততার মধ্যেও দেখা যায় বৈরাগীরা বসে গান গাইছে খঞ্জনী বাজিয়ে আর তারা শুনছে এক মনে :—

কিসে মন যাবে বৃন্দাবন
গুরুর কৃপা না হলে মিলবে না শ্যামের শ্রীচরণ।

অন্ধ বলে আছে শ্যাম, গুরু বৃন্দাবনের শ্যাম চিকণ
মিলবে না সে শ্যামের চরণ।
লোভ কামের কার্য নয় রে
এযে কর্ম ভাগ্য দোষ।
প্রেমেতে প্রমত্ত হয়ে আগে গুরুর চিন শ্রীচরণ
পশ্চাতের ঐ মরণ বাঁচন করনা সন্ধান গো।
কালাকাল পাত্র বিচার করে
সাধন ভজনে হও মগন।
প্রেমমত্ত না হলে সাধন ভজন গেল রসাতলে
হয়ত ব্যাপার করা দূরের কথা
আসল শেষে ডুববে জলে
সখীগণ সব গত হলে
আগে নিবে শিক্ষা কর
রূপের ঘরে জ্বলবে বাতি, করি আনন্দে মগন
গোঁসাই রাজার চরণ পেলে
অধিকার হবে করিতে সাধন

কিংবা কখনও কখনও এরূপও শোনা যায়ঃ—

মন তুমি বোঝগো না
গুরু বিনে আমার সাধন ভজন
হবে গো না।
গুরু আমার দেহের অতি
যেন অন্ধকারে জ্বলছে বাতি
রসিক সুজন বিনে কইতে গো মানা
গুরু বিনে আমার
সাধন ভজন হবে গো না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"হারে সই শুনি যবে বাঁশীর নিশান
গৃহ কাজে ভুলি প্রাণ করে আন চান।
সতী ভুলে নিজ পতি, মুনি ভুলে মৌন
শুনি পুলকিত হয় তরুলতাগণ।"

—চণ্ডীদাস।

ধান কাটা এবং তা' ঝেরে মুছে গোলায় তোলা হয়ে গেছে। শেষ হয়ে গেছে নবান্ন উৎসব ঘরে ঘরে। প্রত্যেক দরজায় সাক্ষ্য দিচ্ছে "আগ" তোলার চিহ্ন। কুলবধূদের হাতে আঁকা আলপনার দাগও আস্তে আস্তে যাচ্ছে মিলিয়ে। শুরু হয় আবার তাদের একঘেয়ে জীবনযাত্রা।

অগ্রহায়ণ মাস থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত এই অঞ্চলের জীবন ধারা এবং জীবন-যাত্রা প্রণালী বয়ে যায় প্রায় একই খাতে। বিশেষ কোন কারণ না থাকলে তাদের জীবন যাত্রা হয়ত অসহ্যই হয়ে উঠত। কিন্তু তা' হয়নি।

এই কটা মাসেব মধ্যে বৃষ্টি যেমন কম—এক রকম নেই বললেই চলে, রোদের প্রখরতাও সেই অনুপাতে কমই। ফসল কাটা এবং বুননেরও বিশেষ কোন তাড়া থাকে না। গোলা ভরা প্রত্যেকেরই প্রায় ধান থাকে মজুত। অনেকেরই তখন খাবার ভাবনা একরকম থাকেই না। তাই এমন দিনে কি সত্যই এবা চুপ করে বসে থাকে?

না। তা থাকে না। শরতে যেমন হয় এই গানের উন্মেষ, তেমনি এই কয় মাসে হয় এর পূর্ণ বিকাশ। আমাদের বিবেচনায় পল্লী গীতিকার অন্যান্য সমস্ত শাখার কথা বাদ দিয়ে যদি মাত্র এই সময়কার চলতি গানগুলিকেই পল্লীগীতিকার প্রতীক বলে ধরেনিই তা' হলেও বোধ হয় কারও কোন আপত্তি উঠতে পারে না।

গৃহস্থ বধূগণ নিশ্চিন্ত মনে ঘরের কাজ করে। কেউ করে রান্না বান্না কেউবা গৃহস্থালীর অন্যান্য কাজ। এমন এক শান্ত দুপুরে তাদের কানে আসে বৈরাগীর কণ্ঠস্বর। আর তার সঙ্গে তান ধরে বেহালার করুণ স্বর। কুললক্ষ্মীরা ঘরের কাজকর্ম ফেলে একমনে তন্ময় হয়ে শুনতে থাকে:—

দাঁড়ারে দাঁড়ারে নিমাই তোরে দেখিব বলে
রইয়াছি বইসা রে নিমাই
ছাতি, জুতা, জামা কাপড নিমাই রইয়াছে ঘরে
নগরে মাগিও ভিক্ষা দিনান্তের পরে।
সন্ন্যাসী না হইও রে নিমাই
বৈরাগী না হইও
ঘরে বসে অভাগীরে
মা বলে ডাকিও।
কোথা থিকা আইল রে গুরু
বসতে দিলাম ঠাঁই
সেই হইতে মোর নিমাইর মুখে
মা বলা ডাক নাইও রে নিমাই
(মা বলা ডাক নাই)।
(আবার) ঘরের বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া
যেন জ্বলন্ত অগনি (গো)
(ও) তাব উন্মত্ত যৌবন সে
কারে সঁপে দেবে (গো)
(কারে সঁপে দেবে)।
দেখরে নদীয়া বাসী
দেখগো চাহিয়া
নিমাই চাঁদ সন্ন্যাসে যায়
তার জননী ছাডিয়া
(রে নিমাই জননী ছাড়িয়া)॥

বৈরাগী চলে যায়। কিন্তু তার গানের রেশ বাতাসের বুকে ভর কবে ধ্বনিত হতে থাকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত।

কোনদিন হয়ত এই রকমই এক আচমকা মুহূর্তে আবির্ভাব ঘটে কোন এক বৈরাগীর। সে তার খঞ্জনী বাজিয়ে গান ধরে :—

আর কি কুলে রব লো সখী
আর কি কুলে রব।

কালিয়া কালিয়া বিষম কালিয়া
কে বলে কালিয়া ভালো!
কালিয়ার সনে পীরিতি করিয়া
কাঁদিতে জনম গেল (লো সখী)
(কাঁদিতে জনম গেল)।
এ পারে বসিয়া সিনান করিতে
ও পারে লাগিল ঢেউ
(আর) হাতের ইসারায় কত বা বুঝাব
আমরা কুলের বউ।
মৃত্তিকা উপরে জলের বসতি
জলের উপরে ঢেউ
ঢেউয়েরই সনে পবনের পীরিতি
নগরে জানেনা কেউ (লো সখী)
(নগরে জানেনা কেউ)।
(আবার) মৃত্তিকা উপরে ফুলের গাছটি
তাহাতে ধইরাছে ফুল
ফুলের উপরে গুঞ্জরে ভ্রমরা
মজাইয়া গেল দুই কুল।

কখনও কখনও নিতান্ত সাধারণ গাইয়াদের মুখেও শোনা যায়ঃ

হায়রে পিতলের কলসী
তোরে লইয়া যাব যবুনায়।
যবুনার জল কালো
পিতলের কলসী ভালো
(আবার) কাপড় দিয়া যৈবন দেখা যায়
লো পিতলের কলসী।
যখন তারে মনে করি
অমনি গলা জড়িয়ে ধরি
(আবার) প্রাণের টানে, প্রাণে প্রাণে
প্রাণ মিশায়ে রই

(হায় লো) পিতলের কলসী
তোরে লইয়া যাব যমুনায়।

কিংবা কখনও কোন উদাসী বৈষ্ণবের মুখেও শোনা যায় :—

আর বাঁশী বাজাইও না শ্যাম রায়
(ও) বাঁশী শুনে কলসী কাঁখে
যখন আমি জল আনিতে যাই
(ও) তুমি পবন হয়ে ঢেউ দিয়ে তায়
দূরে ঠেলে দেও
আর বাঁশী বাজাইও না শ্যাম রায়।
ঢেউ দিওনা, ঢেউ দিওনা, ঢেউ দিওনা কলসী
ঢেউ দিলে হবে পাতকী।
(ও) তার বাঁশী শুনে মনের আগুন চাপতে গিয়ে
রান্নাঘরে যাই
আর ধূঁয়ার ছলে বসিয়া বসিয়া
কান্দিরে শ্যাম রায়॥

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে মৈমনসিংহ গীতিকার 'কঙ্ক ও লীলা'র কাহিনী :—

"বন্ধুরে আরে বন্ধুরে যেদিন শুন্যাছি তোমার বাঁশী।
কুল গেল মান গেল বন্ধু হইলাম তোমার দাসী রে॥
অন্তরারে কইয়া বুঝাই বন্ধু বুঝ নাই সে মানে।
মন যমুনা উজান হইল বন্ধু তোমার বাঁশীর গানে রে॥
মানায় ত না মানে মন দ্বিগুন উথলে।
তোষির আগুনে যেমুন ঘুষ্যা ঘুষ্যা জ্বলে রে॥
কাঞ্চনা বাঁশেতে বন্ধু ধরিয়াছে ঘুন।
(আবার) অন্তরাতে লাগল আগুন বন্ধু চক্ষে নাই সে ঘুম রে॥
তোমারে ছাড়িয়া বন্ধু সুখ নাই সে চাই?
যোগিনী সাজিয়া চল কাননেতে যাই রে
চন্দন মাখিয়া কেশে বানাইব জটা
সংসারের সুখের পথে বন্ধু দিয়া যাইতাম কাঁটা রে॥"

অথবা :—

গহুর রূপ দেখিয়া হইয়াছি পাগোল
ঔষধে আর মানে না
চল সজনী যাইলো নদীয়ায়।
(আবার) গহুর কাঁটা, বিষম কাঁটা
ঠেকলে কাঁটা খসান দায়
চল সজনী যাইলো নদীয়ায়।
গৌরাঙ্গ ভূজঙ্গ হইয়া দংশিয়াছে আমার গায়
চল সজনী যাইলো নদীয়ায়।
(আবার) প্রেমের বিষে যেমন তেমন
গহুর বিষে প্রাণ যায়
চল সজনী যাইলো নদীয়ায়॥

আসে আত্মভোলা বাউলের দল।

বাউল বলতে বিশেষ কোন ছাপ দেওয়া লোক যে নেই একথা বলাই বাহুল্য। বাউল, বোষ্টম (বৈষ্ণব) বা বৈরাগী, উদাসী এদের বেশভূষাব বাহ্যসৌষ্ঠব যদিও একই বকম, তবুও একজনকে অপর থেকে পৃথক কবে চিনে নেবাব উপায়ও একটু আছে।

সাধারণতঃ বৈরাগীদেব কাপডচোপডেব রং সব সময় যে গৈরীক বর্ণেরই হতে হবে এমন কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নেই। এরা একই সঙ্গে নানা রকমেব গানই গায় পক্ষান্তবে উদাসী বা বোষ্টমদের গৈরীক বস্ত্র পবিধানই বিধেয়। বাউলদের পোষাক অনেকটা উদাসীদের মতই। তবে উদাসী বা বোষ্টমদের মত বাউলেবা গলায় কন্ঠি ধারণ করে না। আর তাছাড়া একমাত্র বোষ্টমরাই বোষ্টমী পুষে থাকে। এই সাধারণ পার্থক্য ছাডাও মস্তবড পার্থক্য হ'ল বৈরাগী বা বোষ্টমদের গানে যেমনি মূর্ত হয়ে উঠেছে রাধা-কৃষ্ণের বিরহ মিলন কথা, বাউলদেব গানে তেমনি অপূর্বভাবে শোভা পাচ্ছে দেহতত্ত্ব বিষয়ক কথা। এই গানেই বাউলদের প্রধান বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। তারা এক কথায় সাধক। তাই তাদেব গান একাধারে যেমনি মার্জিত অন্যধারে তেমনি তত্ত্বপূর্ণ :—

হারালাম একুল, আর ও কুল
কবে ফুটবে আমার বিয়ার ফুল।

যাব চলন করি, বাঁশের দোলার চড়ি
জাত বেহারার স্কন্ধে চড়ি, সফল হবে ভুল ॥

আগে পাছে কাষ্ঠের বোঝা,
ছেড়ে দিয়ে ভবের মজা
শ্বশুর বাড়ি যাব নদীর কূল।
গেলে শ্বশুর বাড়ি, সবে ত্বরা করি
স্নান করাবে মোরে, করি গণ্ডগোল।
বরণ কুলাতে দিবে বর শয্যায় শোয়াইবে
আট কড়া কড়ি দিবে তুলসীর মূল ॥

বর যাত্রীগণ, করাইবে বরণ
জনমের মত দিবে তেনা চারি আঙ্গুল।
উত্তর শিয়রি কৈরে, হাত পা ভাঙ্গিয়া মোরে
অনল জ্বালিয়া শেষে করিবে নির্ম্মূল ॥

হয়ে মর্মাহত, জ্ঞাতি বর্গ যত
যোগ্য পুত্র হবে তার অনুকূল।
ঘৃত চন্দনাদি করিবে আহুতি
আগে পুড়িবে আমার মাথার চুল ॥

ভাই বন্ধু যত, সব দন্তের মত
শোকেতে কাঁদিয়া হইবে আকুল।
অভাগিনী জননী জনম দুঃখিনী
বুকেতে বাঁধিবে দুঃখেরি বাটুল ॥
যতেক নায়রী, সবে গড়াগড়ি
ভূমেতে পড়িয়া এলাইবে চুল
(তখন) স্ত্রী গিয়ে পাছ দুয়ারে
কাঁদবে বসে উচ্চৈঃস্বরে
(হায়) কে খাওয়াবে মোরে, গেল জাতি কুল ॥
বঙ্কিম বলে ভাই, সকলকে জানাই
এ বিয়া ফিরাইতে লাগবে হুলুস্থুল

যখন আসবে নিতে, ঘটক রবি সুতে
পারবে না রাখিতে দেখাবে ত্রিশূল ॥

এবং :—

বেলা গেল পারে চল
(মন তোর) কোম্পানী জাহাজ সরে যায়।
টিকিট মাষ্টার রাই কিশোরী
তারে চিনা বিষম দায় ॥
রেল গাড়ির টিকট করে
পয়সা যে তোর নিল হরে।
খালি জাহাজ ঘাটে এল
হুইচেল ধ্বনি শোনা যায়।
ছয় পেসেঞ্জার টিকিট লয়ে
গাড়ি পেলে উঠবে যেয়ে
ভাঙ্গা জাহাজ ঘাটে বান্ধা
শেষে করবি হায়রে হায় ॥
এই সাধের জাহাজ খানি
হরিচাঁদ তার আগুন মাঝি।
গোঁসাই হিরামন তার সন্ধ জানে
ডাকে তোরা পারে আয় ॥
রেল জাহাজে চৈত্র মাসে
ওড়াকান্দির মেলায় আসে
দুলাল কেন রলি বসে
টিকিট করগে সেই মেলায় ॥

মানুষের মৃত্যুকে কীভাবে এই বাউলের দল বিবাহের সঙ্গে এবং শবযাত্রাকে বিবাহযাত্রার সঙ্গে তুলনা করেছে এর পরিচয় আমরা একটু আগেই দেখতে পেয়েছি। এই ধরনের গান অনেক সময় বোষ্টমের মুখেও শোনা যায় :—

হায়রে মন কবে তুই যাবি শ্বশুর বাড়ি (রে) ॥
ও তোর পথ খরচের জন্য দিবে অষ্টগণ্ডা কড়ি রে ॥

তোবে দিবে কবাল বিছানা, ভাঙ্গা চাটাই ছেঁড়া তেনা
আস্ত বাঁশেব লাঠি একখানা, অতি যত্ন কবি,
তোবে আচ্ছামত কসে বাঁধবে দিয়ে তিন হাতি দড়ি (বে) ॥
প্রতিবাসী আছে যাবা, তোব চলনে যাবে তাবা
জন চারি হবে বেহাবা, নিবে স্কন্ধে কবি,
তাবা কেহ নিবে কোদাল কুড়াল,
কেহ নিবে জলেব হাড়ি (বে) ॥

তোবে জন্মেব মত লযে যাবে
পিছে গোবব ছড়া দিবে
ভাই বন্ধুগণ কাঁদবে সবে, কবি গড়াগড়ি (বে) ॥

দিবে তিল তুলসী ফুটা কলসী
দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি (বে) ।
শ্মশান ঘাটে নিযে তোবে
কবে ফুল বিছানা চিতাব পবে ।
শোয়াবে জন্মেব তবে, বলে হবি হবি ।
তোব জলপান কবিতে মুখে
জ্বেলে দেবে খড়ি (বে) ॥

প্রভু জগদীশ কয ওবে দুলাল
চেযে দেখ সাধেব শ্বশুব বাড়ি
বাঁচতে যদি চাস বে তবে সাধন কব
ঐ গুরুব চবণ, কবিস না আব দেবী
নইলে তোব এই সোনাব অঙ্গ
ছাই হবে সব পুড়ি (বে) ॥

এবং :—

ও তুই দিন থাকতে গুরু চাঁদকে
উঠা নৌকাব পব ।
নইলে বৌদ্র উঠে যাবে চটে
শেষে দোহাই দিবি কাব ॥

ছয় বোম্বেটে আছে নেয়ে
তারা আস্তে আস্তে নেবে বেয়ে
তোবে ছেড়ে দিবে ঘোলায় নিয়ে
কেন্দে কেন্দে কুল পাবিনা আর ॥
গুরু চাঁদকে দে হালের কাঁটা
হরি চাঁদ আপনি এসে টানবে বৈঠা।
এবার ফটিক চাঁদকে গুনে পাঠা
(ও তুই) নৌকায় বসে মুন্সীগিবি কর ॥
ঐ কয় জনাকে নৌকা দিয়া
নৌকায় বিছানা পেতে মন
ও তুই থাকগে শুয়ে।
তোকে আস্তে আস্তে নিবে বেয়ে
ভবনদীব পাব ॥
মোহন বলে ফটিক, জগবন্ধু
দিতে হবে আমায় চবণ বিন্দু
পাব কবতে হবে ভব সিন্ধু
নইলে মনি ছাড়া নাই (এবার) ॥

অথবা ঃ—

হায়বে সাধের খাঁচা, পড়ে রবে সাধের খাঁচা
আমি ময়না বলে পুষলাম যাবে
সে হয়ে গেল ভূতুম পেঁচা ॥
শুনব ময়না পাখীব কৃষ্ণ কথা
এ অদৃষ্টে হল না তা'
এখন ভূতুম পেঁচায় ঘুবায় মাথা
এই ছিল কপালে।
আবার গোলায় চারটা ধান ছিল
তা' খেয়ে গেল ইন্দুরে
এখন পাতলে কি হয় গাবের ঢেঁকী
ভানবি কি ধান খালি মাচা ॥

এখন হুতুম পেঁচায় ভেস্কি মারে
দেখে মোর ভয় করে
আমি দৌড়ে যাব গুরুর ধারে
সামনে কাঁটার বেড়া।
আমি কাঁটার ওপর লাফ দে যাব
করছি বিবেচনা।
এদিকে পাঁচা শামুকে পা কাটিল
আবার সামনে দেখি বাঘের বাচ্ছা॥
কাঁচা বাঁশেব খাঁচা খানি
বিনা যত্নে গেল ঘুনি
করলে কি হয় টানা টানি
(আমার) ছাও পোষা কি হল না ?
এখন বনেব ধারে সাপ খেলাচ্ছিস
হায়রে সাধের মজা,
ওদিকে বিড়াল এসে খেল বসে
ঘৃত ভরা মধুর আঁচা॥
প্রভু জগদীশ কয় ওরে দুলাল
(ও তুই) কবলিনা প্রাণের পাখীর যতন
হায়রে সুধা জ্ঞানে বিষ ভক্ষণে
পেট ফুলে যেন মরে না।
এখন ভাই হরি বলে বাহু তুলে
কাঁদলে দিন দুই যাবে বাঁচা॥

বোষ্টম এবং বাউলের গান শুনলেন। এইবাব আপনাদের উদাসীর গানের সঙ্গে কিছু পরিচয় করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি :—

ওব জন্য কান্দিস না তোরা
ওযে ভারি নিমক হারা॥
ওযে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন
ত্রেতা যুগে রাম নারায়ণ।

মা জননী দিয়েছিল বন
এ হল ওর কাজের ধারা ॥
দ্বাপরে সেই বৃন্দাবনে
ধেনু চড়াত রাখাল সনে
আবার ফাঁকি দিল গোপীগণে
কেঁদে হল সারা ॥
কলিতে যে নদেপুরে
গোলকের ধন আনল হরে
বিলায় নাম জগৎ ভরে
উৎকলে লিপ্ত ঐ রামের গোরা ॥
উৎকল হতে কেন্দুয়া এসে
ঘুরে বেড়ায় পাগল বেশে
যুবা বুড়া দৌড়ায় পিছে
আচ্ছা মধুর মনোচোরা ॥
মোহন বলে কাঁদলে কি হয়
ও দেখনা জগৎ কাঁদায়
অনুরাগের ভুরি কসে
আপনি এসে দেবে ধরা ॥

কিংবা ঃ—

করি হরি চাঁদের চিন্তা
যদি যাবি মন ভব পারে।
ও পারের সম্বল হরি যে ধন
রাখ সে ধন যতন করে ॥
মুখে হরি হরি বল
মন তোর ভব পারের সময় গেল।
মিছে কথায় দিন ফুরাল
ভুলনা তার সেই অধরে ॥
ভক্ত, ত্রেতা যুগে ছিল বীর হনুমান
দ্বাপরেতে ব্রজের গোপীগণ

কলিকালে করল নিতাই
হরির নাম বিলায় ঘরে ॥
ঐ দেখ শেষের লেখা প্রকাশিল
এসে 'ওড়া কান্দি' উদয় হৈল
গোঁসাই হিরামণ সেই চাঁদ ধরিল
চলে গেল ব্রজপুরে ॥
এ দীন দুলাল বলে
রেখ হরি চরণ তলে
পার করহে তব কৃপা বলে
বলি যেন হরে হরে ॥

আমরা পূর্বেই বলে নিয়েছি, বাউল, বৈষ্ণব বা বোষ্টম, বৈরাগী বা উদাসী এদের গানের ব্যাপার অনেকটা একই ধরনের। বিশেষতঃ বাউলের দেহতত্ত্ব বিষয়ক গানগুলি বাদ দিলে তাব অন্য সমস্ত গান প্রায় একই রকমের। এদেব বেশভূষা, আচার ব্যবহার এবং জীবনযাত্রাও সাধাবণেব থেকে একটু পৃথক ধরনের। এইবার আমরা কিছু গৃহী বৈষ্ণবেব' (বোষ্টম নয় কিন্তু) গান শোনাব।

'গৃহী বৈষ্ণব' কথাটায় একটু ধাঁধাব সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু আমবা আগাগোড়াই জটিলতাব পথ ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেছি। এখানেও আমবা অতি সহজ ভাষায়ই বলতে চাই, সাধারনতঃ বৈষ্ণব-বৈরাগীবা বাড়ি বাড়ি ঘুবে ঘুরে গান গায়, শ্রোতার ফরমাস অনুসাবেই গায়। কিন্তু এই গৃহী বৈষ্ণবেরা কখনও বড একটা কারও বাড়ি গিয়ে তাদের ইচ্ছেমত গান গায় না। তাবা নিজেরা গান রচনা করে, মনের আনন্দে নিজেরাই গায়, নিজেরাই শোনে। এদের গান অনেকটা স্বতঃস্ফূর্ত। তবে জীবিকার্জ্জনের জন্য এদেরও পরের দ্বারস্থ হতে হয়। তবে বাড়ি বাড়ি ঘুরে নয়। এদের দেখা পাওয়া যায় বেশীর ভাগই কোন স্থাপিত দেবালয়ে, অথবা কোন আশ্রমে। এদের গানগুলির অধিকাংশই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ক। পদাবলী সাহিত্যের পদকর্তাদের মত এরাও অনেক সময় রাধাভাবে ভাবিত হয়ে গান গায় ও গীতি রচনা করে। এই শ্রেণীর বৈষ্ণবের সংখ্যা ঢাকা জেলায় খুব বেশী দেখা যায়। আমার মনে হয় এরা নবদ্বীপের 'ললিতা সখী'র ধরনেই দিন কাটায়। পণ্ডিত প্রবর 'নুম্যান' সাহেবের মতানুসারে এরা বোধ হয় ভাবে, কান্তা (শ্রীকৃষ্ণ)র সঙ্গে মিলনের জন্য

রমণী ভাবই সর্বোৎকৃষ্ট এবং এই নারী ভাবে ভাবিত হতে পারলেই নাকি ভগবানের দেখা পাওয়া খুবই তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়। Newman সাহেবের নিজের কথায় :—"If thy soul is to go on into higher spiritual blessedness, it must become a woman , yes however manly thou may be among men" হয়ত এই জন্যই এই সমস্ত গৃহী বৈষ্ণবদের কীর্তনের ভিতর পদাবলীর গন্ধও পাওয়া যায় :—

রাধার বিহনে কানু মন জ্বলে
না পারে বোধিতে বারি।
ক্ষণে ক্ষণে ঝরে শ্রীমতীর তরে
তপত অশ্রু বারি॥
প্রাণ হাঁসফাঁস প্রেমের বিকাশ
কানুর দেহের পরে।
যত সব চিহ্ন হল সব ভিন্ন
রাধিকা প্রেমের তরে॥
কখন এখানে কখন সেখান
বেড়ায় বিভুল ভুলে।
উপাধান ধরি বক্ষপরে চাপি
উঠিতে চাহে সে কুলে॥
বাতাস বহিলে ভাবে মনে মনে
এই বুঝি আসে কাছে।
চকিত নয়ানে চাহে চারিভিতে
কেহ বলে কিছু পাছে॥
বিধির বিধাতা সর্বময় ত্রাতা
তাহার এ হাল হল।
কহে 'মহারাজ' ওহে রসরাজ
ইহত কর্মের ফল॥

এবং :—

(ওগো) সুখের নিশীথে পীরিত করিলুঁ
দুখের নিশীথে বাদ।

এমত জানিলে কে করে পীরিতি
এমতি বিষম সাধ।
(ওগো) পথিক যেমতি তরুছায়া তলে
ঘুমায় নিধাঘ বেলে।
রমণী তেমতি পুরুষ ছায়াতে
কাটায় দারুণ ভুলে॥
'মহারাজ' কহে করজোড় করি
শুনহ অবোধ রাই।
তোমারে ছলিতে যুগে যুগে কালা
আসিবে ভুবন ঠাঁই॥

এবং :—

(ওগো) শ্যাম সোহাগিনী রাই বিনোদিনী
না করহ অভিমান।
কানুর পীরিতি চন্দনের রীতি
ইহ তারি পরমান॥
কানুর লাগিয়া যে করে পীরিতি
সুখ হয় তার বাদ।
এমত জানিয়া কে করে পীরিতি
শিরে করে করাঘাত॥
তোমা হেন নারী আরো কত জন
আছয়ে ব্রজের পরে॥
তাদের দুঃখেতে নীর নাহি ঝরে
কানুর বক্ষের পরে॥
(ওগো) সেকালের কৃষ্ণ একালের কৃষ্ণ
প্রভেদ কিছুই নাই।
কহে 'মহারাজ' শুন ব্রজ নারী
না যাও কানুর ঠাঁই॥

আমরা এই পরিচ্ছেদে যতগুলি গানের উল্লেখ করেছি, এদের প্রত্যেকটাই পুরুষের রচিত। কিন্তু পূর্ব বাংলায় বৈষ্ণবীর সংখ্যাও কম নয়। অনেকের মতে

বৈষ্ণবীর রচিত গানগুলি অধিকতর শ্রুতিমধুর ও শব্দ লালিত্বে সমধিক উৎকৃষ্ট। আমরা এবার বৈষ্ণবী বিরচিত কয়েকখানা গান আপনাদের উপহার দিচ্ছি। এই সব বৈষ্ণবীরা কখনও একাকী কখনও বা বোষ্টম সঙ্গে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান গায়। গান গেয়ে যা পায় তাতেই তাদের দিন চলে যায়। শ্রান্ত দুপুরে শোনা যার এই সব বৈষ্ণবীর কণ্ঠ :—

কোন বনে বাজায় গো বাঁশী
বন্ধু শ্যাম রায়।
বাঁশীর সুরে মন উদাসী
আমার প্রাণও লইয়া যায়।
কোন বনে বাজায় গো বাঁশী
বন্ধু শ্যাম রায়॥

যখন আমি রান্নায় বসি
তখন কালা বাজায় বাঁশী
প্রাণ বিদরে যায়॥

কোন বনে বাজায় গো বাঁশী
বন্ধু শ্যাম বায়॥

কোন বনে বাজায় গো বাঁশী
মধুর ধ্বনি শোনা যায়
বাজায় বাঁশী কাল শশী
কান্দি আমি দিবানিশি
সময় বুঝে না।
কোন বনে বাজায় গো বাঁশী
বন্ধু শ্যাম রায়॥

বন্ধু অসময়ে বাজায় বাঁশী
মন প্রাণ হইরে নেয়
কোন বনে বাজায় গো বাঁশী
বন্ধু শ্যাম রায়॥

এবং :—

কোথায় রইলা বন্ধু দেখা দাও আমায়
কত দিন হইল গত, মরি হে প্রেম জ্বালায়
বন্ধু হে দেখা দাও আমায়।
বন্ধু হে মীনের মত ডুবে রইলাম
তোমারই আশায়
আমার সে আশা নৈরাশা হৈল
বন্ধু তুমি রহিলে কোথায়
বন্ধু হে অভাগিনী বলে কিগো
মনে নেই তোমার।
আমায় ভাসাইলে ডুব সাগরে
এ দুঃখ কি প্রাণে সহ্য হয়
কোথায় রহিলা বন্ধু
দেখা দাও আমায়॥

অথবা :—

মনের মানুষ নইলে
মনের কথা কইও না।
কথা কইও না, প্রাণ সজনী গো
মনের মানুষ নইলে
মনের কথা কইও না॥
(আবাব) অসতেরই এমনি ধারা
চোবের নাও সাউধের নিশানা
মুখের কথায় সব সেরে যায়
কাজে কিছু না।
ওগো শিমুল ফুলের রং দেখিয়ে
ঝম্প দিও না
মনের মানুষ নইলে
মনের কথা কইও না॥

আমার পূর্ব জন্মের কর্ম ফলে
যদি মনের মানুষ মিলে
নাম লিখিতাম দাসী বলে
হইতাম তার কিনা (?)
গোঁসাই ঘরণী রামায় কয়
তেমন গো নইলে
মনেব মানুষ মিলে না ॥

কিংবা :—

তারে ভুলাইয়া রেখেছে
কোন প্রাণসজনী
এইল না শ্যাম গুণমনী
ও কেন এইল না রাত্র নিশাকালে
ভ্রমরা গুঞ্জবে ফুলে
তাতে কুকিল কবে কুহুধ্বনি
প্রাণসজনী।
আইল না শ্যাম গুণমণি
কৃষ্ণ ছাড়া রই কেমনে
প্রাণে ধৈর্য নাহি মানে
আমি বৃন্দাবনে হইলাম কলঙ্কিনী।
(গো) প্রাণ সজনী এল না প্রাণসজনী।
আসবে বইলে বসবাজ
পালঙ্কে কইবাছি সাজ
আমি পূজা দিব এই মন ফুলে
প্রাণসজনী
এল না শ্যাম গুণমণি

বৈষ্ণবীরা যেন অন্তর্যামী! প্রবাসী স্বামীর চিন্তায় অধীরা নববধূর মনের কথা বুঝে নিয়েই যেন তারা খঞ্জনী বাজিয়ে ঘা দেয় বিরহিনীর মনের কপাটে :—

যখন বন্ধু জ্বলেবে রে প্রাণ
আমারি নাম লইও

আমার দেওয়া মালার সনে
দুঃখের কথা কইও।
আমারই নাম লইও॥
আমি রইব তোমার লইগ্যা
(আর) তুমি রইবা আমার লইগ্যা (রে)
এ জনমের আশা লইয়া
(বন্ধু) আর জনমে আইসো
বন্ধু আমারি নাম লইও॥
বিধি মোদের হোলরে বাম
মিলন নাহি হৈল
কত অপযশের কথা
কত জনায় কইল।

কিংবা :—

দয়াল গুরু ধন
কোথায় গেলে পাব ?
যেই দ্যাশেতে যাইবা গুরুধন
আমি সেই দ্যাশেতে যাইব।
তুমি হইবা কল্প তরু
আমি হইব লতা
তোমার শ্রীচরণ জড়াইয়া রইব
ছাইড়া যাইবা কোথা ?
স্রোতেরি শ্যাওলা হয়ে
ঘাটে ঘাটে ফিরি
এমন বন্ধু নাই যে আমার
উপায় কী করি।
দয়াল গুরু ধন
কোথায় গেলে পাব ?

এইবার আমরা গুরুবাদী বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে কিছু বলেই আমাদের এই পরিচ্ছেদ শেষ করব।

গুরুবাদীবৈষ্ণব বলে বিশেষ কোন সম্প্রদায় নেই। পদাবলীর পদ কর্তাদের রচনায় যেমন দুটো ভাগ দেখা যায়ঃ— চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত যে সব গীতি বা গাথা রচিত হয়েছে সেগুলি প্রধানতঃ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ক এবং যে সমস্ত পদ বা গীত চৈতন্যের পরবর্তীকালের সে গুলিতে চৈতন্যের লীলা বিষয়ক কথাই শোনা যায়। তেমনি পূর্ববঙ্গ সমাজের ভিতর যে সব বৈষ্ণব বা বোষ্টমের সন্ধান পাওয়া যায় এদের ভিতরও দুটো শ্রেণী বিদ্যমান।

একদল বলে শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণই সব। জগতের একমাত্র পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ এবং বাদবাকী সবাই রাধা। এই শ্রেণীর বৈষ্ণবেরা তাদের গানে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাই বর্ণনা করে থাকেন। এরাই বৈষ্ণবী সঙ্গে নিয়ে ঘোরে। তারা পরস্পর রাধাকৃষ্ণের অভিনয় করেন এবং এইভাবেই দিন কাটান।

কিন্তু আরেক দল আছেন তাঁদেরই আমরা গুরুবাদী বৈষ্ণব আখ্যা দিচ্ছি। তাঁরা বলেন, রাধাকৃষ্ণের কথা অনেক বড ব্যাপার। তাঁদের ত' আমাদের সাদা চোখে দেখতে পাইনা। এই রাধাকৃষ্ণের কাছে পৌছতে হলে চাই আমাদের পথ প্রদর্শক। এই পথ প্রদর্শকই হলেন আমাদের গুরু, আমাদের উপাস্য দেবতা। স্থতরাং এই গুরুকে যদি ভজনা করি, এবং আমাদের এই ডাকে যদি তিনি সন্তুষ্ট হন তা'হলেই আমাদের শ্রীভগবানের কাছে পৌছবার পথ স্থগম হবে।

হয়ত এই কারণেই এই শ্রেণীর বৈষ্ণবদের মুখে শোনা যায় প্রধানতঃ তাদের গুরু প্রশস্তি ও গুরু বন্দনা। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এদের গানে, গুরুকে তাঁরা কত উচ্চাসন দিয়েছে :—

গোঁসাইর চরণ বিনে
দেহ নিত্য হবেনা।
নিত্য হবেনা, হবেনা রে সময় গেলে।
কর পঞ্চরাগের করণ
গুপিনীর ভাব নিয়ে
অসাধ্য সাধিতে পার
গুরুর কৃপা হলে॥
মনরে নব রসের করণ কর
ব্যাধি জ্বালা রবেনা।

গোঁসাইর চরণ বিনে
দেহ নিত্য হবে না ॥

আট কুঠুরী নয় দরজা
আঠার মোকামে
বিরজার পারে আছে মানুষ
ধরা যায় কেমনে।
মানুষ সদাই চলে উল্টা কলে
দিনে কর সাধনা।
নিত্য ধামে যাবেরে মন
নিত্যের করণ কর
অনিত্য দেহ হতে কেন
নিত্যেব আশা কর।
জীবের পঞ্চতত্ত্ব আবোপ দেহ
দেহ জিনে কর সাধনা
গোঁসাইর চরণ বিনে
দেহ নিত্য হবে না ॥

অথবা ঃ-

গুরু তোরে কী ধন দিল
চিনলি না ময়না
কী ধন দিল, কী ধন নিলি
ধনে ধনী হইলিনা ॥

গুরু দিল খাঁটী সোনা
রাঙ বইলা তুই জ্ঞান করলিনা
ওরে ও দিন-কানা ॥

গুরু রাঙ দিল না সোনা দিল
পরখ করে দেখলি.না
চণ্ডীদাস আর রজকিনী
তারা প্রেমেব শিরোমণি
রাঙ গলায়ে বানায় সোনা

তারা এক প্রেমেতে দুইজন মরে
এমন মরণ মরে কয়জনা ?

কিংবা :— কর মন শ্রীগুরুর চরণ ভরসা
জীবনের নাইরে আশা।
এ জীবনের নাইরে আশা
এ জীবনের নাই ভরসা।
ভাই বন্ধু দারা সুত
কেবল পথের পরিচিত
যখন প্রাণটি হবে গত
কেউ কি তোমায় করবে জিজ্ঞাসা ?
জীবনেব নাইবে আশা
দেহের গুমর কর মিছা
নিঃশ্বাসের কি বিশ্বাস আছে
কাল শমনে জাল পেইতাছে
ভাঙ্গলো রে তোর সুখের আশা।
মইলে করবে পুইবে সাবা
কড়ি দিবে অষ্ট কড়া
ছয় জনেতে স্কন্ধে নিয়ে
(তোরে) নদীর কূলে দিবেরে বাসা।

এবং :—

আমার মন অসার সংসার মাঝে
কেবল মাত্র গুরু সার,
গুরুর নাম নিয়া মন ভুইলা রইলি
তারে ভজলি না একবার।
গুরু তোরে কৃপা করে
যে নাম দিল কর্ণমূলে
ভজলি না একবার।
গুরুর সার পদার্থ ভুইলে রইলি
কইরে মনের অহঙ্কার।

গুরু সত্য, গুরু নিত্য
গুরু পদে হওরে মত্ত
ভ্রান্ত মন আমার।
গুরু দীন বন্ধু, কৃপা সিন্ধু,
ভব সিন্ধু কর পার।
আমার মন অসার সংসার মাঝে
কেবল মাত্র গুরু সার॥
মিছে ঘর তোর, মিছে বাড়ি
বসত কর দিন দুই চারি
মিছে পরিবার।
সাক্ষী আছে তোর কাছে মন
চক্ষু বুঁজিলে অন্ধকার।
আমার মন অসার সংসার মাঝে
গুরু বিনে এ সংসারে—
ভব সিন্ধু নাইরে পার।

অথবা ঃ— গুরু-তত্ত্ব চরম পদার্থ চিনলি না রাম কিষণ্
কেন ভজলি না মন রাম কিষণ্?
এ ভবে তার অর্চনা করলি কবে
যার জন্যে এলি ভবে
তার সাধনা করলি কবে?
গুরু যখন ডাক দিল
গুরুর ডাকে কেউ না এল—
বৃন্দাবনের উপকথা
এর মরম আর কেউ জানে না।
হারা-নিধি ফেলে গেলি
ভাঙ্গা নদীর উজান কূলে
গুরু তত্ত্ব চরণ পদার্থ
চিনলি না মন রাম কিষণ্॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ

"শিরে ছিল আর বাঁশীটি তুল্যা নিল হাতে।
ঠার পিয়া বাজাইল বাঁশী মহুয়ায় আনিতে॥
আস-মানেতে চৈতার বউ ডাকে ঘন ঘন।
বাঁশী শুন্যা সুন্দর কইন্যার ভাঙ্গা গেল ঘুম॥"

—মৈমনসিংহ গীতিকা।

আমাদের গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত প্রায়। পূর্ববঙ্গে সারা বছর ধরে বিভিন্ন মাসে যে সমস্ত গীতি ও গাথার প্রচলন আছে আমরা এই গ্রন্থে তা' দেখাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। সুতরাং সে দিক থেকে আমাদের দায়িত্ব একরূপ শেষ হল বলা চলে। কিন্তু এখনও পূর্ববঙ্গের বার মেসে গীতির একটা কথা আপনাদের বলা হয়নি। সেটা হ'ল এ অঞ্চলের ছড়া এবং গল্পচ্ছলে গান। আমাদের বিবেচনায় গল্পচ্ছলে গান পূর্ববঙ্গের বারমেসে গানগুলির অন্যতম বিশিষ্ট বস্তু।

আমরা এর আগেই একাধিকবার বলেছি পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ জায়গায়ই বর্ষার সময় থাকে জলের তলায়। দূরে দূরে এক এক খানা বাড়ি সাগরের বুকে ছোট খাট এক একটা দ্বীপের মত মনে হয়। এই সময় পুরুষরা বাড়ি থাকুক না থাকুক, বাড়ি এবং পাড়ার বর্ষিয়সী মহিলাদের সম্পর্কে কেউ হ'ন দিদিমা, কেউবা পিসিমা, জ্যাটাইমা তাদের দেখা যায় বাড়ির অথবা পাড়ার সব অল্পবয়সী ঝি-বউদের নিয়ে গান সহযোগে রূপকথার গল্প করতে। তাদের এইসব গল্পের বেশীর ভাগই রাজারাণী কিংবা পক্ষীরাজ ঘোড়ার গল্প। কেশবতী রাজকন্যা, মধুমালা, মালঞ্চমালা বা কাঞ্চনমালার গল্প। এই গল্প বলতে বলতে অনেক সময়ই এইসব গল্প বলিয়েদের গান গাইতেও শোনা যায়। এক গল্প ঘুরে ফিরে তারা অনেকবার বলেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এগুলির যেন আর গাছ পাথর নেই, পুরোন হয় না।

এ ছাড়া আছে ছড়া বলবার হিড়িক। কথায় কথায় তারা ছড়া বাধে। সময় অসময়ে তারা এইসব ছড়া সুর করে বলে। আমরা এই অধ্যায়ে যতদূর

সম্ভব অবিকৃত অবস্থায় সেই সব গান ও ছড়া আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি।*

মাঘ মাস, বেশ শীত। রোদ ওঠার আগে লেপের তলা থেকে বাইরে বেরুতে কারুরই বিশেষ ইচ্ছে নেই। এমন সময়ও কানে আসে পাড়ার ছোট ছোট মেয়েরা পুকুর পাড়ে বসে মাঘমণ্ডলের ছড়া আওড়াচ্ছে।

ছোট ছোট কচি কচি কতকগুলি মুখ, হাতে ফুল দূর্বো নিয়ে এরা করতে বসে মাঘ মণ্ডলের ব্রত। এদের ভিতরই আবার যে বয়সে একটু বড সে আগে আওড়ায় ছড়াটা, তার পর তার সঙ্গী সাথীরা করে তার পুনরাবৃত্তি :—

মাঘ মণ্ডলের বর্ত করতে
কী কী ফুল লাগে ?

অমনি তার সঙ্গী সাথীরা এক যোগে উত্তর করে :—

গাঁদা, টগর মল্লিকা
অপরাজিতা লাগে।

এর পরই তারা সুর করে গাইতে থাকে :—

আম কাঁঠালের পিঁড়িখানি
গঙ্গা জলে ভাসে
তার মধ্যে আমার ভাই
মুরারী বসে।

এদের ছড়া এই রকম। এর পরই আমরা পাই কোন দুরন্ত সন্তানকে প্রবোধ দিতে গিয়ে তার মা তাকে চাঁদ দেখিয়ে ছড়া কেটে বলছেন :—

আয় চাঁদ নড়িয়া
ভাত দিমু বাড়িয়া
চাঁদের কপালে চাঁদ
টিপ দিয়া যা।
ধান কুটলে কুড়া দিমু
গাই বিয়াইলে দুধ দিমু

* পূর্ববঙ্গের ছড়া ও প্রবচন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য এই গ্রন্থকারের 'ছড়া ও প্রবচনে পূর্ববঙ্গ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

রাঙা স্থতার কাপড় দিমু
মাইনকার কপালে চাঁদ
টিপ দিয়া যা।

কিংবা :—

(ক) মাইনকা ঘুমাইলো পাড়া জুড়াইলো
বর্গী আইলো দ্যাশে
বুলবুলিতে ধান খাইয়াছে
খাজনা দিমু কিসে?
কিসের মাসী, কিসের পিসি
কিসের বৃন্দাবন
মাইনকা যদি ঘুমায় তয়
বাঁচিযে এখন ॥

(খ) মাইনকা আর যাবিনি তুই
রাম ঠাকুরের নায়,
ইলের কচু, বিলের শাক
রাইন্ধ্যা থুইছি ঘরে
এমন সময় খবর আইলো
মাইনকারে নিছে বাঘে।
অ মাইনকা আয়
আর যাবিনি তুই রাম ঠাকুরের নায়

(গ) আগাডুম, বাগাডুম, ঘোড়াডুম সাজে
ঢাল মেগর ঘাঘর বাজে
বাজদে, বাজদে চলল ডুলি
ডুলি গেল সেই কমলা পুলী
কমলা পুলীর টে'টা
স্থয্যি মামার বেটা
আয় লঙ্গ হাটে যাই
এক খিলি পান কিনে খাই
পানের মধ্যে পোকা

মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া
হলুদ বনে কলুদ ফুল
মামার বাগানে টগর ফুল।

(ঘ) আনা আনা আনা
তক্ত দুধের ফেনা—
সিম গোটা গোটা
বেগুন চটা চটা
ডান কানে সোনা
বা' কানে রূপো
রাম সীতার বিয়ে
নাকে নোলচ দিয়ে
সিঁথায় সিঁদুর দিয়ে
অ অলকা বুক ঝলকা।
ইত্যাদি—

ছেলে ভুলান ছড়া, নিতান্ত ছড়াই—এদের সেই মর্যাদা সহকারেই বিচার করতে হবে। এর ভিতর অর্থ খোঁজা বিড়ম্বনা মাত্র। শুধু যে পূর্ববঙ্গের ছেলে ভুলান ছড়া সম্বন্ধেই একথা প্রযোয্য তা' নয়। সর্বকালে সর্বদেশেই এই একই রীতি।

এর পর আসে পূর্ববঙ্গের বিবাহের গান। পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য এ প্রথা আজ একেবারেই লোপ পেয়েছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গ এ বিষয়ে তাদের ধারা অক্ষুন্ন রেখেছে স্পষ্টভাবেই। এমন কি বঙ্গ বিভাগের পরও পূর্ববঙ্গীয় নারীদের এই প্রথার প্রতি তাদের গভীর অনুরাগ প্রকাশ করতে দেখেছি।

সাধারণতঃ মেয়ে কিংবা ছেলে যার বিয়েই হ'ক না কেন, যেদিন বিয়ের পাকা কথা দেওয়া হয়ে গেল (পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় পাটীপত্তর করা) সেদিন থেকে বিয়ের দিন এবং এরপর দ্বিরাগমন পর্যন্ত (পশ্চিম বঙ্গীয় ভাষায় ধূলপায়) এদের উভয়ের বাড়িতেই প্রতিদিন সন্ধ্যায় বসে গানের মজলিস।

কয়েক বাড়ির এঁয়ো এবং বর্ষীয়সী মহিলা এক জোট হয়ে কতকগুলি পান, সুপারী দোক্তা নিয়ে গালে হাত দিয়ে (যেন উচ্চাঙ্গের কোন সঙ্গীত হচ্ছে)

সমবেত কণ্ঠে সুরু করে গান। এদের গানের সব পদ দূর থেকে স্পষ্ট ভাবে বোঝা না গেলেও অনুমান করা যায় কোন মাঙ্গলিকই গাইছেন।

বিয়ে বাড়ি। মহা ধূমধামের ব্যাপার। বাড়ি ভর্তি লোক। ঘুম অনেকের চোখেই নেই। হঠাৎ দেখা গেল বিয়ের আগের দিন শেষ রাত্রে বিয়ে বাড়ির একপাল মেয়ে ও বৌ এক জোট হয়ে চলেছে পুকুর কিংবা নদীর দিকে। কারও হাতে কুলো, প্রদীপ ও পঞ্চশস্য, কারও হাতে বা কলসী। ছোট ছোট মেয়ের দল চলেছে শাঁখ বাজাতে বাজাতে। আঞ্চলিক ভাষা অনুসারে এই অভিযানকে বলে জল সওয়া বা জল ভরতে যাওয়া।

পুকুরের দিকে যেতে যেতে তারা গান ধরে :—

চল সখী যবুনায়
বাঁশী ডাকে আয় আয়
চিন্তামণি জল ভরিতে যায়।

এরপর আসে মেয়েকে স্নান করাবার পালা। নিয়ম কানুন সব গায় হলুদেরই মত। কয়েকজন এঁয়ো একযোগে শিলের উপর কাঁচা হলুদ, ধান দূর্বো প্রভৃতি রেখে থেঁতো করে। তারপর সেগুলি একত্রে অত্যন্ত মিহি করে বেটে নিয়ে তা' দিয়ে মেয়ে বা ছেলেকে করায় স্নান। এই হলুদ বাটার সময় এদের আবার বেশ মিষ্টি সুরে গান গাইতে শোনা যায় :—

আন আন হলুদ বাইট্যা
আন সকালে
কমলারাণী ছানে চইল্যাছে।
(আবার) বেলা দশটা বাইজাছে—
কমলারাণী ছানে (স্নান) চইল্যাছে।
আন আন গিলা বাইট্যা
আন সকালে—
কমলারাণী ছানে চইল্যাছে।

স্নান পর্ব শেষ হ'ল। এইবার কনেকে সাজাতে হবে বিয়ের সাজে। তাকে পরান হয় পাটকাপড (বেনারসী), গায় দেয় অলঙ্কার, কপালে আঁকে চন্দন কুমকুমের ফোঁটা, খোঁপা বাঁধে মধুর ছন্দে। আর সমবয়সী সঙ্গীসাথীরা আরম্ভ করে গান :—

চল সজনী দেখে আসি সীতা সাজাবার বাকী কী ?
আমরা বকুল বনে যাই, বকুল ফুল টোকাই (কুড়াই)
বকুল ফুলের মালা গেঁথে
আমরা রামসীতা সাজাই।
আমরা বিনা জলে চন্দন ঘষে
রাম ললাটে দিয়েছি
বিনা তেলে কাজল করে
সীতার চোখে দিয়েছি।
আমরা মালী বাড়ি যাই
মুকুট নিয়ে এসে রামকে সাজাই।
(আমরা) পাত্রা বাড়ি যাই
পাটি নিয়ে এসে রামকে বসাই।
কুমার বাড়ি যাই
পিঁড়ি নিয়ে এসে সীতাকে বসাই।

কিংবা

সীতার সুন্দর সাজাতে চেলেনীর কোচাতে
সাজ সীতা সুন্দর সাজে।
সীতার সুন্দর ললাটে সোনার টিপটি
সেজেছে সীতা সুন্দর সাজে
সীতার সুন্দর কণ্ঠে সোনার হাসুলি
সেজেছে সীতা সুন্দর সাজে।
সীতার সুন্দর মস্তকে, সুন্দর বেণীটি
বেঁধেছে সীতা, সুন্দর খোঁপাটি।
সীতার সুন্দর হাতে সোনার বাজুটি
সেজেছে সীতা সুন্দর সাজে।
সীতার সুন্দর আঙ্গুলে সোনার অঙ্গুরী
পর সীতা আভরণ হে।
সীতার সুন্দর নয়ানে সুন্দর চাহনি
হাসিছে সীতা সুন্দর হাসিটি।

সুন্দর মালিকা, দীপ উজল।
বসিবে সীতা, রামের পাশে।

এই রকম অসংখ্য ছোট খাট গান বা ছড়া রচনা করে এইসব নিরক্ষর পল্লী বধূরা এবং সময়ান্তরে সেগুলি তারা কাজে খাটায়। ছড়া বা গান ছাড়া যেন এদের কোন উৎসব বা পাল পার্বণই নেই। এমন কি জ্যোৎস্না ধোয়া নৈদাঘ সন্ধ্যায় যখন দেখা যায় পাড়াব ঠাকুমা, পিসিমা বা বড়মার দল পাড়ার সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসে রূপকথা বলছেন তখনও দেখি এর ফাঁকে ফাঁকে তাঁবা গান গাইছেন।

এই সব গল্পগুলি সর্বত্র প্রায় একই ধরনের। বিষয়বস্তুও প্রায় একই। এই সব গল্পগুলিব মধ্যে "কেশবতী রাজকন্যার" গল্প, মধুমালা, কাঞ্চনমালা, মালঞ্চমালা, মাণিকমালার গল্পই সমধিক প্রসিদ্ধ।

'কেশবতী রাজকন্যাব' গল্পটা মোটামুটিভাবে এই রকম :—

রাজপুত্র শঙ্খনাথ নদীর ঘাটে স্নান করতে এসে দেখে একটি ফুল ভেসে আসছে তারই দিকে। রাজপুত্রের মনে কৌতূহল জাগে। ফুলটি হাতে নিয়ে রাজপুত্র দেখে তার পাপড়ির সঙ্গে জড়ান রয়েছে পাঁচহাত লম্বা একগাছা কোঁকড়ান কালোচুল।

রাজপুত্র ত' চুল দেখেই পাগল। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করে বসে ঐ চুল যার তাকে ছাড়া সে আব কাউকে বিয়ে কববে না।

বাজবাজরাব ব্যাপাব সবই রাজরাজরার মতই। সাজে 'সপ্ত ডিঙা মধুকর' লোক লস্কর নিয়ে। সঙ্গে থাকে বাণিজ্যের জিনিষপত্র। বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে নিয়ে বাজপুত্র ময়ূরপঙ্খী নৌকো ছাড়ে।

নৌকো চলে দিনের পর দিন, রাতের পব রাত ধরে। ধূ ধূ করে বিস্তীর্ণ জলবাশি। পাড়ের কোথাও চিহ্নমাত্রও নেই।

রাজপুত্র একে একে পার হয়ে যায় ক্ষীর সমুদ্র, লবণ সমুদ্র, হঠাৎ দুধ সাগরে এসে পড়ল এক বিষম ঝড়ের হাতে। ফলে হল নৌকো ডুবি। দেখতে দেখতে বাজপুত্রের সপ্তডিঙা গেল জলের অতল তলায় তলিয়ে। কিন্তু ভগবানের দয়ায় কোনরকমে প্রাণ রক্ষা পেল রাজপুত্রের।

সব নৌকো ডুবে গেছে। রাজপুত্রের 'ময়ূর-পঙ্খী' যথাসাধ্য চেষ্টা করেও

টাল সামলাতে না পেরে পড়ল কাৎ হ'য়ে। রাজপুত্রও জলে পড়ল। হঠাৎ ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেল নৌকোর ভাসমান ভাঙ্গা মাস্তুলটা আঁক্‌ড়ে ধরে।

রাজপুত্র মাস্তুলের উপর উঠে বসে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে সাহায্য লাভের কোনও সম্ভাবনাই নেই। নিরুপায় হ'য়ে সুরু করে কান্না।

আমাদের গল্প-কথিকা ঠাকুরাণী এই পর্যন্ত বলেই সুরু করেন গান :—

(হারে) বিধি একি আমার করমেরি লেখা
বঁধুর লইগ্যা হইলাম সারা
পথের মধ্যে বিপাকে ফেলাইয়া
বিধি মোরে কি ছলে ভুলাইলা।
কৈশোরেতে মাতার কোলে
পালন কইরাছ স্নেহে
যৌবনেতে সাগর বুকে
আমার প্রাণ গেল শেষে
বিধি মোরে কি ছলে ভুলাইলা।
ক্যাশবতী-কন্যা সে যে
রূপনগরে বাস
তাহার লইগ্যা, কাইন্দা কাইন্দা
কাটাই বার মাস।
চারি দিকে জল, স্থল নাই আর
আমার দুঃখের বুঝি নাই পারাপার।
সেত রাজার কন্যা
বইসা আছে ভালে।
(ও) তাহার লইগ্যা আমার যে গো
বে-ঘোরে প্রাণ গেলো।

এরপর অবশ্য গঙ্গাদেবীর দয়ায় তার ঐ ছই সমতে নৌকোই ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকে কেশবতী রাজকন্যার দেশে।

রাজ কন্যার পণ পাশা খেলায় যে তাকে হারাতে পারবে সেই হবে তার স্বামী। কিন্তু খেলায় সে যদি তার কাছে হেরে যায় তাহলে তাকে থাকতে হবে তার ক্রীতদাস হয়ে। কাজ হবে তার ঘোড়ার ঘাস কাটা।

এ পর্যন্ত অনেক রাজপুত্রই এসেছে রাজকন্যার রূপের খবর পেয়ে, কিন্তু হারাতে আর কেউ তাকে পারেনি।

রাজপুত্র শঙ্খনাথ এ খবর জানতে পেল বন্দী রাজপুত্রদের কাছ থেকে। জানল রাজকন্যা একজন বিদ্যাধরী। তার এক পোষা ইন্দুর আছে। যে মুহূর্তে রাজকন্যার হারবার পালা হয় ঠিক সেই সময় ইন্দুরটি এসে দেয় দীপ নিভিয়ে। ঘর যায় অন্ধকার হয়ে। রাজকন্যাও এই সুযোগে রাজপুত্রের ঘুঁটি খারাপ এবং নিজের ঘুঁটি ভাল জায়গায় রেখে পুনরায় আলো ধরিয়ে নিয়ে খেলা শুরু করে। ফলতঃ রাজকন্যাকে আর কোনদিনই পরাজয় স্বীকার করতে হয় না।

রাজপুত্র এ খবর জেনে নিয়ে গোপনে এক বিড়ালকে সঙ্গে নিয়ে এসে বসে পাশা খেলতে। পাশার দান চলে, ঘুঁটি ঘোরে। অবশেষে চরম মুহূর্তও আসে। কিন্তু আজ ঘটল অঘটন। ইন্দুর যে মুহূর্তে এগিয়ে যায় প্রদীপের কাছে, বেড়ালও সঙ্গে সঙ্গে করে তাড়া। ফলে দীপ নেভান আর তার হয় না। রাজপুত্রও এই ভাবে পরাস্ত করে রাজকন্যাকে। রাজকন্যাও প্রতিজ্ঞা অনুসারে অঙ্কশায়িনী হয় রাজপুত্রের। বিবাহে হয় জোর ধুমধাম। দেশ বিদেশ থেকে আসে লোকজন। সংবাদ পেয়ে আবার ফিরে আসে রাজপুত্রের সব পুরোনো বন্ধুরা। এই উপলক্ষে শাপ মোচন হয় বন্দী রাজপুত্রদের। অবশেষে একদিন সপ্তডিঙা মধুকর সাজিয়ে রাজপুত্রও নূতন বৌ নিয়ে ফিরে আসে আপন রাজধানীতে।

সংক্ষেপে এই হল 'কেশবতী রাজকন্যার' গল্প। দু' তিন জায়গায় শুনেছি এ গল্প। এর ভিতর কোথাও হয় একখানা, কোথাও বা দু'খানা গান।

মালঞ্চমালার গল্পটিও সংক্ষেপে এই রকমই।

কোন এক আটকুড়ো রাজার এক ছেলে হ'ল। কিন্তু জন্মাবার পরই এক সন্ন্যাসী এসে রাপুত্রের ভবিষ্যৎ বাণী করে গেল—জাতক তার নয় দিনের দিন মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

রাজা মহা ভাবনায় পড়লেন। একমাত্র বংশধর! যদিবা দেবতা মুখ তুলে চাইলেন, আটকুড়ো নাম ঘুঁচল ত' এখন বুঝি আর বংশ রক্ষা হয় না!

তবে সাধু বিধান দিলেন, যদি কোন দ্বাদশ বর্ষিয়া কন্যা স্বেচ্ছায় এর নয় দিন বয়সের সময় একে বিয়ে করে তা' হলে একে বাঁচান যেতে পারে।

কথাটা একেবারেই অসম্ভব। এমন কে আছে যে তার বার বছরের মেয়েকে এই নয় দিনের মৃত প্রায় ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবে?

রাজা ঘোষণা করলেন, যদি কোন লোক তার বার বছরের মেয়েকে তার নয় দিনের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেয় তা'হলে তা'কে সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান ক'রবেন।

একদিন, দু দিন করে ধীরে ধীরে নবম দিবস এসে হাজির হয়। ঠিক সেই দিনই রাজবাড়িতে এসে উপস্থিত হয় এক ব্রাহ্মণ তার কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে। ব্রাহ্মণ তনয়া স্বেচ্ছায় স্বীকৃতা হ'ল কুমারের পত্নী হতে। কিন্তু রাজপুরীতে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হল না। তাই তাকে তার শিশু স্বামী সহ রওনা দিতে হ'ল বিদেশে।

পথের কষ্ট বড়ই করুণ। তবু যা হক, দিনের পর দিন কাটিয়ে মালঞ্চমালা (ব্রাহ্মণ কন্যার নাম) তার স্বামীকে নিয়ে এসে হাজির হ'ল অন্য এক রাজার রাজত্বে। আশ্রয় নিল এক মালিনীর ঘরে।

দিন যায়। দেখতে দেখতে রাজপুত্রের বয়স হয় বার। সে স্কুলে যায়। পড়াশুনা করে। আস্তে আস্তে পাঠশালার গুরুমশাই থেকে ছাত্র পর্যন্ত সবাই ব্যাপারটা জানতে পারে। কিশোর কুমার আর যুবতী মালঞ্চমালাকে ঘিরে চলে তাদের নানা কথা। কখনওবা তারা প্রশ্ন করে, ও তোর কে রে?

রাজপুত্র একদিনও সঠিক উত্তর দিতে পারে না। রোজই গিয়ে জিজ্ঞেস ক'রে, তুমি আমার কে?

মালঞ্চমালা রোজই জবাব দেয়, আজ নয়, অন্য একদিন বলব।

ক্রমে আরও কিছু দিন যায়। রাজপুত্র ষোল বছরে পা' দেয় মালঞ্চমালার বয়স হয় আঠাশ। সে দেখে আর বেশী দিন এইভাবে কুমারকে ভাঁড়িয়ে রাখা সম্ভব নয়। তাই একদিন মালিনীর সাহায্যে কোন এক রাজ-কন্যাকে এনে বিয়ে দেয় রাজপুত্রের সঙ্গে।

ফুলশয্যার রাত। কুমার আজ নাছোড় বান্দা। বলে আজ তোমাকে বলতেই হবে।

মালঞ্চমালা বলে, বলব।

রাজপুত্র ও রাজকন্যা উভয়ে শুয়ে আছে পালঙ্কের উপর। জ্যোৎস্না এসে ছেয়ে ফেলেছে সারা ঘর। গভীর নিশীথ। মালঞ্চমালা ঠিক করে আজই সে তা'র পরিচয় দেবে। তাই শেষবারের জন্য আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে এগিয়ে যায় রাজপুত্রের ঘরের দিকে।

মালঞ্চমালার এতদিনের সাধ, আশা, আকাঙ্খা, কামনা বাসনা যা কিছু

সব যেন এক নিমিষে কে তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। কি উদগ্র বাসনাইনা তারও ছিল! কিন্তু তা' কি আর এ জীবনে সম্ভব !!

মালঞ্চমালা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে স্বামী ও সপত্নীব দিকে। একবার ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে কুমারকে তার বুকের মাঝে, কিন্তু পরক্ষণেই সে সামলে নেয় নিজেকে। ভাবে, ঐ পরিবারে সে আর বেশীদিন উপস্থিত থাকলে রাজপুত্রের সুখের ব্যাঘাত ঘটবেই।

তাই আস্তে আস্তে নাটকের পঞ্চম অঙ্কের নায়িকার মতই সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে বাইরে। স্বপত্নীর হাতে নারী জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনকে তুলে দিয়ে স্বেচ্ছায় সে রাজপুত্র ও রাজকন্যার মঙ্গল কামনা করে চিরতরে বিদায় নিচ্ছে।

এই বিদায় নেবার সময় মালঞ্চমালার অবস্থা যে কী রকম, তা আমরা কল্পনায় যতটা দেখতে পাই আমাদের গল্পের কথিকারা হয়ত তার চাইতেও বেশী করে দেখতে পান। হয়ত এ কারণেই তারা মালঞ্চমালাকে গল্প থেকে সরিয়ে দেবার সময়ও তার মুখ দিয়ে গাওয়াতে সক্ষম হয়েছেন এক করুণরসাত্মক গান। কথিকা ঠাকুরাণী এই পর্যন্ত বলেই মালঞ্চমালার হয়ে গান ধরেন :—

সুখে থাইকো, থাইকো সুখে রে রাজপুত্র
সুখে থাইকো রে রাজকন্যা
যদি সতীর মুখের কথা সু-প্রভাতে ফলেরে।
বাসরের প্রদীপ যেন সাত পুরুষে নেহালে।
রাজছত্র যেন চৌদ্দ পুরুষের মাথায় থাকেরে।
জল, স্থল, বন, বৃক্ষ যেন সজাগ হইয়্যা থাইকোরে
রাজ মন্দিরের চূড়া যেন অজয় হইয়্যা থাইকোরে।
চন্দর, সুরজ যেন সুমঙ্গল হাসে (রে)।
আমার শ্বশুরের, আমার সোয়ামীর পিঁড়ি
অক্ষয় কইর‍্যা রাইখো বিধাতা
রাজকইন্যার আয়ত যেন হাতে গায়ে ক্ষয় রে হে ধাতা
তুমি আমারে দেও এই বর।
চৌদ্দভরা পূর্ণ কর আমার শ্বশুরের সংসার।
ওরে আমি জল মাটি হইয়া থাকিবোরে
আমি ভুঞ্জিবো রে কতই সুখ।

ওরে আমি পশু পক্ষী হইয়া থাকিবোরে
আমি ভুঞ্জিবো রে কতই সুখ।

স্বপত্নীর প্রতি এরূপ ভালবাসার দৃষ্টান্ত বাস্তবে শুধু অবাস্তবই নয় অসম্ভবও বটে। জগতে কোন সাহিত্যে এর তুলনা পাওয়া দায়। হয়ত এ কারণেই মালঞ্চমালার গল্প সমগ্র পূর্ববঙ্গের ঘরে ঘরে এত বেশী পরিচিত, এত বেশী আদরণীয়। বহুবার শুনবার পরও তা যেন আর পুরোন হতে চায়না।

'রূপকথার' গল্প যে শুধু হিন্দু সমাজের ভিতরেই প্রচলিত একথা মনে করলে একটা মস্ত ভুল ধারণা থেকে যাবে পূর্ববঙ্গ সম্বন্ধে। পূর্ববঙ্গের অতি সাধারণ হিন্দু আর মুসলমানের ভিতর একমাত্র ধর্মীয় পার্থক্য ছাড়া সামাজিক বা ব্যবহারিক অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে এত অধিক মিল যে কারণে একজনের কথা বললে অপরজনও তাতে জড়িয়ে পড়ে।

হিন্দুর মত মুসলমান সমাজেও দেখা যায় (জোলা, কারিগর ইত্যাদি শ্রেণীর মুসলমানদের ভিতর বেশী করে) দিনের কাজ শেষে এই সম্প্রদায়ের বুড়ীরা অনেক সময় বুড়োরা পর্যন্ত (নানী, দাদী বা নানা প্রভৃতি) বাড়ির ছেলে মেয়েদের উঠোনের মাঝে চ্যাটাই বা হোগলা পেতে বসে সুরু করে এই রকম ধরনের রূপকথা। তবে গানের মাত্রাটা যেন এই সম্প্রদায়ের মধ্যেই একটু বেশী বলে মনে হয়। উদাহরণ স্বরূপ মনে করা যাক আত্তাপ-সত্তাপের গল্পটা :—

গিয়াসুদ্দিন নামে ছিল এক কৃষাণ। তার ছিল পরীবানু নামে এক স্ত্রী। অত্যন্ত সুন্দরী। দেশে নাকি এমন সুন্দরী আর ছিল না।

হঠাৎ সেই দেশের রাজার (নবাব) কানে যায় এই খবর। তিনি গোপনে ডেকে পাঠান গিয়াসুদ্দিনকে। ব্যক্ত করেন, পরীবানুকে তার চাই-ই, এর বিনিময়ে তিনি দিতে প্রস্তুত আছেন যে কোনরূপ মূল্য।

রাজার প্রস্তাবে আত্মসম্মানে আঘাত লাগে গিয়াসুদ্দিনের। সে ঐ দুশ্চরিত্র নবাবের মুখের উপর জানায় প্রতিবাদ। ফলে সেই রাত্রেই তার বাড়ি হয় লুণ্ঠিত। গিয়াসুদ্দিন যায় মারা। পরীবানু হয় অপহৃত। দৈবক্রমে রক্ষা পায় তার শিশুপুত্র আত্তাপ।

আত্তাপের বয়স তখন মাত্র ছ'মাস। এই সময় খবর শুনে আত্তাপের দূর সম্পর্কীয় এক আত্মীয়া এসে তাকে লুকিয়ে নিয়ে যায় তার বাড়ি এবং সেই রাত্রেই হয় সে দেশ ছাড়া।

অনেক দিন অতীত হয়েছে। পূর্ব কাহিনী সবাই ভুলে গেছে। পরীবানু রাজপ্রাসাদে গিয়ে এখন হয়েছে রাজরাণী। তার গর্ভে জন্মেছে এক ছেলে। নাম রেখেছে সন্তাপ। সেও এখন বেশ বড় হয়েছে। ঘোড়ায় চড়ে বেড়িয়ে বেড়ায়। ভাবী রাজা বলে দেশের লোকের কাছে খাতিরও যথেষ্ট।

এদিকে আত্তাপ বেড়ে উঠতে থাকে তার মাসীর কাছে। কালক্রমে সেও হ'য়ে ওঠে একজন বিশিষ্ট পালোয়ান। ক্ষেত খামারের কাজ করে আর আপনার মনে আপনিই বাঁশী বাজায়। এই সময় একদিন দেখা হয়ে যায় ফুলবানুর সঙ্গে।

ফুলবানু জলের ঘাটে এসেছে জল নিতে। দূরে গাছের ছায়ায় বসে বাঁশী বাজাচ্ছে আত্তাপ। হঠাৎ আত্তাপের নজর যায় সেই দিকে। আত্তাপ তাড়াতাড়ি করে বাঁশীতে বাজায় ঃ—

জল ভর সুন্দরী কন্যা, জলে দিছ মন,
কাইল যা কইছিলাম কথা আছে নি স্মরণ ॥

ফুলবানু সেদিন কিছুই বলে না। কিন্তু পর দিন আত্তাপ যখন আবার বাঁশীতে সুর ধবল ঃ—

বাঁশের বাঁশী হইতাম লো দূতী পাইতাম মনে সুখ।
বাজনেরি ছলে দিতাম বঁধুর মুখে মুখ (রে) ॥

তখন ফুলবানুও উত্তর দেয় ঃ—

আমার উদ্দেশ্যে বন্ধুরে,
আরে দুঃখু বাজায় মোহনবাঁশী।
আমার আসার আশেরে
আরে দুঃখু থাকে জলের ঘাটে বসি ॥
কান্দিয়া বাঁশীর সুরে রে
হায়রে বন্ধু কয় মনের কথা।
তাহার কান্দন শুন্যারে
আরে দুঃখু আমার চিত্তে হইল ব্যাথা ॥

দিন যায়। ক্রমে ক্রমে ফুলবানু আর আত্তাপে গড়ে উঠে প্রেমের বন্ধন। একজন আর একজনকে না দেখতে পেলে হাঁ করে চেয়ে থাকে পথের দিকে। ঠিক এই সময় দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে সন্তাপের নজর পড়ে ফুলবানুর পূর্ণ যৌবন।

সন্তাপ নিজে গিয়ে প্রস্তাব করল ফুলবানুর কাছে। তাতে সুবিধা না পেয়ে

রাজবাড়িতে ফিরে বাবার ক্ষমতার দৌলতে একদিন জোর করেই তাকে ধরে নিয়ে গেল রাজ-প্রাসাদে। এবং সেইখানেই করল ফুলবানুকে বিয়ে।

গল্পের করুণ রস জমাট হয়ে উঠল এইখানেই।

ফুলবানু এখন আর কৃষাণ কন্যা নয়। সে ভাবী রাজমহিষী—যুবরাজ স্ত্রী। তার আজ আছে সম্পদ, আছে ঝি, চাকর, দাসী, বাঁদী কিছুরই নেই অভাব। কিন্তু রাজপুত্রের এত যত্ন এত জাঁকজমকেও খুশী করতে পারেনা ফুলবানুর ফুলের মত মনকে। সদাই সে যেন ডুবে থাকে এক গভীর বিষাদের মধ্যে।

গভীর নিশীথ। রাজপুরীর সবাই সুষুপ্তির ক্রোড়ে সুপ্ত। হটাৎ দূরে করুণ স্বরে বেজে ওঠে বাঁশীর সুর :—

না লইও না লইও সখী আত্তাপেরি নাম
তোমার নিকটে আমার শতেক সেলাম॥

চমকে ওঠে ফুলবানু। ধীরে ধীরে পালঙ্ক ছেড়ে উঠে আসে ছাতের পর। দূরে রাজপ্রাসাদের অতি নিকটেই দাঁড়িয়ে আছে আত্তাপ।

চারদিক চেয়ে নিয়ে ফুলবানুও উত্তর দেয় :—

সুখেরে কইরাছি বৈরীরে বন্ধু দুঃখেরে দোসর।
তুই বন্ধুর পিরীতে মজ্যা আপন হইলাম পর॥
কুলেরে করিলাম বৈরীরে আমি অবলা রমণী।
তোমার পিরীতে ডাক্যা কলঙ্কেরে আনি॥
ঘরেতে লাগিল রে বন্ধু দোয়ারেতে কাঁটা।
সাধ করিয়া খাই পিরিত গাছের গোটা॥
যে জনে খাইয়াছে বন্ধু পিরিত গাছের ফল।
কলঙ্ক মরণ বন্ধু জীবন সফল॥

কিন্তু ফল উল্টো ফলল। আত্তাপ মনে করল ফুলবানু তাকে ভুলে গেছে ঐশ্বর্যের মোহে। সেই থেকে বন্ধ করল তার বাঁশী বাজান। ফুলবানু গভীর রাতে নির্দ্ধারিত সময়ে এসে দাঁড়ায় ছাতের আলিসার কাছে কিন্তু দেখা পায়না আত্তাপের।

দিনের পর দিন যায়। ফুলবানুর চাঁপা ফুলের মত রং বিবর্ণ হয়ে যায়। রাজপুত্রও ক্রমে ক্রমে চিন্তিত হয়—ব্যথিত হয় নিজের কৃতকর্মের দরুন। অথচ মুখে সেও কোন কথাটি বলেনা।

একদিন গভীর রাত। রাজপুত্র চুপি চুপি উঠে এসে দেখে ফুলবানু ছাতে দাঁড়িয়ে আত্তাপের বাড়ির দিকে চেয়ে অত্যন্ত করুণ স্বরে গান করছে :—

আমি ত অবলা নারী বন্ধু হইলাম অন্তর পুরা।
কূল ভাঙ্গিলে নদীর জল মধ্যে পড়ে চড়া॥
রে বন্ধু মধ্যে পড়ে চড়া॥
বইস্যা কান্দে ফুলের ভ্রমর উইড়া কান্দে কাগা।
শিশুকালে করলাম পিরিত যৌবন কালে দাগা॥
রে বন্ধু যৌবন কালে দাগা॥
সুজন চিন্যা পিরিত করা বড় বিষম লেঠা।
ভাল ফুল তুলিতে গেলে অঙ্গে লাগে কাঁটা॥
রে বন্ধু অঙ্গে লাগে কাঁটা॥
লাজ বাসি মনের কথা কইতে নাই সে পারি।
বুকেতে লাইগাছে আগুন, বন্ধু দেখাই কারে চিড়ি॥
রে বন্ধু দেখাই কারে চিড়ি॥
কইতে নারি মনের কথা ঘরের লোকের কাছে।
তোমারই প্রেমেতে আমার অন্তর পুইড্যা গেছে॥
রে বন্ধু অন্তর পুইড়্যা গেছে॥
নদীর ঘাটে দেখা শোনা কক্ষেতে কলসী।
ঐছন করিয়া গেছে তোমার মোহন বাঁশী॥
রে বন্ধু তোমার মোহন বাঁশী॥
ঘরের বাহির হইতে নারি কুলমানের ভয়।
পিঞ্জরা ছাড়িয়া মন বাতাসে উড়ায়॥
রে বন্ধু বাতাসে উড়ায়॥
কত কইর‍্যা বুঝাই পাখী নাই সে মানে মানা।
ভরা কলসী হইল রে বন্ধু দিনে দিনে উনা॥
রে বন্ধু দিনে দিনে উনা॥

ফুলবানু গান বন্ধ করে। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে জল। দূরে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখতে দেখতে রাজপুত্রের চোখও সজল হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় ফুলবানুর কাছে। অতি সন্তর্পণে স্পর্শ করে তার দেহ। চমকে ওঠে ফুলবানু।

পিছন ফিরে স্বামীকে দেখে লজ্জিতও হয়। কিন্তু আশ্বাস দেয় রাজপুত্র, আমিই অপরাধী; আমার ক্ষমতার বলে তোমাকে কেড়ে নিয়ে এসে বন্দী করে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম হয়ত ঐশ্বর্য দিয়েই ভোলাতে পারব তোমার মন। কিন্তু দেখলাম সেটা আমার মস্ত ভুল। ঐশ্বর্যের বিনিময়ে তোমার দেহটাই পেয়েছি কিন্তু মনকে পাইনি কোন দিনও—আর তা পাবও না। কিন্তু—

ডুম্-ডুমা-ডুম—ঢুটুম্-ঢুম্……

রাজপুত্রের অসমাপ্ত কথার মাঝখানেই কোথা থেকে যেন বেজে ওঠে টিকারার শব্দ। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায় একটা শোর-গোল। মুহূর্তমধ্যে রাজবাড়ি হয়ে ওঠে সজাগ। শোনা যায় চীৎকার,—ডাকাত পড়েছে (ডাকু নিকলায়া)।

সত্যই ডাকাত পড়েছে রাজবাড়িতে।

সুরু হয়ে যায় অস্ত্রের ঝনঝনানি। তলোয়ারে তলোয়ারে কাটাকাটি ফাটা ফাটি চলে কিছুক্ষণ। রাজপুত্র উন্মুক্ত কৃপাণে দাঁড়িয়ে থাকে ফুলবানুর কাছে। হঠাৎ তার সামনে একলাফে এসে দাঁড়ায় দস্যুদলপতি। এসেই হুঙ্কার ছেড়ে বলে, তৈরী হয়ে নাও সন্তাপ, আজ আমাদের জীবনের শেষ দিন। হয় তুমি না হয় আমি। ফুলবানুর দুজন প্রেমাস্পদ থাকতে দেব না।

ফুলবানু অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখে, আত্তাপ এসেছে তলোয়ার হাতে। মুখ হয়ে ওঠে খুশীতে উজ্জ্বল। কিন্তু পরমুহূর্তেই তা হয়ে পড়ে নিষ্প্রভ। সে কি পারবে সত্যই তাকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে এই রাজপ্রাসাদের বন্দীশালা থেকে?

ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ—

সুরু হয়ে যায় দুই বীরের লড়াই। কেউ কারু চাইতে কমতি যায় না। দূরে নীরবে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে ফুলবানু। হঠাৎ এক সময় তলোয়ার ফেলে দিয়ে সন্তাপ বলে ওঠে, তোমাকে বধ করতে আমার ইচ্ছে নেই। ফুলবানু যদি স্বেচ্ছায় তোমার সঙ্গে চলে যেতে চায় ত আমার কোন আপত্তি নেই।

কিন্তু তখন খুন চেপে গেছে আত্তাপের মাথায়। সমস্ত কোমল অনুভূতিই যেন লোপ পেয়ে গেছে তার। রাজপুত্রের উদারতার উত্তরে সে এক বিকট হাস্য করে বলে ওঠে, না কুমার তা হয় না। এ দুনিয়ায় ফুলবানুর দু'জন প্রেমাস্পদ থাকতে পারে না। হয় তুমি না হয় আমি আজ বিদায় নেব।

সন্তাপ পুনরায় অস্ত্র ধারণ করে। প্রতি মুহূর্তেই মনে হয় বুঝি একে অপরকে শেষ করে ফেলল। কিন্তু পর মুহূর্তেই নজর পড়ে না ঐ ত তারা যুদ্ধ করছে।

হঠাৎ এক সময় আত্তাপ করল এক ভীষণ আঘাত সত্তাপের মস্তক লক্ষ্য করে। সত্তাপ সে আঘাত ঠেকাতে গিয়ে মুহূর্ত মধ্যে হাতের মুক্ত তরবারির এক ঘায়ে ছেদন করে ফেলল আত্তাপের মুণ্ড !!

সব শেষ !!

এই সময় নিচুতলা থেকে ছুটে আসে সত্তাপের মা পরীবানু। কি করে যেন জানতে পেরেছে আজ এতদিন পর তার যৌবনের প্রথম সন্তান, স্নেহের দুলাল ফিরে এসেছে। যার জন্যে গোপনে খোঁজ পাঠিয়েছে দেশ থেকে দেশান্তরে। একবার মাত্র যাকে দেখবার জন্য অকাতরে বিলিয়েছে নিজের সঞ্চিত অর্থ, আজ সে এসেছে ভায়ের সঙ্গে লড়াই করতে।

কিন্তু একি !! মাত্র এক মুহূর্ত আগে আসতে পারলে আর এ ঘটনাটি ঘটত না।

বিস্মিত যুবরাজ ততোধিক বিস্ময়ের সঙ্গে চেয়ে দেখে ফুলবানুর দেহ লুটিয়ে পড়েছে আত্তাপের বুকের ওপর। কখন যে সকলের অজ্ঞাতে আত্তাপের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ফুলবানু গুপ্ত ছুরিকাদ্বারা আত্মহত্যা করেছে তা কেউ জানতেও পারেনি।

কিন্তু এ বিস্ময়কেও ছাপিয়ে ওঠে যখন দেখে তার মা পরীবানু ডুকরে কেঁদে ওঠে. আত্তাপ রে—বলে।

পরীবানু প্রকাশ করে অতীতেব এক বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়ের কথা। মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে আত্তাপের হাতের দিকে। তখনও তার হাতে জ্বলজ্বল করছে তিনটি কথা 'আত্তাপ'।

পরীবানু বলে, ও জন্মাবার ক'মাস পরেই এই নাম লিখে দিয়ে ছিল হাজী সাহেব কি এক ফলের রস দিয়ে। এখনও তার মনে পড়ে সে দিনের কথা !!

হিন্দু সমাজের গল্প কথিকাদের মত মুসলমান সমাজের কথিকারাও আত্তাপের জন্য সুরু করে মর্মস্পর্শী কান্না :—

আত্তাপেরে ছাড়িয়া আমি দেখি যে আন্ধার।।
যৈবন কালে হারাইলাম তোরে
দুশমনেরই আগে,
(হারে) আমারও দুঃখেতে ঝরয়ে বৃক্ষের পাতা।
তোমরা সবাই সাক্ষী রইয়া শুনিও সে বারতা ॥

কী করলি, কী করলি সত্তাপ
কার গায়ে দিলি তুই হাত
না জানিয়া, না শুনিয়া
ভায়ের সঙ্গে করলিবে বিবাদ।
কইয়া দেরে তরা মোবে দেবে দেখাইয়া
অভাগী হারাইলাম আঁখি কান্দিয়া কান্দিয়া॥

আত্তাপেব দুঃখে শুধু যে কথিকাই কাঁদতে সুরু করে তা নয়, মুগ্ধ শ্রোতৃবৃন্দও মোছে তাদেব চোখের জল, তারাও উপসংহাব করে ঃ—

আত্তাপেবে লইয়্যা গেল আসমানের হুরী।
বিপদকালে জাইনো বন্ধু তানাবেই কাণ্ডাবী॥

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

দ্বিতীয় খণ্ড

সাময়িকী

প্রথম পরিচ্ছেদ

"অমি ত বলিনা কর্তা
বলে আমাব মা।
আসরেতে দেখতে পাই
অন্য সময় পাই না—"
—বামুমালী (কবিয়াল)

'বাবমেসে' গান ছাড়া, পূর্ববঙ্গে কোন পাল পার্বণ বা ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে যে সব পালা গান বা বৈঠকী গানের বেওয়াজ আছে আমবা তাকে 'সাময়িক গীতি' আখ্যা দিতে চাই।

বারমেসে আর সাময়িকীতে যে খুব বেশী পার্থক্য আছে তা' নয়। অনেক সময়ই দেখা যায় একই গানকে দুই শ্রেণীতেই ফেলা যায়। তবে এরই মধ্যে যতটা সম্ভব স্থিব সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবতে পেবেছি তাতে ফল দাঁড়িয়েছে বারমেসে গানগুলি দেশের যত বড বিপ্লব, যত বড ওলটপালটই আসুক না কেন বছবেব ঠিক একটা নির্দিষ্ট সময়ে গাওয়া হবেই। পক্ষান্তবে সাময়িকী গীতি এক বছর কোন এক জায়গায় গাওয়া হলে তা' হয়ত, আগামী দশ বছরের মধ্যে আর নাও হতে পাবে।

সাধারণতঃ পাড়াগাঁয়ের বারোয়ারী পুজো যেমন রক্ষাকালী, রক্ষা শীতলা, চৈত্র সংক্রান্তির মেলায় এই রকম কোন সার্বজনীন অনুষ্ঠানে হয় কবি অথবা ঢপ সঙ্গীতের ব্যবস্থা। কোন বাড়িতে নূতন শিশু জন্মগ্রহণ করলে অথবা বুড়োরা কেউ মারা গেলে দেয় রামায়ণ পালা গান। কারও কোন মানসিক থাকলে দিতে হয় রয়ানী বা ভাসান গান। দুর্গাপুজো উপলক্ষে বা নিছক আনন্দ আহরণেব জন্য তারা আয়োজন করে রামযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা বা কৃষ্ণলীলা অথবা

গাজীর গানের। গৃহস্থের মঙ্গল কামনা করে পাড়ার ছেলে বুড়োদের একযোগে স্থর করে পড়তে শোনা যায় সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

পূর্ববঙ্গের কবিগানের কথা তুললে সর্বপ্রথম আমাদের মনে পড়ে মৈমনসিংহের রামুমালী, ফরিদপুরের নারায়ণ বালা ও রাজেন্দ্র, বরিশালের বিজয় দত্ত, নকুল ও গঙ্গামণি দাসী এবং ত্রিপুরার বিলাসিনী দাসীর কথা। এদের নাম এ অঞ্চলে সর্বজন পরিচিত। আমরা যতটা সম্ভব সুসংবদ্ধ অবস্থায় এদের কাব্য প্রতিভার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করব।

কবিগানের উপর বাঙ্গালী জাতীর একটা স্বাভাবিক মমতা আছে। পূর্ববঙ্গের চলিত প্রবাদ অনুসারে ঃ—

শোনলে পরে কবির কথা
ঠেইল্যা ফেলায় গায়ের কাঁথা—।

শ্রদ্ধেয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার মধ্যে কবিগান অন্যতম। বাঙ্গালী কবিয়ালেরা যেমন কবি গাইতে পারে, তেমনটি নাকি ভারতের আর কোথাও পারে না। পশ্চিমবঙ্গে বা উত্তর-দক্ষিণ বঙ্গে আজকাল এর রেওয়াজ অনেকটা কমে এসেছে, কিন্তু পূর্ববঙ্গ তার ধারা অক্ষুণ্ণ রেখে আসছে সগৌরবে। অথচ এক সময় এই পশ্চিমবঙ্গই ছিল কবিগানের মূল কেন্দ্র। ঊনবিংশ শতকে এখানেই জন্মেছিলেন বাম বসু, হরু ঠাকুর, এণ্টুনি ফিরিঙ্গী, লালু নন্দলাল, গোপাল উড়ে, ভোলা ময়রা প্রভৃতি বিখ্যাত কবিয়ালেরা। সুধীবৃন্দ অবশ্য তাদের সৃষ্টি প্রতিভা সম্বন্ধে সজাগ আছেন, সেকারণে তাঁদের বিষয়ে নূতন করে কিছু বলতে চাই না। আমাদের উদ্দেশ্যও তা নয়। আমরা এইবার পূর্ববঙ্গের নিরক্ষর ও অর্ধ-শিক্ষিত কবিকুলের রচনা শৈলীর সঙ্গে আপনাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। বিদগ্ধগণের বিচারের ফলাফল জানি না— তবে এ বিষয়ে আমরা স্থির নিশ্চিত এদের রচিত গীতি বা গাথা তৎকালীন সেরা কবিয়ালদের সঙ্গেও পা মিলিয়ে চলবার একেবারে অনুপযুক্ত নয়।

ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্। ঢুঢুম্ ঢুম্—। ক্যান্ ক্যান্ ক্যান্—ক্রুতাক্ ক্রুতাক্, তাক্ তেরে তা—তা তেবে তা—বেজে ওঠে সমস্বরে ঢোলের মিষ্টি বোল, জুড়ির ছুন্ ছুনাৎ ছুন্ শব্দ, তান ধরে কাঁসি। সরগরম হয়ে ওঠে কবির আসর।

খোলা মাঠের মাঝে সামিয়ানা খাটান হয়। মাঠের পরে চাঁদোয়ার নিচে পাতা হয় সতরঞ্চি, হোগলা বা মাদুর। বসে কবির আসর। দেখতে দেখতে

চুম্বকের মত আকর্ষণ করে নিয়ে আসে লোকজন। বিরাট চত্তরটা ছেয়ে ফেলে শুধু মানুষের মাথায়। এ দেশবাসীদের কাছে যাত্রা থিয়েটার এমন কি এই যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে টকী-বাইস্কোপের চাইতেও কবিগান অধিকতর আদরণীয়। তাই তারা কবি শুনতে দশ পনের মাইল দূরে যেতেও ভয় পায় না।

কবিগান এক বিচিত্র ব্যাপার। যাত্রা, থিয়েটার বা অন্যান্য পালাগানে যেমন একটা বাঁধাধরা কাহিনী বা সুনির্দিষ্ট নিয়মের ভিতর দিয়ে চলা যায় এর সে রকম কোন ব্যবস্থা নেই। প্রশ্ন এবং উত্তরের (কোন কোন অঞ্চলে বলে চাপান ও উতোর) সঙ্গে সব চাইতে চিত্তাকর্ষক হ'ল কবিয়ালদের উপস্থিত বুদ্ধি ও তাদের সহজাত কবিত্বশক্তির প্রকাশ। এক পক্ষ যে প্রশ্ন করে ভেবে চিন্তে, অপর পক্ষকে তার উত্তর দিতে হয় মুহূর্তমাত্র চিন্তা না করে। না পারলেই বরণ করতে হয় পরাজয়।

কবির দলের নায়ক অর্থাৎ মূল কবিয়ালকে পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে বলে "সরকার"। সঙ্গে থাকে দোহারবৃন্দ, যন্ত্রের মধ্যে ঢোল ও কাঁসি। আজকাল অবশ্য বেহালা-এস্রাজও দেখা দিয়েছে কোন কোন দলে। তবে ঢোল আর কাঁসিই এব প্রধান বাজনা। কোন কোন সময় দু'পক্ষের ঢুলির মধ্যে সুরু হয়ে যায় ঢোলের 'লহরা'।

সাধারণতঃ কবির আসরে একাধিক দলের বায়না হয়। নতুবা জমাটি আসর হয় না। কবিগানের ভিতর দু'পক্ষের বাদ-প্রতিবাদ, জবাব-প্রতি-জবাব, চাপান-উতোরই হ'ল এর বসেব মূল উৎস—এইখানেই কবিগানের সত্যিকারের প্রাণবস্তু নিহিত থাকে।

অনক সময়ই কবিয়ালরা প্রতিপক্ষকে পবাস্ত করবার জন্য সাময়িক ঘটনা, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক যে কোন বিষয়েব আশ্রয় নিয়ে থাকে। অশ্লীল ও ব্যক্তিগত কুৎসাও নিস্তার পায় না এর হাত থেকে।

একপক্ষ যদি কোন গাছকে বলে 'কলাগাছ' অপরপক্ষ জোব করেই তাকে বলবে তালগাছ। এই থেকেই সুরু হয় আসর। একে একে এসে যায় বহুকথা। একপক্ষ হার না মানা-পর্যন্ত চলে তাদের লড়াই। যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিকদের চাইতে তারা এসময় বড় কমতি যায় না।

হার-জিতের উপর অনেক সময় পুরস্কার ও পদক মেলে। কখনও কখনও তাব চাইতেও বেশী কিছু।

সাধারণতঃ আসর বসে সভা-বন্দনা দিয়ে :—

বন্দে মাতা সুরধনি পুরাণে মহিমা শুনি
তুমি মাগো অগতির গতি।
তুমি মা বাজাও বীণা হয়ে তুমি পদ্মাসীনা
চোরেরে সাধু করি দেও তারে শুভমতি॥
কালিদাস ভবভূতি আর যত মহামতি
অবনী উপরে আছে নাম।
তোমার প্রসাদ পেয়ে আনন্দে কবি গেয়ে
রাজেন যেন যায় দিব্যধাম॥

এক পক্ষ আসর বন্দনা গাইবার পর অপর পক্ষ সুরু করে দেয় সখীসংবাদ গাইতে :—

দশাননের শক্তিশেলে
রঘু-কুলের লক্ষণের পতন।
(ও) রাম রাজীব লোচন
দেখে জ্ঞানশূন্য লক্ষ্মণ।
কোমলাক্ষ নিল কোলে
বক্ষ ভাসে নয়ন জলে,
ডাকরে ভাই, রাম দাদা বলে।
দেশে গেলে মা সুমিত্রা
বলবে যখন তুই এলি রাম
কইরে লক্ষ্মণ।
আমি কোন পরাণে
বলব তখন
মাগো তোমার লক্ষ্মণ বেঁচে নাই।
ওঠ, ওঠ, ভাইরে লক্ষ্মণ
কথা কও মেল নয়ন।
ডাকরে ভাই দাদা বলে,
ভাই শোকের বাণ মেরে বুকে
কত নিদ্রা যাও গো সুখে

তোমার ভাই ডাকে, ভাই ভাই বলে
একবার নয়ন মেলে দেখ।
লক্ষ্মণ তোরে যদি পাই
আমার সীতায় কার্য নাই।
ওঠ, ওঠ, ভাই
চল দেশে যাই
প্রাণাধিক ভাই
চল দেশে যাই
কত নিদ্রা যাও।
ভাই শোকের বাণ মেরে বুকে
কত নিদ্রা যাও গো সুখে
তোমার ভাই ডাকে,
ভাই ভাই বলে
একবার নয়ন মেলে দেখ।

অপর পক্ষ অনেক সময় এ গানের প্রতিউত্তর না করে সুরু করে গোষ্ঠ গাইতে :—

মা বোল বইলে ডাকরে আমার মন
বল মায়ের মতন এ জগতে কে করে সন্তান পালন ?
শোন গো মা ত্রিনয়নী
(তুমি) জগৎ তারা হও জননী।
ব্রহ্ম কুলে চূড়ামণি
তন্ত্রসারে হয় লিখন।
(ও) মা আমার এই আসন্ন কালে
রেখো মা ঐ চরণে
ভক্তি যেন থাকে প্রাণে
এই ত মনের আকিঞ্চন।
(ও) মা আমার হইল অনেক জ্বালা
তাইতে হইলাম শক্তি ছাড়া
এখন যা কর মা ব্রহ্মতারা

তুমি ব্রহ্ম সনাতন।
(ও) মা ইচ্ছাময়ী নামটি ধর
যা ইচ্ছা তাই করতে পার
(ও) মা সকলেরে দয়া কর
এই ত মনের আকিঞ্চন।
মা বোল বইলে ডাকরে আমার মন
এ জগতে আর কে করে বল
মার মতন সন্তান পালন॥

পূর্ববঙ্গে শুধু যে পুরুষ কবিয়াল আছেন তা নয়। দু'এক জায়গায় মেয়ে কবিয়াল বা কবিওয়ালীর কথাও শোনা যায়। বিশেষতঃ ত্রিপুরার বিলাসিনী দাসী ও বরিশালের গঙ্গামনী ও পদ্মাবতী (পদী)-র নাম অনেকেই জানেন। এরা পুরুষ কবিয়ালের মতই দোহার, গাইন, বাইন নিয়ে দল খুলতেন। দলে অবশ্য মেয়ের সংখ্যা থাকত বড় জোর চার কি পাঁচটি, বাদ বাকী সবই পুরুষ। অনেকটা পশ্চিম বঙ্গের ঝুমুর দলের মত। তবে এরা গানে, বাজনায়, ঢপ কিংবা ঝুমুর দলের চাইতে অনেক উচ্চ স্তরের। উপস্থিত বুদ্ধি, সহজাত কবিত্বশক্তিতে এরা পুরুষদের চাইতে নিকৃষ্ট ত' নয়ই বরং অনেক সময় উচ্চস্তরের বলেই মনে হয়। এই মেয়ে কিংবা পুরুষ কবিয়ালেরা হিন্দুদের আসরে এক রকম গায় প্রয়োজন বোধে মুসলমানদের আসরে গায় অন্যরকম।

এ বিষয়ে নারী কবিয়ালেরাই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারেন। গোষ্ঠ গাইবার পর যদি কোন মুসলমান সমাজে দাঁড়িয়ে কান নারী কবিয়ালকে পালটা গান করতেই হয় তখন তাকে গাইতে শুনি ঃ—

গুরু দেখা দাও জীবন থাকতে
এ দুনিয়া যাবে কোন দিনে
দেখা দাও এ দাসীরে
এ দুনিয়া যাবে কোন দিনে॥
যাবে দুনিয়া তোমার জবানে
আমার জনম গেল বিফলে।
সাত দিনে একদিন পেলাম না
সে রইল তোরে ভুলে

দেখা দাও জীবন থাকতে
এ দুনিয়া যাবে কোন দিনে।
গুরু আলিঙ্গন হয় জুম্মার ঘরে
'জেড্ডার' খবর সেই দিনে।
হবে জান পরাণ লহরী ঘর
ওমা তুলা রাগে লও আমায়।
লাহুম খোদার জনম এক ঘরে
বাবায় মার চরণ ধরে কোন দিনে (?)
বাবার দুধেই মার জীবন
বাবা জন্মিল মাব আগে।
পুষ্পে ঋতু নিত্য নূতন
মাইয়ার ঋতু নাই সংসাবে
খোদা এই দুনিয়া যাবে কোন দিনে
দেখা দাও এ দাসীবে॥

কিন্তু কবিব গান, পদ, অনুপ্রাস, বাচনভঙ্গী যতই ভাল হক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত দু'পক্ষের কবিয়ালেব ভিতব লডাই না বাঁধে ততক্ষণ ঠিক আসব সবগবম হয় না। শ্রোতারা উশখুশ কবতে থাকে। তাই দেখা যায় যখন কোন কবিয়াল বা কবিওয়ালী তার গানের জন্য শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছ থেকে বিশেষ বাহবা পাচ্ছে তখনই অপর কবিয়ালের ঝোঁক চাপে কী কবে তাব প্রতিপক্ষকে জব্দ কববে। তাই সে পালট গানেব পরই দেয় চাপান :—

চক্রতীব ওই জ্যেষ্ঠ মেয়ে
তাবে না দিল বিয়ে
হলনা কন্যা দানেব ফল।
ও তার মাসে মাসে ঋতু আসে
যেন পদ্মা নদীর বগা জল।

চক্রবর্তী মহাশয়ও কিছু কমতি যান না। দত্ত মশাই যখন তাকে জব্দ কববাব জন্য তার মেয়েব কুৎসা ছড়াতে লাগল তখন তিনিও দত্তের এক দূব সম্পর্কীয়া ভগ্নীর সামান্য দোষত্রুটিব কথা সভা সমক্ষে প্রচাব কবে দিয়ে প্রতিজবাব দেন :—

গরীব এক ভদ্রলোকের মেয়ে
বাল্যকালে দিল বিয়ে
প্রগণ্ডেতে হল বিধবা
(ও) সে বিয়েব পরে স্বামীব ঘবে
থাকতে পেল না।
(ও) তার বাপেব বাড়ি মধুর পুরী
তুই দিন বাদে পিছার বাবি
শেষে কেলেঙ্কাবীব কথা ভাইরে
বলিব এই সভায়।

আমাদেব দেশে একটা চলিত প্রবাদ আছে, 'নিজের বেলা আঁটিস্মৃটি পরেব বেলা দাঁত কপাটি'। দত্ত মশাইও এবাব উচিত কথায় রেগে গিয়ে গান ধবেন :—

এই সভা কইরা বইসা আছেন
যতেক জ্ঞানী জন,
ছোটলোকের কথার জবাব
শুনিবেন এখন।
বিদ্যা বেটার লবডঙ্কা
জ্ঞান আছে কাঁচকলা
সদায়ের মোচা বাইন্ধা বেড়াস
আল্লার সনে দেবার চাস পাল্লা!
বিধির বিধি কপাল পোড়ছে
তাই বইল্যা কি ধর্ম খুইছে ?
তোর মত ঐ কুলোক যত
মন্দ কথায় সদাই রত
পরের নামে দোষ চাপাইয়া
নিজের সাফাই গাস্।
(দোহার বৃন্দ :— আহা, বেশ্, বেশ্,—)
হিন্দু ধর্ম সনাতন
না হবে কভু পুরাতন
তুই পাতা ইংরাজী পইড্যা

চোখে চশমা, পায়ে দিয়া জুতা
অখাদ্য, কুখাদ্য খাইয়া
জাত ভাঁড়াইয়া, নাম বদলাইয়া
সাইজাছিস দাঁড় কাগ্ ।

চক্রবর্তী মশাই স্থিব বুদ্ধিব মানুষ। তিনি দত্তেব মতন হঠাৎ বেগে ওঠেন না। তিনি বেশ ধীবে সুস্থে একটি একটি কবে গানেব কলি ছুঁড়ে দিতে লাগলেন সভাজনেব পানে :—

শুনেন সব ভদ্র জন
বিচার কবতে বইছেন যখন
(ও) ব্যাটা বইল্যা কইছে মোবে
পিতাব আসন দেই
শাস্ত্রে আছে, পঞ্চ মাতা, সপ্ত পিতা
তাব মধ্যে উনি হইলেন শিক্ষাদাতা
সেই সুবাতে শিক্ষা পিতা
জিজ্ঞাসি এখন
(ঐ) বাতাস যখন পুবান বয়
ধান কী তখন বাইবে বয়
যখন যেমন, তখন তেমন
বইলাছেন জ্ঞানী জন।
নাবী প্রগতির যুগ চইল্যাছে
নাবী জাগবণ।
কবিরা সব লেইখ্যা দিছেন,
নাবী হইল বসুমাতা
আদ্যাশক্তি জ্ঞান দাতা
চিরদিন আগে বয় শুনহ এখন।
লোহাব বেড়ি পড়াইয়া পায়
বন্দী রাখ লোহাব খাঁচায়
কবি বইলাছেন,
সচল হইয়াও অচল তানবা

বস্তার চাইতেও ভারী
মানুষ হইয়াও পুতুল তানরা
বাংলা দ্যাশের এই নারী।

দত্ত মশাইর দাপটটা একটু কমে এসেছে। তাই একটু নরম স্বরেই জবাব দেন :—

এত কথা বোঝার মতন
বুদ্ধি তোমার নাই
কবির কথায় একটি প্রশ্ন
কইর‍্যা যামু ভাই।
কও দেহি ভাই আশী টাকার খাসীডা
জলে পইড্যা মইল,
বিরাশীডা শকুনে খাইল
কতটুক কইর‍্যা পাইল ?

দোহাব বৃন্দ :—

(হারে) হাজাব টাকার বাগান খাইল
পাঁচসিকার ছাগলে——
এ আহায় এ।

প্রশ্নটি বডই জটিল। চক্রবর্তী মশাইও তাই মূল প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কৌশলে পাল্টা প্রশ্ন করে বসেন :—

যাক্ যাক্ যাক্ ভাই
আর অধিক কথার দরকার নাই
কবির স্বরে দত্তের পোর
জবাব দিয়া যাই।
(ঐ) আকাশে রবি জ্বলে সীসে
বলি তোমার যে প্রশ্ন যোগাইছে
হের জিহ্বা জন্মাইল কিসে ?

কিন্তু এত সত্ত্বেও বিজয়লক্ষ্মী আজ দত্তের গলায়ই বরমাল্য পড়ালেন। দত্ত মশাইব দোহারবৃন্দ এবার ঢোল, কাঁসি, বাঁশী সব কটা যন্ত্র একত্র করে গেয়ে উঠল :—

কথাব জবাব দিলানা বন্ধু
জবাব দিলানা।
হাইব্যা গিয়া কাবু হইল।
কবি জান না।

দত্ত মশাই এবাব বিজযগর্বে সকল তর্কেব মীমাংসা কবলেন :—

শোন, শোন, শোন ভাইবে
শোন কবিব কথা
কবিব নামে দিব্যি লাগে
না শোনে যে মোব কথা।
কবিব নিয়ম জানেনা ভাই
কবি গাইতে আইছে
(দোহাব বৃন্দ :—কবিব নিয়ম জানে না ভাই
কবি গাইতে আইছে
আহা কবি গাইতে আইছে—)
জল নাই, স্থল নাই, নাই ত্রিভুবন
তাব মধ্যে আছে দেখ অনন্ত শয়ান।
অনন্ত শয়নে আছেন দেব নাবায়ণ
যাহাব স্থষ্টিতে চলে এ বিশ্ব ভুবন।
প্রকৃতি, মানুষ আদি কীট, পতঙ্গ
ভূমণ্ডল মাঝে আছে আবও যতজন,
দৃষ্টি মাত্র স্থষ্টি যাব চক্ষের নিমিষে,
আমাব প্রশ্নেব জিহ্বা জন্মাইল শেষে।
আব কত কথা ভাই বলিব তোমায়,
গুরুজীব নামে তোমায় প্রণাম জানাই।
এসো মাগো ত্রিনয়নী, কৈলাস বাসিনী,
অধমেবে দয়া কব, তুমি মা বিপদ তারিণী।

পূববঙ্গেব ঢপসঙ্গীত অনেকটা বীবভূম, বাঁকুডাব ঝুমুব গানেব অনুরূপ। কতকগুলি মেয়ে গাইয়েদেব নিয়ে তৈরী হয় এক একটা দল। এসব দলেব কর্ত্রীও মেয়ে। তবে দলেব সঙ্গে দু'একজন পুরুষও যে থাকে না এমন নয়। যদি কোন

আসরে মাত্র এক দলেরই বায়না হয় তখন এরা এদের ইচ্ছে মত একটা বিশেষ পালা ধরে। যাত্রার মতই অভিনয় করে, পার্ট বলে। গান গেয়ে করে লোকের মনোরঞ্জন।

অভিনয় করে মেয়ে পুরুষ একত্রেই। তবে এই সব দলভুক্ত মেয়েরা সাধারণতঃ গৃহস্থ ঘরের মেয়ে নয়। জাত জিজ্ঞেস করলে অধিকাংশ সময়েই বলে —'বোষ্টম!'

দলের বাদক ও অন্যান্য কাজের জন্য পুরুষেরাই থাকে। তবে তারা সাধারণতঃ ঠিকে লোক।

গান জমাট বাঁধলে নিজেরাই একে অপরকে জব্দ করবার জন্য কথা কাটাকাটি করে। একই দোহার দুজনকে সাহায্য করে। কিন্তু আসরে যখন একাধিক দলের আবির্ভাব ঘটে, তখন তারা শুরু করে কবির পদ্ধতি।

কবির আসরে যেমন সভাবন্দনা, সখীসংবাদ, গোষ্ঠ, পালট তারপরে চাপান দেবার রীতি আছে, এখানে এগুলির বালাই নেই। আসরে ঢুকেই যে পক্ষ আগে গাইবার ফুরসৎ পায় সেই দলই সভাবন্দনা শেষ করেই প্রশ্ন করে বসে।

সাধারণতঃ একদল যখন প্রশ্ন করে তখন সে হয় রাধা কিংবা কৃষ্ণ, শিব অথবা পার্বতী, গঙ্গা অথবা দুর্গা এইরকম এক জনের হয়ে কথা বলে আর অপর পক্ষ ঠিক তার বিপরীতটি ভেবে নিয়ে উত্তর দেয়। এই সময় এরা পুরোপুরিভাবে কবিয়াল।

অবশ্য কবি গানের রসমাধুর্য, পদলালিত্য, অনুপ্রাস বা জিজ্ঞাসাভঙ্গীর সঙ্গে এর কোন তুলনাই হয় না। তথাপি এরা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

ঢপের আসর বসেছে। ঐকতান বাদন শেষ হয়েছে। আসরে উঠে দাড়ায় কোন এক পক্ষীয় ঢপওয়ালী। আসরের চারদিক বেশ ভাল করে তাকিয়ে নিয়ে গান ধরে :—

তারে তুমি সখী দিওনা আর মন
তারে মন দিলে পরে হবে জ্বালাতন।
আমি যারে ভালবাসি
সে তো গলায় দেয়গো ফাঁসী
শঠের পিরিতি যেন জলেরই লিখন।
তারে তুমি সখী দিও না আর মন॥

এই পর্যন্ত বলতে না বলতেই অপর পক্ষীয় ঢপওয়ালী বলে ওঠে :—

দুটো কথাও কি তোমার প্রাণে সয় না
লো দুটো কথাও কি তোমার প্রাণে সয় না।
একঘর একঘর করতে গেলে
ঝগড়া কি তায় হয় না।
যখন পিরিত ছিল আঁটাআঁটি
কেঁদে ভিজাতাম মাটি
এখন বোঝার ওপর শাকের আঁটি
তাও কি প্রাণে সয় না ?

বাদানুবাদ ক্রমান্বয়ে আসন্ন হয়ে ওঠে। তাই প্রথম ঢপওয়ালী চট্ করে নিজেকে পার্বতী ভেবে নিয়ে বলে ওঠে :—

ছিঃ ছিঃ ছিঃ হর, ছিঃ ছিঃ ছিঃ
লজ্জা নাইরে নিলাজ হর,
লজ্জা নাইরে তোর
গলায় কলসী বাইন্ধ্যা
জলে ডুইব্যা মর।
বিনা নিমন্ত্রণে যবে দক্ষপুরে যাই
পাগল বইল্যা সব থাকতেও
শ্মশানবাসী হই।
বিশ্বাস না কর সতী
পিছনে যাও শ্বশুর বাড়ী
ধিক্ তোমায় ধিক্।
পোড়া কপাল তোমার অতি
গঙ্গা হইল মাথার মণি
ধিক্ তোমায় ধিক্।
শ্মশানে মশানে ঘোর
ভাঙ্ ধুতুরা গেল
নেশা খাইয়্যা চক্ষু ঢুলু ঢুলু
আর না রহিল জাতি কুল।

অপর পক্ষীয় ঢপওয়ালীও কমতি যায় না। সেও চট্ করে তার দলের এক পুরুষকে শিব ভাবে দাঁড় করিয়ে দিয়ে দরাজ গলায় বলাতে শুরু করে :—

শোন, শোন, শোন দুর্গে বলি যে তোমায়
অনেক কথা কইছ তুমি আমায় চিন নাই।
কেবা তোর মাতা দুর্গা, পিতা বলিস্ কাকে
পথ নাই, ঘাট নাই, ধরিস্ যাকে তাকে।
যাব কাজ তারে সাজে জোলায় বেচে তেল।
ঢপ থুইয়্যা দুর্গা এখন দেখা নূতন খেল।

কিন্তু হলে হবে কি? চাঁদ মুখের জয় নাকি সর্বত্র। পুরুষ মহাদেবের গানে যুক্তি তর্ক যতই থাক না কেন শ্রোতাদের মন তাতে আকৃষ্ট হয় না। তাদের মন পড়ে থাকে গৌরী রূপী ঢপওয়ালীর উপর। অপর পক্ষীয় ঢপওয়ালী একথা বোঝে। তাই সে চট করে আসর থেকে শিবকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে এনে হাজির করে ষোড়শী শ্রীরাধিকাকে। সে এসেই বৃন্দাব কাছে বলতে শুরু করে :—

প্রাণ সখীবে ঐ শোন কদম্ব তলে
বংশী বাজায় কে?
বংশী বাজায় কেরে সখী
বংশী বাজায় কে?
আমার মাথার বেণী খুইল্যা দিমু
তারে আইন্যা দে।
অচলা বাঁশের বাঁশী
ছিদ্র গোটা ছয়
বাঁশীতে কতই কথা কয়।
আমার মন চইল্যাছে তারই সুরে
ঘবে নাহি রয়
বাঁশীতে ছিদ্র গোটা ছয়।

এইবার পুরোদস্তুর নাটকীয়ভাবে আসরে এসে দর্শন দেয় অপর পক্ষীয় শ্রীকৃষ্ণ। সে এসেই বলে বসে :—

তুমি ত' সুন্দর কন্যা
মোরে দিছ মন
বাঁশীর সুরে তোমার কথা
কহিব এখন।

শ্রীরাধিকা উত্তর দেয় :—

ছেড়ে দে কলসী আমার
যায় বেলা হে লাগর
ছেড়ে দে কলসী আমার
যায় বেলা।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অত সহজে ছেড়ে দেবে কেন শ্রীরাধিকাকে? সেও বলতে শুরু করে :—

কেমন তোমার মাতা পিতা
কেমন তাদের হিয়া
তোমার মত যুইগ্যা নারীর
কেন না দেয় বিয়া?

অপর পক্ষীয় ঢপওয়ালী শ্রীরাধিকা একটু দুর্বল প্রকৃতির। তাই সে সহজেই আত্মসমর্পণ করে :—

ভাল আমার মাতাপিতা
ভাল তাদের হিয়া।
তোমার মতন লাগর পাইলে
মোরে দিত বিয়া।
(হে) লাগর, ছেড়ে দে কলসী আমার
যায় বেলা।

কবির লড়াই হলে অবশ্য এত সহজে গোল মিটত না। কিন্তু আমরা আগেই বলে নিয়েছি কবি আর ঢপ সঙ্গীতকে একই পর্যায়ে ফেলা উচিত হবে না। কবি অপেক্ষা ঢপ অনেক নিকৃষ্ট শ্রেণীর। একমাত্র জবাব প্রতি-জবাবের ভঙ্গীটুকু বাদ দিলে আর কোথাও এদের বিশেষ মিল পাওয়া যায় না।

আর তা' ছাড়া কবির জবাব প্রতি-জবাব যেমন অনন্ত প্রসারী—এর তা' নয়। ঢপের জবাব প্রতি-জবাব অনেকটা সীমারেখার ভিতরেই আবদ্ধ থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"চলহ তুরিত গতি শ্যাম চকিত অতি
ধরহ সখীজন হাত।
নীঁদ মগন মহী, ভয় ডর কছু নাহি
ভানু চলে তবে সাথ ॥"

—রবীন্দ্রনাথ

আমরা গ্রন্থের গোড়াতেই বলে নিয়েছি, বৌদ্ধ যুগের অবসানের পর হিন্দুধর্ম যখন আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল তখন থেকেই আবার শোনা যেতে লাগলো হিন্দুর প্রাচীন দেবদেবীর উপাখ্যান। এই দেবদেবীর ভিতর খুব সম্ভবতঃ শিবের আগমন সর্বপ্রথম। পূর্ববঙ্গের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় চট্টগ্রামে প্রাপ্ত "শিবসংহিতাই" শিব বিষয়ক সব চাইতে প্রাচীন গ্রন্থ। এই শিবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন শিবায়ণ ও শিবস্তুতি শুরু হল উপাখ্যান ও ধর্মতত্ত্বের মাধ্যমে, অপর দিকে পূর্ববঙ্গের পল্লী অঞ্চলেও নিরক্ষর জনগণ শুরু করল শিবাষ্টক রচনা করতে। শিবাষ্টক সম্বন্ধে আমরা আগেই বলে নিয়েছি।

শিবের পরেই বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন শুরু হলে একাধারে যেমনি চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, থেকে চৈতন্য, রামানন্দে পর্যন্ত চলল শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন অপর দিকে পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে নিরক্ষর চাষাভূষার মুখেও শোনা যেতে লাগল কৃষ্ণলীলার গান। ভাষার কথা না তুলে বিষয় বস্তু ও রসতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করলে আমাদের নজরে পড়ে এই শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের গান এবং পল্লীকবিদের গীত মূলতঃ একই নদীর দুই শাখা মাত্র।

কৃষ্ণলীলা কথাটা একটু গোলমেলে। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের নব আবির্ভাবের পর তাঁর বিষয়ে যত গান ও গীত রচিত হয়েছে সেগুলি সাধারণতঃ গাওয়া হত শ্রীকৃষ্ণের কোন স্মরণীয় দিনগুলিতে অর্থাৎ কোন পালপার্বণে। কিন্তু কালক্রমে এই সব খণ্ড খণ্ড গান ও গীতি একত্রিত হয়ে শুরু হয় কৃষ্ণ-যাত্রার।

কৃষ্ণযাত্রার সঙ্গে অল্প বিস্তর অনেকেই পরিচিত আছেন আশা করি। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণ যাত্রা। পুরোপুরি

যাত্রাও নয় গীতিও নয়। এ দুইয়ের নিকৃষ্ট সমন্বয়। কারণ, যাত্রা বাণী (কথা) প্রধান কিন্তু কৃষ্ণযাত্রায় বাণী এবং গীতি সম পরিমাণেই থাকে। বোধ হয় সেইজন্যই কৃষ্ণযাত্রার আজও তেমন কোন ভাল বই চোখে পড়ে না।

কিন্তু 'কৃষ্ণলীলা' বিষয়টি সাম্প্রতিক আমদানি। খুব সম্ভবতঃ ১৯৩৩ খৃঃ কুমিল্লার ভুটুয়াবালক সম্প্রদায় কর্তৃকই সর্ব প্রথম এই বস্তুটির আমদানি ঘটে। কৃষ্ণ-যাত্রা এবং কৃষ্ণলীলায় বেশ কিছু পার্থক্যও দেখা যায় যেমন, কৃষ্ণযাত্রা বাণী প্রধান ও কৃষ্ণলীলা গীতিপ্রধান। অপর দিকে কৃষ্ণযাত্রার ভাষা মার্জিত, সভ্য সমাজে চলবার উপযুক্ত, কিন্তু কৃষ্ণলীলার ভাষা একেবারে খাঁটি গাঁএর চাষাভুষার ভাষা। এদের না আছে ব্যাকরণ জ্ঞান না আছে শব্দলালিত্ব। তবে একটা বিষয়ে আমাদের মনে হয় কৃষ্ণলীলা কৃষ্ণযাত্রার চাইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে সেটা হল এদেব রসসৃষ্টি করবার ক্ষমতা এবং পূর্ব বাংলাব অধিকাংশ শ্রোতার মনোরঞ্জন করবার ক্ষমতা।

এই কৃষ্ণলীলা এবং কৃষ্ণযাত্রাকে কয়েকটি পালাগানে ভাগ করা যায় :— (১) নৌকা বিলাস, (২) মানভঞ্জন, (৩) কলঙ্ক ভঞ্জন, (৪) সুবল মিলন, (৫) নিমাই সন্ন্যাস এবং (৬) কংস বধ।

আমরা এইবাব এই সমস্ত পালাগানগুলিব সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা সর্বজন বিদিত। কিন্তু এরই মধ্যে একদিন হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাব কুঞ্জে যাবার সময় চন্দ্রাবলী কর্তৃক ধৃত হন। ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণের আর সেদিন শ্রীরাধিকার কুঞ্জে যাওয়া হয় না। এদিকে কানু অদর্শনে শ্রীরাধিকাও মানের সাগরে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বেচারীর দোষ কি? সেত' আব ইচ্ছে কবে কামাই করেনি। তবু প্রেমিক হয়ে প্রেমিকার মান ভাঙ্গাতেই হবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাদূতীর মারফৎ যতটা তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে তাতে শ্রীরাধিকা নাকি 'কালো বদন আর হেরবে না'—

কাজেই এসব ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণেব ছদ্মবেশ ধারণ করা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই :—

রাধার মান ভাঙ্গিতে হরি হলেন এক রসের নাগরী
নানা মতে করিল সাজন।
চলল ধনি কুঞ্জবনে দেখা হয় কুটিলার সনে
কুটিলা তাই জিজ্ঞাসে তখন॥

তুমি কার রমণী কার ঘরণী · বল বল সত্যবাণী
ফের ধনি কিসের লাগিয়া।
ধনি আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করি বল বল ও সুন্দরী
তোমার কিগো হইয়াছে বিয়া॥

(তখন শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিচ্ছেন)

শুন ওহে চাঁদবদনী বলি আমি সত্যবাণী
ফিরি আমি বঁধুর লাগিয়া।
বয়েস হয়েছে বছর ষোল যৌবন আমার বয়ে গেল
এ পর্যন্ত না হল মোর বিয়া॥

কুটিলা কয় ও সুন্দরী চল তুমি আমার বাড়ি
চিন্তা কর কিসের লাগিয়া।
আমার দাদার রূপ যেমন দেখা যায় কার্তিকের মতন
তার সাথে আজ তোমার দিব বিয়া॥

নাকেতে নলচ দিব পায়ে পাতা মল লাগাব
আমরা সবাই দেখব প্রেমের ঘটা।
ফিতা পাইড়া শাড়ি দিব হাতে সোনার চুড়ি দিব
খোঁপায় দিব চিরণ আর কাঁটা॥

(তখন শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিচ্ছেন)

তোমার দাদার বাড়ি যাব তোমার দাদার নারী হব
তোমার দাদা পুরুষও নয় সোজা।
যদি তোমার দাদায় পুরুষ হইত মুখে তবে দাড়ি গজাইত
তোমার দাদা হবে বুঝি খোজা॥

(এইবার সত্য ঘটনা প্রকাশ পাওয়ায়, কুটিলার রাগ হয়, তাই সেও উত্তর দেয়)

আমার দাদা খোজা হইল একথা তোরে কে বলিল
দেখনা ধনি তুই একদিন শুইয়া।
থাকলে আমার দাদার ঘরে ছেলে হবে তোর উদরে
আমার দাদার রূপে ভুলিয়া॥

(তখন নারীবেশী শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিচ্ছেন)

তোমার দাদা এত পারে বাধা কেন জলিয়া মরে
রাধা হল কুলের কুলবধূ।
তোমার দাদার ঘরে রইল নারী হইল ধনি রাই কিশোরী
নন্দের বেটা খাইল টাটকা মধু॥

একদিকে শ্রীকৃষ্ণ চলেছেন শ্রীরাধিকার সঙ্গে মিলতে, পথে এই রকম গণ্ডগোল অন্যদিকে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণ দরশন বিনে একেবারে কাহিল। শ্রীকৃষ্ণ যে গতরাত চন্দ্রাবলীর কাছেই কাটিয়েছেন এ খবরও তার জানা হয়ে গেছে তাই বুঝি এখন তার প্রাণ রাখা দায়ঃ—

একদিন শ্যাম-সখী রাই কমলিনী এমনি শোকে উন্মাদিনী
বঁধুর শোকে পড়িল ধরায়।
তখন আসিয়া সকল নারী সখ্য ঘর সহচরী
কেন সখী ধুলাতে লুটাও॥
সখী বন্ধুর জ্বালা সয়না প্রাণে গৃহ ধর্ম নাহি মনে
বন্ধুর জন্য বিষাদে মগন।
বন্ধুর জন্য দিবানিশি গলে দিয়া প্রেম ফাঁসী
দেখ সখী নিকটে মরণ॥
বন্ধুর জ্বালা সয়না প্রাণে গৃহধর্ম নাহি মনে
বন্ধুর জন্য কাঁদি অনিবার।
আমার জ্বলে প্রাণ দিবানিশি গলায় দিয়া প্রেম ফাঁসী
নাহি সখী দুঃখের পারাপার॥
আমি কুলের কুল ছাড়া প্রেম করিয়ে ঘটল জ্বালা
এই জ্বালা কেমন করে সই।
সখী বন্ধু যদি আমার হত তবে কি আমায় ছেড়ে যেত
মিছে বন্ধু আমায় পাগল করে তাই॥
সখী বনের আগুণ সবে দেখে মনের আগুণ কেউনা দেখে
বন্ধুর প্রেমাগুণে মরি আমি পুড়িয়া।
আমি যখন যাইও জলে কুকিল ডাকে ডালে ডালে
আমার মনের কথা লয় সব কাড়িয়া॥

যখন সখী কলসী কাঁখে চলি আমি যমুনার ঘাটে
কলসী আমার ভরে অশ্রুজলে।
সখী বন্ধু যদি আমার হত, অবশ্যই সে দেখা দিত
আর আসিবে কি আমি মইলে॥

শ্রীকৃষ্ণ জানেন সবই। অথচ রাধার কাছে যাওয়া ত' সহজ নয়, তাই চট করে পুনরায় নারীবেশ ধারণ করে একেবারে আয়ান ঘোষের বাড়ীর কাছে গিয়ে হাজির। এমন সময় আবার সামনাসামনি পড়ে গেলেন কুটিলার—

কৃষ্ণ রাধার মান ভাঙ্গিতে রমণীর বেশ ধরে
নানামতে কবিল সাজন।
নিয়ে বাম কবে ফুলেব ডালা বিনা সুতায় গাঁথা মালা
হাতে নিয়ে অগুরু চন্দন॥
কৃষ্ণ সাজিয়ে নবরূপসী মুখে মৃদুমধুর হাসি
কুঞ্জপথে করিল গমন।
দেখা হয় কুটিলার সনে ব্যাধ যেন মৃগসনে
কুটিলা তাই বলিছে বচন॥
তুমি কাব কামিনী মন-মোহিনী সত্য কথা কও শুনি
কী নাম তোমার কোথায় বসতি।
বল কেবা মাতা পিতা হয় দেহ সত্য পরিচয়
আব এ-সংসাবে কে হয় তোমার পতি॥
তখন নারীবেশে কৃষ্ণধন কুটিলাবে বলে বচন
কৃষ্ণপুরে আমার বসতি।
আমি প্রেমতলাতে বসত করি ফিরি আমি বাড়ি বাড়ি
এ সংসারে কেহ নয় মোর পতি॥
তখন কুটিলা কয় হাস্য করি, শুন শুন ও সুন্দরী
বয়স হইয়াছে বছর পনের ষোল।
আমার দাদার যেমন গৌর বরণ দেখায় যেন বিজ্ঞের মতন
তার সনে তোর বিয়ার কথা রইল॥
তখন কৃষ্ণ বলে শোনলো সই, তোরে দুইটা কথা কই
তোর দাদারে বিয়া করতে আপত্তি কিছু নাই।

আমি যুবতী মাইয়্যা।   খোজার সঙ্গে আমার বিয়া

এমন কার্যে আমার ইচ্ছা নাই ॥

শ্রীকৃষ্ণ তখনকার মত বিদায় নিলেন বটে, কিন্তু ওদিকে কুটিলা রাগতে রাগতে বাড়ি ফিরে এসে ঝাল ঝাড়তে শুরু করল শ্রীরাধিকার উপর। শ্রীকৃষ্ণকে সামনা-সামনি কিছু বলতে না পেয়ে সে এইবার বলতে শুরু কবল বাধাব উদ্দেশ্যে :—

কেঁদে কুটিলা তাই বলে
ও বউ বলিযে তোবে
জল আনিবার ছলা করে
যাইসনালো কদম্বতলে,
পাডাব লোকে কত মন্দ বলে তাই।
আমাব দাদায় বড সাদা
সাদা মনে দিলি কাদা
ওহে কলঙ্কিনী রাধা।
মাথায় কেটে টেবী পাকা বাস্তা।
(ও) দাদা বাথানেতে থাকে
বাডির খবর সে কিছু না বাখে
দাদার আপন জমি পবে চষে
দাদা মিধুর মিধুর হাসে.
আমার এসব দুঃখেব কথা
কইবা কারই কাছে।

কিন্তু এতেই কি আর রাধাকে বেঁধে রাখা যায়? যেখানে "ঘরে গুরুজন, ননদী দারুণ, তাই বিলম্বে বাহির হৈনু" ব্যাপার, সেখানে কুটিলার দু'টো গালমন্দে আব কিইবা আসে যায়? তাই এবই পবে আমাদেব নজব পড়ে, শ্রীরাধিকা বিলাপ শুরু কবেছেন তার সখীদের কাছে :—

কোন বনে বাঁশী বাজায়
চল সখী দেখে আসি
বাঁশী বাজে যেথায়।
নিদেন কহিব কথা
ঘুচাব মনের ব্যাথা

বাঁশী ডাকে প্রাণসখী
আমার প্রাণ বুঝি যায়
কোন বনে বাঁশরী বাজায় ॥
বাঁশী বাজে একই তানে
যার যেমন সেই শোনে
চল সখী দেখে আসি
বাঁশরী বাজে যেথায় ॥

কিন্তু নাঃ। কৃষ্ণের আর দেখা নাই। তাই এবার আর শুধু বিলাপ নয়। শ্রীরাধিকাব শুরু হয়েছে প্রলাপ—যাকে বলে একেবারে দশম দশা। তাই :—

আর ত নিঠুর নাই
সখী আমার প্রিয়ার মত
আরত নিঠুর নাই।
ওগো কালিয়া কালিয়া বিষম কালিয়া
কে বলে কালিয়া ভালে।
কালিয়ার সনে পিরিতি করিয়া
কাঁদিতে জনম গেল।
(ওগো) সুবর্ণ বলিয়া করাত যেমন
আসিতে যাইতে কাটে,
(ওগো) কালিয়ার পিরিতি শুন বৃন্দাদূতী
কহিতে মরম ফাটে।
(ওগো তাইতে তাকে নিঠুর বলি)
ওসে নিঠুর কুলের শিরোমণি
তাইতে তাকে নিঠুর বলি।

শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন। অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে তবে দেখা মিলেছে চাঁদবদনী রাধার। কিন্তু হলে কি হবে? শ্রীরাধিকা মান করেই বসে আছেন। কোন কথার জবাব দেওয়া তার পক্ষেত দূরের কথা, কোন সখীরাও দিতে নারাজ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণত আর সোজা পাত্র নন। তাই আবার স্মরণ নিতে হয় তার মোহন বাঁশীকে—যে বাঁশী শুনে মুগ্ধ হয়ে থাকে বনের তরুলতা, ধেনুতে মুখে কাটেনা ঘাস, ভ্রমর স্থির থাকে ফুলের উপর, কুলের যত কুলবধূ ঘরের কাজ ফেলে রেখে জমায়েৎ

হয়ে আসে শ্রীকৃষ্ণ সান্নিধ্যে, আজ সেই পাগল করা বাঁশী শুনেও শ্রীরাধিক কী করে চুপ করে রয়েছেন সেইটেই সবচাইতে আশ্চর্য। শ্রীকৃষ্ণ বিষাদ সাগরে ডুব দিয়ে ওঠেন :—

রাধা রাধা বলে বাজরে আমার সাধা বাঁশী
একদিন বাঁশী বেজে ছিলে বাজত বাঁশী রাগিণী ধবে।
স্রোত বয়েছিল উজানকূলে
বাজত বাঁশী রাধা বলে।
বাঁশীতে করেছি রাধা নাম সার—
রাধা নামে তাই বাঁধা মোর প্রাণ।
প্রেম ভরে উচ্চৈস্বরে
বাজত বাঁশী রাধা বলে।

কিন্তু না। শ্রীরাধিকার মান এত সস্তা নয়। ব্যাথা দিতে সেও জানে। তাই সেও মুখ ফিরিয়েই রইল। এমন কি পায়ধবে সাধার পরও যখন শ্রীরাধিকা কিছুই বলে না তখন শ্রীকৃষ্ণকে বাধ্য হয়েই বলতে হয় :—

তবে আমি যাই, যাইগো রাধে
আবত দেখা হবে না গো। ,
যাই চলে জন্মেরই মতন
তবে আমি যাই গো যাই।
তোমার সাথে আমার সাথে
দেখাব কথা লেখা নাই
আরত দেখা হবেনা গো।
দেখে নাও জন্মেরই মতন ॥

কিন্তু সত্যিই কি শ্রীকৃষ্ণ চলে গিয়েছিলেন, না শ্রীরাধিকা যেতে দিয়েছিলেন? এর পরের কথা মঞ্চেই দেখান সম্ভব। কবির কাব্য যেখানে স্তব্ধ, লেখনী যেখানে অক্ষম, সেই চিরবাঞ্ছিত মুহূর্ত কল্পনা করা যায় শুধু অনুভূতি ও ধ্যানের দ্বারাই।

পল্লীকবির মান-ভঞ্জন পালাও তাই এখানেই শেষ।

এইবার আমরা নিমাইসন্ন্যাস পালাগান সম্বন্ধে কিছু বলব। 'নিমাই সন্ন্যাস' পালাগান মূলতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস যাত্রাকে উপলক্ষ করেই রচিত। এখন একটা প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক 'ধান ভানতে শিবের গীত' কেন? অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণলীলা

বর্ণনা করতে করতে হঠাৎ আবার চৈতন্যে যাওয়া কেন। শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা এ বিষয়ে তর্কের অবকাশ আছে, কিন্তু চৈতন্য সম্বন্ধে এরূপ কোন প্রশ্ন ওঠার সম্ভাবনা নেই। কারণ, তিনি ত' মাত্র সেদিনের লোক! কিন্তু তা' হলেও আমরা বাঙালীরা শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণেরই অংশভূত মনে করে নিয়েছি। সেজন্যই আমরা চৈতন্য সম্বন্ধেও পালাগান বাঁধি এবং তাঁকেও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই একই আসনে বসিয়ে পুজো করতে মনে কোনরূপ দ্বিধা করি না।

যাক সে কথা। চৈতন্যদেবকে এরা মনে মনে ভাগবান অংশভূত বলে স্বীকার করে নিলেও মাত্র দু'এক জায়গা বাদে কোথাও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এক করে দেখায়নি। মনে হয় এজন্যই কৃষ্ণলীলার পালা গানগুলির ভিতর 'নিমাই সন্ন্যাস' এত বেশী জনপ্রিয়। পক্ষান্তরে পল্লীকবির শ্রীগৌরাঙ্গকে কৃষ্ণ অংশভূত না দেখিয়ে শ্রীকৃষ্ণভক্ত দেখাবারই চেষ্টা পেয়েছে বেশী করে। তাদের কথায়ই :—

হরির নামে ভোলা
অঙ্গে মাখে ধুলা
(কেবল) বোলহরি বোলহরি
হরি হরি বোল
(ওসে) ঔষধে মানেনা
ভাবেরই পাগল।

যদি নাটকের আনুপূর্বিক আলোচনায় রত হওয়া যায় তা'হলে প্রথমেই নজর পড়ে এরা পট উত্তোলন করছে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি দিয়ে। রাধাকৃষ্ণ বসে আছেন একই আসনে। এমন সময় বিবেক এসে গান গাইতে থাকে :—

আইজ ক্যানে গো নিধুবনে কিশোরাই কিশোরী সনে
পুষ্পশয্যায় সুখনিদ্রা যায়গো।
মেঘের আড়ে সৌদামিনী কুটী চাঁদের রিণিঝিনি
পুষ্পশয্যায় সুখনিদ্রা যায়গো।

এর পর রাধাকৃষ্ণের গোটাকতক কথা। তার মূল কথা হল, শ্রীকৃষ্ণ এবার পাপী তাপী উদ্ধারের জন্য নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করবেন।

শুরু হয় পালাগান। পালায়, দেখায় চৈতন্যদেবের বাল্যলীলা থেকে সন্ন্যাসযাত্রা পর্যন্ত।

চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করলেন নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের

ঘরে। বাল্যকালটা তার কাটে শ্রীকৃষ্ণের মতই দুরন্তপনায়। এক কথায় শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলারই যেন অপর পিঠ। গঙ্গার ঘাটে পাড়ার যত কুমারী মেয়ে এসেছে কেউ সূর্য পুজো, কেউ নারায়ণ পুজো করতে এমন সময় সেখানে নিমাই (তখনও চৈতন্য আখ্যা পাননি) এসে হাজির :—

নিমাই—সখীগণ, তোমরা কার পূজা করতেছ?

কুমারীগণ—আমরা নারায়ণের পূজা করতেছি।

নিমাই—সখী, এই পূজাটা আমায় দিলে সুন্দর (অসুন্দর) স্বামী পাবি।

কুমারীগণ—যদি না দেই?

নিমাই—বুড়া পতি পাবিগো,
তুই সতীনে ঘর করিবি
বুড়া পতি পাবিগো।

শুধু কি মেয়েরাই ব্যস্ত হয়ে উঠল? পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ সব এসে পুজো আহ্নিক করছেন গঙ্গার পারে, কেউ কেউ দেবতার উদ্দেশ্যে সাজিয়ে দিয়েছেন নৈবেদ্য, নিমাই চট করে কোথা থেকে এসে সেই নৈবেদ্যগুলি তুলে নিয়ে টপাটপ করে পুরতে লাগল তার নিজের মুখের ভিতর। তখন ব্রাহ্মণগণ বলতে শুরু করেন :—

এইটা বুঝি সেইটা হবে
জগন্নাথ মিশ্রের কু-পুত্রটা
এইটা বুঝি সেইটা হবে।

ব্রাহ্মণগণ দেখেন, একে বলে বিশেষ কিছু হবে না। এদিকে নিমাইরও দলবল সব এসে হাজির হয়েছে, তখন ব্রাহ্মণদের ভিতর একজন প্রশ্ন করেন, "ওহে বাপু, ওগুলি ত গিললে, কিন্তু ভগবানকে নিবেদন করে দিয়েছ ত'?"

অপর এক ব্রাহ্মণ উত্তর দিচ্ছেন,

ও সে সন্ধ্যা-পূজা দূরের কথা
নিবেদনই জানে না।

ব্রাহ্মণের কথায় নিমাই বন্ধু নিতাই (মনে করুন কানাইবন্ধু বলাই যেন) উত্তর দিচ্ছে :—

ও সে নিজে হইল নারায়ণ
কারে করবে নিবেদন?

যাক, এইভাবে ত' কাটল বাল্য, কৈশোর এল যৌবন। আর পাঁচজনের

মত শচীমাতাও ছেলেকে রূপসী মেয়ে এনে বিয়ে দিয়ে দিলেন তার সঙ্গে। ভাবলেন, ছেলে সংসারী হবে। কিন্তু যাকে চাইছে জগতের কীটপতঙ্গ থেকে মানুষ পর্যন্ত সবাই, তাকে কি আর ছোট্ট সংসারের মায়ায় ধরে রাখা যায়? বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই নিমাই মত করল সন্ন্যাসে যাবার। অথচ একদিকে দুঃখিনী জননী, অপর দিকে যুবতী স্ত্রী এদের ফেলে যেতেও পারে না। এমন এক নাটকীয় মুহূর্তে আমাদের পল্লীকবি বিবেকের মারফৎ সমস্ত ঘটনাটা শ্রোতা ও দর্শকজনের কাছে উন্মুক্ত করে দিলেন :—

একদিনেতে নিমাইচাঁদ, বলে শচী
শুন মাগো আমারি বচন।
মাগো আমি যাবো সন্ন্যাসেতে
বিদায় দাওগো ভাল চিত্তে
আমার মনে এই আছে আকিঞ্চন।
তখন ইহা শুনি শচীরাণী
হইলেন যেন পাগলিনী
আঁচল দিয়ে মুছে দু'নয়ন।
বাছা তোমারে বিদায় দিয়া
কেমনে ধরিব হিয়া
তুইরে আমার জীবনেরই জীবন॥
(ওগো) একদিনেতে রজনীতে
নিমাই চলে সন্ন্যাসেতে
খুলিল সব অঙ্গের আভরণ।
তখন রাখিয়া সব বসনগুলি
মাথায় বেঁধে নামাবলী
মনের সুখে করিল গমন॥
(ওগো) নিমাই যখন বাহির হ'ল
বিষ্ণুপ্রিয়া ঘুমে ছিল
উঠে প্রিয়ে করে হাহাকার
প্রিয়ে শিরে হানে করাঘাত

কোথা গেল প্রাণনাথ
সোনার নদে করে অন্ধকার ॥
(ওলো) তোরে আমায় অনাথিনী
ছেড়ে গেছে বনমালী
মম ভাগ্যে এই ছিল বিধাতা।
শিরে হানে করাঘাত
কোথা গেল প্রাণনাথ
শচীমাতা বুঝায় কত কথা ॥
তখন বিষ্ণুপ্রিয়া শচীমাতা
কাঁদিয়ে ভাঙ্গে মাথা
ক্ষণে ক্ষণে মূর্ছাগত হয়।
ডাকে রাণী নিমাই নিমাই
প্রতিধ্বনি ওঠে নাই নাই
ইহা শুনে পড়িল ধরায় ॥

বিবেকের গানের পরই দর্শকের সঙ্গে অভিনেতাদের সাক্ষাৎ। গীতিনাট্যের বা নাটকের এই জায়গাই বোধ হয় চরম মুহূর্ত। বড়ই করুণ। বিষ্ণুপ্রিয়া সহ নিমাই ঘুমিয়ে আছে পালঙ্কের উপর। অঘোরে ঘুম দিচ্ছে ছু'জনেই। বাইরে পূর্ণ জোছনা। তারই এক ফালি এসে পড়েছে তাদের বিছানার উপর—যেন আকাশপথের ইঙ্গিত!

গভীর রাত। দুধে ধোয়া জোছনার রাতেও যেন থমথমে ভাবটা কাটেনি। মশা মাছি গাছপালা এমন কি বাতাসও বুঝি বন্ধ। এমন এক চরম মুহূর্তে নিমাইর হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। বাইরে থেকে জলদ গম্ভীর স্বরে ডাক দিচ্ছেন গুরুদেব কেশব ভারতী, নিমাই, সময় আর নাই।

নিমাই আর দেরী করে না। আবাল্যের বাসভূমি, জননী ও যুবতী স্ত্রীকে ছেড়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়। কিন্তু যাওয়া বললেই ত' আর যাওয়া হয় না। সব কিছু ছেড়ে যাবার পূর্ব মুহূর্তে যে মানসিক দ্বন্দ্বের আবির্ভাব ঘটে পল্লীকবি তা' গানে ফুটিয়ে তুলেছে অপূর্বভাবে।

নিমাই সব ছেড়ে যাবার জন্য একবার দরজা পর্যন্ত এগিয়ে যাচ্ছে, পুনরায়

ফিরে আসছে প্রেয়সীর বিছানার কাছে। এই ভাবকে অবলম্বন করে বিবেক বলে ওঠে :—

আমি যাই যাই মনে করি
যাইতে না পারি
মায়া মোহ রূপ মোরে
পিছনেতে ধায়— ।

কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্বে শেষটায় জয়ী হয় গুরুই। নিমাই আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে বেরিয়ে আসে বাইরে। বাইরের আকাশ, বাতাস অভ্যর্থনা জানায় তাদের সম্মিলিত কাকলীতে।

ভোর হয়। বাড়িতে ওঠে কান্নার রোল, বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীমাতার কান্নায় পাড়ার লোক জড়ো হয়ে গেছে। পাখীরাও ঐ একই সুরে সমবেদনা জানায়। প্রতিবেশীরা সান্ত্বনা দেয় শচীমাতাকে, আর শচীমাতা কাঁদেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে বুকে ধরে। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখ তাতে কমার চাইতে বাড়তেই থাকে বেশী করে। বিষ্ণুপ্রিয়ার মনের ভাব, তিনি যে শুধু এই জনমেই অভাগিনী তা নয়, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং এই কলিকালেও তাকে ঠিক এই একই রকম কষ্ট দুঃখ সহ্য করতে হচ্ছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার তখনকার মানসিক অবস্থা কথায় বর্ণনা সম্ভব নয়। ভাষা এখানে খেই হারিয়ে ফেলে। কিন্তু পল্লী কবিরা তাদের গীতিনাট্যে বিষ্ণুপ্রিয়াকে দিয়ে বলাচ্ছে :—

শচীমাতাগো, আমি চারি যুগে হই
জনম দুঃখিনী।
আমার দুঃখে দুঃখে জনম গেল
কভু না হইলাম সুখিনী ॥
সত্য যুগে ছিলাম আমি মাগো
সত্য-নারায়ণী
দুর্বাশার অভিশাপে আমি
হইলাম মর্ত্যবাসিনী ॥
শচীমাতাগো আমি চারি যুগে হই
জনম দুঃখিনী।

আমার দুঃখে দুঃখে জনম গেল
কভু না হইলাম সুখিনী ॥
ত্রেতা যুগে ছিলাম আমি মাগো
রামের ঘরনী।
বাদী হইল কৈকেয়ী মাতা
(আমায়) করল বনবাসিনী ॥
শচীমাতাগো আমি চারি যুগে হই
জনম দুঃখিনী।
দুঃখে দুঃখে জনম গেল
আমি কভু না হইলাম সুখিনী ॥
দ্বাপরেতে ছিলাম আমি মাগো
আয়ান ঘরনী।
শাশুড়ী ননদী বাদী আমায়
করল কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী ॥
শচীমাতাগো আমি চারি যুগে হই
জনম দুঃখিনী।
দুঃখে দুঃখে জনম গেল
আমি কভু না হইলাম সুখিনী
কলিযুগেতে হইলাম আমি মাগো
গৌরাঙ্গ ঘরনী।
অকালে ছাড়িল পতি মাগো
আমি বড় মন্দভাগিনী ॥
শচীমাতাগো আমি চারি যুগে হই
জনম দুঃখিনী।
আমার দুঃখে দুঃখে জনম গেল
আমি কভু না হইলাম সুখিনী ॥

এই অপূর্ব অতি সাধারণ ছন্দে গাঁথা পল্লীকবির গীতি ও দরদী গায়কের কণ্ঠস্বর শুনে সভায় এমন কোন লোক থাকেনা যে বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীমাতার জন্য সমবেদনা জানায়না।

আমরা দেবতাদের লীলাখেলা বর্ণনা করতে করতে হঠাৎ এক দৌড়ে একেবারে মর্ত্যলোকে চলে এসে ছিলাম তার কারণ, আমরা পূর্ববঙ্গের চলিত 'কৃষ্ণলীলার' পালা গানগুলির জনপ্রিয়তার উপর লক্ষ্য রেখেই এই ভাবে এগিয়ে চলেছি।

এই পরিচ্ছেদের প্রথমেই আমরা দেখিয়েছি, রাধা-কৃষ্ণের মান অভিমানের পালা। এইবার আমরা দেখাব শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে মিলনের তরে কি কি উপায় অবলম্বন করেছিল। একেতে 'ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ'—শাশুড়ী জটিলা এবং ননদ কুটিলার খড় দৃষ্টি সব সময়েই সতর্ক প্রহড়ার কাজ করছে, তা ছাড়া আছে পাড়াপড়শীরা। এখন কী ভাবে শ্রীরাধিকা যাবে শ্রীকৃষ্ণের কাছে এই হল সমস্যা।

শ্রীকৃষ্ণের বয়স তখন তের কি চৌদ্দ। নন্দ ঘোষের বেটা। মাঠে গরু চড়ায় রাখালদের সঙ্গে! ক্ষীর, ননী, ছানা, মাখন খায় আর দুরন্তপনায় অস্থির করে তোলে পাড়ার লোকদের। এই রকম এক সুপ্রভাতে ব্রজরাখাল বালকগণ এসে হাজির কৃষ্ণকে নিয়ে যাবার জন্য :—

বসিয়া মায়ের কোলে
ননী খেতে খেতে দোলে,
ও হেন কালে শ্রীদাম গিয়ে
বলে কানাইরে।
চল বনে যাই, বনে যাই
মোরা গোধন চড়াতে।
চল বনে যাই, বনে যাই
ও প্রাণ কানাইরে॥
তখন নন্দরাণী বলে বাণী শ্রীদামেরে
'যেতে দিবনা, যেতে দিবনা
আমার প্রাণ-গোপাল আমি
যেতে দিব না॥
আমি কুস্বপ্ন দেখেছি রাত্র-প্রভাতে
যেন প্রাণ-গোপাল হারা হ'য়ে
কাঁদি আমি পথে পথে।

যেতে দিবনা, আমার ননীর পুতলী গোপাল
বনে যেতে দিবনা—আমি যেতে দিবনা।
তখন শ্রীদাম বলে—
হে মা নন্দরাণী, তোর নীলমণি সামান্য নয়
কতলীলা খেলা দেখিয়ে মা কদম্বতলায়॥
শ্রীদাম কহিছে বাণী,
শুন গো মা নন্দরাণী,
নিত্য নিত্য যাই মোরা বনে (মা গো)
মোরা বনে যে যাই মা,
ও তোর কানাইর সনে মোরা
বনে যে যাই গো।
মোহন মুরারী স্বরে
তোর গোপাল গান করে
এমন গান আর কখনও
শুনিনি মা গো।
শুনিয়া বাঁশীর গান
যমুনা-জল বহে উজান
মুনিগণে ক্ষতি করে ধ্যান।
তারা ধ্যান যে করে না
মাগো তোর গোপালের গানে
তারা ধ্যান যে করে না।

'একে রামে রক্ষে নেই, তায় সুগ্রীব দোসর।' একা শ্রীদাম যা বলল, তাইতেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু তা নয়। শ্রীদামের কথা শেষ হতেই অপরাপর ব্রজ-রাখালগণ সমস্বরে বলে উঠল :—স্বর্গ হতে ঐরাবতে
ব্রজ হতে স্বর্গপথে
কোন্ দেবতা চিনতে না পারি মাগো।
আসিয়া গোপালের আগে
স্তব করে কত ভাবে
কোন্ দেবতা কেউ চিনতে না পারি মাগো।

চতুর্মুখ একজন
হংসপৃষ্ঠে আরোহন
কোন্ দেবতা চিনি না কখনও মাগো,
ও তোর গোপাল চেনে, তুমি চিন নাকী মা ?
আমরা তাকে চিনি না
(ও) তারে আমরা কেউ চিনি না।

এই ভাবে কাটে বাল্য কাল। কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনের দ্বারেও এসে হাজির হয় শ্রীকৃষ্ণ। এমন এক সময় বন্ধুবান্ধব সহকারে ভ্রমণ রত অবস্থায় নজরে আসে, রাধিকা সুন্দরী স্বর্ণ কলসী কাঁখে সঙ্গে শতাবধি সখী নিয়ে এগিয়ে চলেছে যমুনার ঘাটে। তখন শ্রীকৃষ্ণ সখা সুবলকে ডেকে বলছে :—

চেয়ে দেখ দেখরে সুবল
কার বা কুলের কুল বউ
কলসী লয়ে যায় যমুনায় (রে)।
কোন্ নিঠুর পাঠায়েছে হেথায়
দয়া নাই কি তার হিয়ায়
ও তার রূপ সায়রে উজান বয়ে যায় (রে)॥
ও সে কলসী কাঁখে চলে যখন
বৃক্ষের তলে বসে তখন
বাজাই আমার সাধের বাঁশী।
রাধা আমার প্রাণ প্রেয়সী॥
চেয়ে দেখ দেখরে সুবল
কারবা কুলের কুল বউ
কলসী লয়ে যায় যমুনায়।

শ্রীকৃষ্ণ যখন রাধার জন্য এতটা উতলা তখন বিবেক (বিবেক অনেকটা আধুনিক গীতি-নাট্যের শ্রুতিধরের মত। তবে শ্রুতিধরেরা সাধারতঃ গদ্যেই তাদের বক্তব্য প্রকাশ করে। কিন্তু বিবেক সব সময় পদ্যেই ভাব প্রকাশ করে থাকে। কৃষ্ণলীলায় বিবেকের দৌরাত্ম্য বড় বেশী মাত্রায়। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে) সমস্ত ঘটনাটা নিজের কথায় প্রকাশ করে শ্রোতৃ মণ্ডলীর কাজের খানিকটা সুবিধা করে দিল :—

গহন কাননে সুবলেরই সনে
করিত বিনোদ খেলা।
আনিয়া সুবল চম্পকেরই দল
মনোহরে গাঁথে মালা॥
মালা করি করে কহে গিরিধরে
নেরে নেরে ফুল মালা।
অতি অনুপম চম্পকেরই দাম
পররে কানু গলে॥
গহন কাননে সুবলেরই সনে
করিত বিনোদ খেলা।
ওগো তুষেরই অনল জ্বালালি সুবল
ব্যাথা জাগাইলি মনে॥
একবার তারে এনে দে ভাই
রাধা বিনে প্রাণ যায় গো
একবার তারে এনে দে ভাই॥
আমি চির-দাস হব
একবার তারে এনে দে ভাই॥

শ্রীকৃষ্ণের যখন অবস্থা এই রকম, 'রাধা বিনে প্রাণ বুঝি নাহি বাঁচে'—তখন সুবল ভেবে ভেবে এক ফন্দি ঠিক করল। সে চট করে একটা বাছুর নিয়ে সোজা আয়ান ঘোষের বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল। ভাবখানা যেন তার বাছুরটা এ বাড়িতে ঢুকে পড়েছে, সে ওটাকে নিয়ে যেতে এসেছে।

কিন্তু তাতে ফল কি হল শুনুন ঃ—

সুবল ভাবিয়া ভাবিয়া বৎস কোলে নিয়া
মহাল ভিতরে চলে।
দেখিল তখনি আছে সুবদনী
বসিয়া রন্ধনশালে॥
ওগো কুটিলা তখন কেরে কেরে করি
ধাইল সুবল পানে,
'ও তুই কে রে?'

মোদের বউকে . নিতে এলি বুঝি
ও তুই কে রে?
দূরে চলে যা—
দূরে চলে যা॥

কিন্তু সুবলকে হটান এত সহজ নয়। সে বাছুরকে না নিয়ে ত' আর ফিরতে আসেনি। কাজেই ইচ্ছে করেই দেরী করতে থাকে। কুটিলারও রাগ বাড়তে থাকে। শেষটায় সে যায় মা জটিলাকে ডেকে আনতে। এদিকে রাধা আগে থাকতেই প্রস্তুত। সেও চট্ করে সুবলের হলদে কাপড় নিজে পরে সুবল সেজে ধেনু সহ বাইরে চলে যায়—যেখানে তার জন্য প্রতীক্ষা করে বসে আছে শ্রীকৃষ্ণ গুণমণি। আর এদিকে সুবল রাধিকার লাল কাপড় পরে, মাথায় ঘোমটা দিয়ে রাধা সেজে বসে গিয়ে রান্নাঘরে। জটিলা কুটিলা ফিরে এসে দেখে রাধাও নেই সুবলের বাছুর ও নেই, তার বদলে সুবল রাধা সেজে বসে আছে। তখন আর কী? মা দেয় ঝির দোষ, ঝি দেয় মার দোষ। আর জটিলা কুটিলাকে দোষ দেবার জন্য আসবে আবির্ভাব ঘটে বিবেকের। সে উভয়কে উদ্দেশ করেই বলতে শুরু করে:—

ও তোর কুটিলতা ছাড় কুটিলে
কুটিলতা ছাড়।
তুই কুটিলে জানিস ফন্দি
তার চেয়ে যে ওর বিষম সন্ধি
(ও তুই কুটিলতা ছাড)।
সুবল সেজে রাধা গেল—
কী করলি তার?
ও তুই কী করলি তাব?
(ও তুই কুটিলতা ছাড)

এর পরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত। আয়ান ঘোষ ফিরে এসেছে। রাধাও অন্যদিক দিয়ে ঘরে পৌছে গেছে। আর সুবলও এই হট্টগোলের মধ্যে এক দৌড়ে পৌছে যায় একেবারে শ্রীকৃষ্ণের কাছে।

শ্রীরাধা হ'ল কুলের কুলবধূ। যা'র ঘরে এই রকম শাশুড়ী ননদ বিদ্যমান তার কপালে যে সুখ শান্তি কতখানি তা' ত' বুঝতেই পারা যাচ্ছে। এই রকম

একদিন শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছে যায় শ্রীরাধিকাকে স্নানরত অবস্থায় দেখবে, তাই সে যমুনার ঘাটে কদম গাছের ডালে বসে শুরু করে বাঁশী বাজাতে।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণেরও অনেক সময় ভুল হয়, তাই ব্যাপারটা কুটিলারও নজর এড়ায় না। সে বাড়ি গিয়ে রাধাকে যমুনার ঘাটে আসতে নিষেধ করে। কিন্তু রাধা যখন ওসব সামান্য নিষেধ গ্রাহ্যই করে না তখন সে আশ্রয় নেয় মিথ্যার। কুটিলা বলে, যমুনায় এক ভীষণ জন্তু এসেছে, সে নাকি ভারী অদ্ভূত। শিশু কিংবা বৃদ্ধ স্ত্রীলোক যদি নদীতে যায় তা হ'লে সে কিছুই বলে না। কিন্তু যুবতী স্ত্রীলোক গেলে নাকি আর রক্ষা নেই, অমনি একেবারে জলের মধ্যে টেনে নিয়ে চলে যায়। এবং এর চাইতেও আশ্চর্যের বিষয়, যদি পুরুষ কেউ জলে যায় তা হলে সে আর সেখানে থাকে না। তাই এমন অবস্থায় শ্রীরাধিকার মত যুবতী নারীর যমুনার ঘাটে স্নান করতে যাওয়া কোন মতেই উচিত নয়। পল্লী কবি কুটিলার এই মনের ভাব বিবেকের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছে :—

একদিন শ্যাম নীল দলে বাধা বদন হেরব বলে
ধীরে ধীরে চলে শ্যাম রায়।
গিয়ে যবুনার কদম্বমূলে দাঁড়াইল কুতুহলে
কুটিলা তাই দেখিবারে পায়॥
কুটিলা কয় শোনলো বউ জল আনতে যাইশনা লো কেউ
ব্রজের যত আছে ব্রজাঙ্গনা।
কাল কুম্ভীর এল যবুনাতে দেখে এলাম সচক্ষেতে
তাইতে তোদের যেতে করি মানা॥
কে দেখেছে কোন কালে কুম্ভীরেতে মানুষ পেলে
কখনও কি কেউরে ছেড়ে দেয়।
সে যে বাইছা বাইছা করে আহার তাই দেখে লাগে চমৎকার
বাল্য বৃদ্ধ কিছু নাহি খায়॥
পুরুষ যদি যায় যবুনায় অমনি কুমীর ভয়েতে পালায়
আড়ালে থাকিয়া লক্ষ্য করে।
যায় যখন যুবতী বালা অমনি এসে ধরে গলা
নিয়ে যায় সে হরিষ অন্তরে॥

তোরে নিত্য নিত্য করি মানা জলের ঘাটে মোটেই যাইশ না
আমার কথা শুনিশ না বউ মোটে।
তোরা নয়জনাতে যুক্তি করে সন্ধ্যাকালে যবুনাতে
জল আনতে যাশ কদম তলার ঘাটে॥
আছে ঐ পাড়ার ঐ কতকগুলি কুলে মানে দিচ্ছে কালি
সেই দলে বউ করিশ আনা গোনা।
কত ছেদার গোদার বেতাল দলে লেংটা হয়ে নামে জলে
ও বৌ চোখ থাকতে হ'স কেন কানা॥
বশীকরণ মন্ত্রের জোরে ভুলায়ে আমার দাদারে
আমারে ভুলান বড় দায়।
ভেবে নলিনী কয় যুক্ত করে রাধা রূপে জগৎ ভরে
গঙ্গার জলে শুষে লোহায়॥

শ্রীরাধিকার আর সেদিনকার মত যমুনায় যাওয়া হলনা বটে, কিন্তু কয়েকদিন পরেই ঘটল আর এক নতুন ফ্যাসাদ। শ্রীরাধিকা নয়জন সখী নিয়ে চলেছে মথুরার হাটে দই বিক্রি করতে (গোপনারীগণ, গোপ পুরুষদের মতোই পাড়ায় পাড়ায় দই, ছানা, মাখন বিক্রি করতে যেতো। এরূপ নজির পাওয়া যায়)। কিন্তু যমুনার ঘাটে এসে দেখে সেখানে আছে মাত্র একখানা নৌকো আর তার মাঝি। তার উপর নৌকোও ভাঙ্গাচোরা, অথচ তাদের অপর পারে না পৌছলেও নয়। কাজেই শ্রীরাধিকা বাধ্য হয়েই সেই ভাঙ্গা নৌকোতেই উঠল। আদতে এ সবই শ্রীকৃষ্ণের ছলনা। ঐ নৌকোর মাঝি হ'ল ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ। রাধা এবং তার সখীদের নিয়ে একটু মজা করবার জন্যই তার ঐ বেশ ধারণ। এরপর কী ঘটল এইবার তা' আমরা শুনব পল্লীকবির গান এবং কৃষ্ণলীলার "নৌকা-বিলাস" পালা-গানের শ্রুতিধরের মুখ থেকে :—

একদিন সখী সঙ্গে বিনোদিনী করতে সাধের বিকি কিনী
চলল ধনি মথুরার হাটে।
নিয়ে সঙ্গেতে দধির পসারী পরে নীলাম্বরী শাড়ি
তারা উদয় হইল যবুনার ঘাটে॥

শ্রীকৃষ্ণ তাই জানতে পেরে নবীন নাবিক হ'য়ে
খেয়া তরী করিল সৃজন।
গিয়ে যমুনার জলে বাহেন তরী কুতূহলে
তরী দেখতে পেল সখীগণ॥
সখীগণে নাবিকে দেখে ডেকে বলে ও নাবিকে
কেগো তুমি তরী বেয়ে যাও।
আমরা চলেছি মথুরার হাটে ঠেকেছি যমুনার ঘাটে
মাঝি ত্বরায় মোদের পার করিয়া দাও॥
ডেকে বলে নন্দের কালা কে গো তোমরা কুলবালা
বসে আছ যমুনারই কূলে।
তোমাদের ঐ মধুর ডাকে পড়ল তরী বিপাকে
তরী ডুবে বুঝি যমুনারই জলে॥
একে আমার ভাঙ্গা নাও তোমরাত' পার হতে চাও
মনে মনে করি অনুমান।
তোমাদের বক্ষে আছে কুচ-গিরি ঐ গিরিতে হবে ভারী
একজনের ভার দুইজনের সমান॥
তখন ললিতা কয় ওগো নেয়ে আমরা যুবতী মেয়ে
উপহাস তোমার উচিত নয়।
তোদের পুরুষের যাই বলি হারি দেখলে পরে পরের নারী
রঙ্গ করতে কতই কথা কয়॥
নাবিক কথায় কথায় বেলা যায় উপহাসের সময় নয়
ত্বরায় আনহে খেয়া তরী।
দ্বিজ নলিনী কয় বংশীধারী আর কেন কর দেরী
ঘাটে সখী সহ এসেছে কিশোরী॥

এর পরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। শ্রীরাধিকা সঙ্গী সাথীদের নিয়ে উঠল গিয়ে নৌকোর উপর। নৌকো কিছুক্ষণ চললও বেশ। এমন সময় নদীতে ওঠে ভীষণ ঝড়। নৌকা করে টলমল। সখীরা হ'য়ে পড়ে ভীত সন্ত্রস্ত। সখীরা পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে শুরু করে কান্না। রাধিকা সুন্দরী ছিল একেবারে মাঝি বেশী শ্রীকৃষ্ণের পাশে সে তখম নিরুপায় হয়ে :—

"এক হাতে নাবিকের কণ্ঠ জড়ায়ে ধরি
অপর হাতে ডাকি কোথা আছ দয়াময় হরি"

বলে ডাকতে থাকে।

ঝড় তুফান থেমে যায়। সখীসহ শ্রীমতী রাধিকাও পরপারে গিয়ে পৌছয়।

একবার শ্রীকৃষ্ণ কি ভাবে শ্রীরাধিকার কলঙ্ক মোচন করেছিল এই নিয়েই হ'ল কলঙ্ক-ভঞ্জন পালা। এই কলঙ্ক-ভঞ্জন পালায় গীতিকার দেখাবার চেষ্টা করেছে, শ্রীরাধিকা কুলের কুল বধূ হ'য়ে অপর পুরুষকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসলেও আদতে জগতের সেই হল সর্ব শ্রেষ্ঠ সতী।

মনে করুন শ্রীকৃষ্ণ যেন ঘুমিয়ে আছে নন্দরাণীর কোলে, এমন সময় ব্রজ রাখালগণ শ্রীকৃষ্ণকে গোচারণে নিয়ে যাবার জন্য ঢুকল মঞ্চের (আসর-কৃষ্ণলীলা সাধারণতঃ যাত্রার মত আসরেই হয়) উপর। আসরে ঢুকেই তারা গাইতে থাকে :—

প্রভাত হয়েছে নিশি রজনী আর নাই,
আয়রে কানাই, আয়রে বলাই, গোচারণে যাই।
বিনা গোপাল গোঠে গো-পাল যায়না ভাই কানাই,
বাজারে বেনু লয়ে ধেনু নেচে নেচে যাই॥

কিন্তু নন্দরাণীর মন আজ বড়ই ব্যস্ত। গোপালকে আজ আর তিনি কিছুতেই কাছ ছাড়া হতে দিতে চান না। শেষটায় অবশ্য বালকগণের অনুরোধ উপরোধে পরে গোপালকে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি করজোড়ে প্রার্থনা শুরু করলেন মা মহামায়ার উদ্দেশ্যে :—

ওমা মহামায়া হওনা নিদয়া
থেকো মা সদয়া আমার গোপালে।
যেন কংশ-চরে, আমার বংশধরে
এসে নাহি ধরে বিপিনে॥
আমি গো জননী, সাধন না জানি
ভরসা কেবল তব চরণে।
রেখ মা স্বগুণে, অবোধ সন্তানে
বনে কি জঙ্গলে কুমারে॥
একে কপাল মন্দ, তাই হয়রে সন্দ
পাছে হারাই আমার গোবিন্দরে।

বলিরে বলাই, চলিল কানাই
দেখিশরে সবাই বাছারে ॥

একদিকে এই রকম ব্যাপার। অপরদিকে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণ দরশন মানসে সাজসজ্জা করে বের হচ্ছে, এমন সময় ধরা পড়ে গেল ননদী কুটিলার কাছে। কুটিলাত' মুখে যা এল তাই বলে হিড়্ হিড়্ করে টানতে টানতে তাকে নিয়ে গেল বাড়ির ভিতর। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আসরে এসে উদয় হল বিবেক। সে কুটিলাকেই লক্ষ্য করে বলতে থাকে :—

কেন ধাঁধায় মরতেছিশ ঘুরে,
জগৎ ঘোরে যারই তরে
কেবল চিনলি না তোরা ॥
সিন্ধু কি রয় বালির বাঁধে,—
বৃথা ওরা মায় ঝিয়ে কাঁদে।
ধরবি যদি গোকুল চাঁদে—
নামের ফাঁদ পেতে বসরে।

কুটিলা শুনতে পেয়ে বলছে, কি আপদ এ পোড়ামুখো আবার কোত্থেকে এসে জুটল ?

কুটিলার কথায় বিবেক উত্তর দিচ্ছে :—

লাগছে আগুন তোদের ঘরে
আমার ঘর বল কেমনে পোড়ে,
(এবার) জ্বলবেরে কৃষ্ণ গুণাগুন
আগুন জলেও নিভবে না রে ॥

কয়েকদিন পর। রাধাকৃষ্ণের আবার মিলন হয়েছে। দুজনে দুজনের মনের কথা বলতে ব্যস্ত। এমন সময় সেখানে এসে হাজির বৃন্দা দূতী। বৃন্দার দূতীয়ালী সর্বজন বিদিত। তাই যে কোন সময় যে কোনো ভাবেই হ'ক না কেন রাধা কিংবা কৃষ্ণকে ইচ্ছে করলেই সে পরিহাসচ্ছলে দু'কথা বেশ শুনিয়ে দিতে পারে—এ অধিকার তার জন্মে গিয়েছিল। তাই :—

বলিতেছি শুন রাধে কোথা কেবা শোভে চাঁদে
বিপরীত হেরিতেছি তাই কানু বিবাদে ॥

তোদের ভাবের গতি বুঝতে নারি।
তোরা কোন ভাবেতে বিভোর হলি।
শুন বলি রাই,
চন্দ্রবিনা কুমুদিনী
শোভা নাহি হয় যেমনি
নীল বিনা নীলমণি
শোভা পায় কি রাই॥

এদিকে এই ব্যাপার। অন্যদিকে দৈত্যরাজ কংশ বন্ধুবর কেশীর উপর আদেশ জারি করেছে, যে করেই হ'ক, নন্দ ঘোষ ও তার ছেলে কৃষ্ণর প্রাণ সংহার করা চাই-ই। কেশী নিজেও কমতি নয়। তাই দেখা যায় তাকে তার দরবারে সুরাপানোন্মত্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে আর সেখানে গান গাইতে থাকে সব নর্তকীর দল :—

লহরে লহরে প্রেম লহরে
প্রেমিকের তরে বহিয়া যায়।
প্রেমিক যে জন দিলে প্রাণমন
সে প্রেম লহরে ভেসে যেতে চায়।
এ নব বসন্তে মোরা রসবতী
আলো বিভোরা মোরা গো যুবতী
রসিক হৃদয়ে হয়ে মাতোয়ারা পাগল পরাণে ধায়।
তোমার বিরহ সহি অহরহ
অনঙ্গ শরে জ্বলিছে দেহ।
বিরহে বিধুরা যতেক ভ্রমরা বহিছে মৃদুল দখিন বায়॥

এবং ;

প্রেমের বেসাত করি আমি
প্রেম বাজারে বেচি কিনি,
প্রেমিকের প্রেম অমনি বিলাই
খুলে দিয়ে হৃদয় খানি।

চোখে খেলে প্রেমের হাসি
প্রেমিকের প্রাণ উদাসী
লুটে পায় প্রেমিক পুরুষ
প্রাণটা নিয়ে টানাটানি ॥

দৈত্যরাজ কেশী যখন এই রকম সুরাপানোন্মত্ত অবস্থায়, এমন সময় আমাদের বিবেক আসরের মাঝে এসে উদয় হয়ে দৈত্যরাজকে সাবধান করে দিচ্ছে :—

এই দেশটা শুধু করল মাটী সুরা আর নারী।
সবাই অধঃপাতে যাচ্ছে চলে এই সোজা পথ ধরি ॥
ত্যাজ, ছাড় বিষয় বাসনা, ধরগে সাধু সঙ্গ।
দিন থাকতে খুঁজে নেরে বাঁকা শ্যাম ত্রিভঙ্গ ॥
ডুবল বেলা, ছাড়রে খেলা, এসেছে তোর পারের তরী।

দৈত্যরাজ কেশী ত' বিবেককে পাগল বলেই সাব্যস্ত করল। তখন বিবেক সে কথার উত্তরে বলছে :—

মিছে বল পাগল পাগল
পা নয়কো মোর গোল,
মগজ নেড়ে দেখছি আমি
মাথাই আমার গোল ॥
গোলে গোলে বল হরি বোল
বিষয়েরে কৃতান্ত ভাবি ॥

বিবেকের কথায় কেশী উত্তেজিত হ'য়ে অসি ধারণ করে তাকে কাটতে যায়। বিবেক তখন আসর পরিত্যাগ করবার সময় বলে যাচ্ছে :—

মরণরে ভয় দেখাও কারে
মাথার উপর মাথা।
হরিভক্তের ঘরে ঢুকে বল
হরিদাসের কথা।
যেদিন অসুরবংশ হবে ধ্বংস
ঘুচবে সেদিন বারাবারি।

দৃশ্য পরিবর্তন।

কিছুক্ষণ আগেই আমরা দেখেছি শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অভিমান করে

বসে রয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ নিরাস হয়েই ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের বিচ্ছেদ কি সম্ভব? তাই দু'দিন পরেই শ্রীকৃষ্ণকে আবার দেখা যায় তার পরিচিত কদম তলায় বসে বাঁশী বাজাতে। এমন সময় বৃন্দা দূতী রাধার সংবাদ নিয়ে এসে হাজির :—

কে আছ, কে আছ তুমি দাঁড়িয়ে কদম্ব মূলে,
দেখলে তোমার ও চাহনি, জ্ঞান হয়না লো ভাল বলে।
কী আছে তব অভিপ্রায়, ভাবে বোঝা যায়
নইলে কেন থাকবে একা কদম্ব তলায়
তোমায় ছাড়িব পরিচয় পেলে।

শ্রীকৃষ্ণও নেহাৎ গো-বেচারীর মত উত্তর দিচ্ছে :—

আমি ক্ষীর ননী খাই
আদরে বেড়াই
পালিত যশোমতীর কোলে,
আমার দাদা সেই বলরাম
যা'র সিঙ্গায় মুগ্ধ এই ব্রজ ধাম॥

এর পর অবশ্য কুশল জানাজানির পালা। বৃন্দাদূতীও শ্রীকৃষ্ণের মনের ভাব বুঝে নিয়ে একটু রসিকতা করে বলে যাচ্ছে :—

অমনি উথল ধরে
দুধের ব্যাথায় ব্যাথিত হয়ে
অমনি উথল ধরে।

দিন যায়। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন কম্বমুণি এলেন নন্দ বাজাব বাড়িতে। তিনি যতবারই আহার্য নারায়ণে নিবেদন করে দিচ্ছেন ততবারই শ্রীকৃষ্ণ এসে তার খাবার সব খেয়ে নিচ্ছে। এতে নন্দরাণী বিরক্ত হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণকে পাশের ঘরে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে এলেন। কিন্তু তারপরও দেখা গেল শ্রীকৃষ্ণ যেন কোথা থেকে ছুটে এসে তার খাবার সব খেয়ে নিচ্ছে। সবাই বিস্মিত! ভাবে এ কি ব্যাপাব!! শ্রীকৃষ্ণ তখন উত্তর দিচ্ছে :—

মা গো আমি কেবল ভক্তের অধীন,
(ও) তাই ভক্তের তরে ব্রজপুরে আছি কতদিন।

যুগ-ধর্ম প্রচারিতে, এসেছি এই অবনীতে,
তাই ব্রজপুরে প্রেমামত্ত সব আমাতে লীন ॥
ভক্তিভরে নাম ধরে
মোরে নিবেদন করে
ডাকে আমায় সকাতরে
তাইতো এসেছি।

এতক্ষণে কণ্বমুনির চৈতন্য উদয় হয়। তিনি মহানন্দে শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত নৈবেদ্য গ্রহণ করলেন। এবং এই সংবাদ পেয়ে ছুটে এল পাড়ার যত নারীগণ (পাঠকগণকে স্মরণ রাখতে হবে, শ্রীকৃষ্ণ জন্মের পর থেকেই ভগবান বলে পরিচিত হন নি। তাঁর লীলা শেষ হবার আগে পর্যন্তও একথা কোথাও প্রকাশ করেন নি। আর নাটকের গল্পাংশ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য নেই। কারণ, আমরা যেমনটি পেয়েছি তেমনটিই এখানে উপস্থিত করেছি—এর দায়িত্ব আমাদের নয়) সব এসে জুটলো শ্রীকৃষ্ণের (এখানে ভগবান বুঝতে হবে) প্রসাদ নিতে :—

দাও দাও ঋষি করুণা প্রকাশি
আমি ঐ প্রসাদের প্রত্যাশী
পেয়ে ও প্রসাদ নাশিব বিষাদ
পূরাও মনোসাধ হে ঋষি ॥
নারায়ণ প্রসাদে অসাধ্য সাধিব সাধে
নমি মোরা ঐ ব্রহ্মপদে অভিলাষী ॥

একদিকে শ্রীকৃষ্ণ যশোদার ঘরে দিন দিন এই ভাবে হাসি খেলা করে দিন কাটান, অন্যদিকে শ্রীরাধিকা শ্যাম বিরহে কাতরা। দিনের পর দিন অপেক্ষা করে দয়িতের তরে। কিন্তু না। শ্যাম বুঝি আর আসবে না। তাই বৃন্দাদূতীর কাছে তা'কে বলতে শুনি :—

নানা জাতি ফুলে কুঞ্জ বন করে আলো
(সখী) বিফলে সকলি গেল
বিনা সে চিকন কালো।
সখী আর কি আসিবে শ্যাম ॥ (২)
আর কি আসিবে, বাঁশী কি বাজাবে
বিধি যে আমারই বাম ॥

আশা দিয়ে বঁধু এই আসি বলে
ভেবোনাকো রাই, বলে গেছে চলে
অবলা রাধার কিবা আছে আর
বিনা সে নিঠুর শ্যাম ॥
(সখী) আমার দিন কি এমনই যাবে।
কৃষ্ণ বলে কাঁদতে কাঁদতে
কৃষ্ণ সেবায় দাসী হয়ে
দিন কি আমার এমনই যাবে ॥

শ্রীরাধিকার যখন এই রকম অবস্থা—কুঞ্জবন তার ব্যথায় ব্যথিত, সব নীরব, শুক-শারী আর গাহেনা গান, বাতাস বহে না মৃদু মধু ভাবে, তরুলতা আজ নিম্ন মুখী, স্থাবর জঙ্গম সব যেন একাকার হয়ে গেছে। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ এসে উদয় হন কুঞ্জ পথে :—

গঙ্গা কেন বিমুখী আজ
সাগর সঙ্গমে।
শুকের মুখ দেখেনা শারী
সুখ নাই তার মরমে ॥
ময়ূর ত্যাজে ময়ূরিণী
ভ্রমরা ত্যাজে ভ্রমরিণী
মেঘে ত্যাজে চাতকিণী
কী ব্যতিক্রমে ॥

এইবার অবশ্যই শ্রীরাধিকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পালা। সে প্রশ্ন করে, যে নামের গুণে জগতের পাপী তাপী সব উদ্ধার পায়, আর সেই শ্রীকৃষ্ণ-দাসী হয়ে রাধা কেন এত কষ্ট পায় :—

(আমায়) সবে বলে রাধা কলঙ্কিনী
কভু বৃন্দাবনে খেলি বৃন্দা সনে
দেখে দেখে হাসে আর
পোড়ারমুখী ননদিনী।

রাধিকা ঘরে শাশুডী ননদীর কাছে জ্বালা যন্ত্রনা ভোগ করলেও তার মস্ত বড় শান্তনা ছিল স্বামী আয়ান ঘোষকে নিয়ে। একে আয়ান ঘোষ ছিল নপুংশক

(পৌরাণিক কাহিনীতে আছে) তার উপর সে ছিল পরম কৃষ্ণ-ভক্ত। কাজেই মা, বোন বউর নামে যতই কুৎসা রটাক সে তা' গায়ে মাখে নি। কিন্তু অনবরতই যদি ঘরে এবং বাইরে একই কথা শুনতে হয় তা হ'লে সে কী করে ?

কিন্তু তার এ সন্দেহ দূর করবার ভার নিলেন ভগবান নিজেই। তিনি মঞ্চে নিয়ে এলেন বিবেককে। বিবেকই যেন ভগবানের প্রতিনিধি হয়ে বলতে থাকে :—

ভুলের ঘোরে কুলে উঠে
ঝাঁপিয়ে জলে পড়লি ছুটে
এবার যাতে কর্ম টুটে
সেই সন্ধি কব সম্বল ॥
অকূলে যবে ভাসিবি
রাধার কাছে শরণ নিবি
যদি ডঙ্কা মেরে পারে যাবিত
মুছাশ রাধার নয়ন জল ॥
যে যা বলে বলুক তারা
মিথ্যা বলে বুঝো ত্বরা
রাধিকার সতীত্বের ধারা
ঘুচাবে তোর কোলাহল ॥
চিন্‌বি যেদিন বুঝ্‌বি সেদিন
ঘুচে যাবে যত গোল ॥

ব্রজধামে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা সর্বজন বিদিত। রাধিকার আর ঘরে তিষ্ঠান দায়। তাই শ্রীকৃষ্ণ ঠিক করলেন যে ভাবেই হ'ক রাধাকে জগতের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ সতী প্রমাণ করবেনই। তাই তিনি একদিন এক কঠিন অসুখের ভান করে পড়ে রইলেন ঘরে। পাড়া শুদ্ধ লোক ছুটে এল দেখতে, সবাই করে হায় হায়। নন্দরাণীর কান্নায় বনের পশু পাখীরও বুঝি দয়া হয়। গাছের কাঁচা পাতাও বুঝি ঝরে পড়ে। কিন্তু জটিলা কুটিলা অর্থাৎ রাধার শাশুড়ী ননদীর মুখে ফুটে ওঠে এক বিচিত্র হাসি। ভাবে, এইবার তা' হ'লে কেষ্ট বেটার দফা শেষ— রাধাও জব্দ, তাদেরও মনস্কামনা সিদ্ধ :—

এমন দিন আর কি হবে
কালীর কৃপায় আমোদ ভারী।
চলে গেছে আপদ বালাই
কেষ্টা গেল যমের বাড়ি॥

মা গো মা কি বুকের পাটা
বাঁধিয়ে ছিল কম কি লেঠা
ছুঁড়িগুলো ছুটত ভাটা
বাজলে বনের পাপ বাঁশরী॥

নন্দরাণী হায় কি নাকাল
রাখাল গুলো হ'ল বেহাল
নন্দ মিন্সে পথের কাঙ্গাল
দেখে মাইরি হেসে মরি॥

সংবাদ পেয়ে মাঠ থেকে ছুটে এল ব্রজরাখালগণ, নন্দরাজ, প্রতিবেশী, রোজা ও বদ্যি কেউই বাদ নেই। কিন্তু অসুখ ভাল হবার কোন লক্ষণই দেখা যায় না। নন্দরাণী হায় হায় করে ওঠেন। নন্দ ঘোষ শোকে অধীর হন। এমন সময় ঘটনাস্থলে এসে হাজির হয় এক নূতন বৈদ্য। তিনি সব শুনলেন। শুনে এক নূতন বিধান দিলেন, সহস্রাধিক ছিদ্র কোন কলসীতে করে যমুনার ঘাট থেকে যদি কোনো সতী-নারী জল নিয়ে আসতে পারে, তবে সেই জলে স্নান করে কৃষ্ণ রোগ মুক্ত হবে।

প্রথমটায় রাজি হয়না কেউই। একে একে নন্দরাণী থেকে পাড়া-প্রতিবেশী সবাই চেষ্টা করে। কিন্তু ফল একই। তখন খোঁজ পড়ে পাড়ার ডাঁক সাইটে সতী জটিলা ও কুটিলার। কিন্তু তারাও হার মানে। সবাই বলা বলি করে দৈবজ্ঞের অসম্ভব কথা নিয়ে।

দৈবজ্ঞ-বৈদ্যকে আবার গুণতে বসতে হয়। তিনি গণনা করে বলে দিলেন, এ গ্রামে রাধা নামে যদি কোন নারী থাকে তবে তাকে আনা হউক, সেই জল আনতে পারবে।

দৈবজ্ঞের কথায় সব চাইতে রুষ্ট হয় রাধার শাশুড়ী ননদ। কিন্তু তবু দৈবজ্ঞের কথায় তাকে ডাকতে হয়।

এদিকে শ্যাম বিরহানলে জ্বলে মরছে শ্রীরাধা। সে বসে বসে আক্ষেপের সঙ্গে গান গাইছে বৃন্দার কাছে :—

আমি তারে পেলাম কই
জ্বলে মলাম সই।
শ্যাম বিরহানলে
আমি ঘরে জ্বালা সই
সই, আর পাব কি প্রাণ গেলে
আমার সকল জ্বালার শান্তি হ'ত
শান্তিময়ের চরণ পেলে।

খবর পেয়ে শ্রীরাধিকা উন্মাদের মত ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হয় ঘটনাস্থলে। অথচ মুখে বা হাব ভাবে তা' গোপন রাখার জন্য সাধ্যমত চেষ্টাও করে। নীরবে দৈবজ্ঞের আদেশ অনুসারে ছিদ্র কলসী নিয়ে চলে যমুনার ঘাটে। কিন্তু এওকি সম্ভব? একটা আধটা ছেঁদা থাকলেও বা কথা ছিল, কিন্তু একেবারে সহস্র ছিদ্র কলসী করে সে জল আনবে কী করে? ভরসা মাত্র শ্রীমধুসূদন। তাই যমুনার ঘাটে বসে আকুল আবেগের সঙ্গে গান ধরে সে :—

আমি রইশ্যা রইলাম
যমুনার কিনারে, কানাইরে।
পার কর অবলা রাধারে॥
আমি ছিদ্র কলসী নিয়া আইলাম
তোমারই ভরসাতে।
আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর
বাঁচুক প্রাণনাথে॥

সবই শ্রীকৃষ্ণের লীলা খেলা। জল সত্যই আনা সম্ভব হল ঐ ছিদ্র কলসীতেই। শ্রীকৃষ্ণও সেই জলে স্নান করে আরোগ্য লাভ করলেন। জটিলা কুটিলার মুখে পড়ল চুন কালি, রাধাই প্রমাণিত হ'ল শ্রেষ্ঠ সতী।

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা সমাপ্ত প্রায়। এইবার তা'র বৃন্দাবন ছেড়ে যাবার পালা উপস্থিত। দৈত্যরাজ কংশকে নিধন করবার জন্যই তার মর্ত্যে আগমন, এখন সেই সুযোগ উপস্থিত।

দৈত্যরাজ কংশ, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকেই তার প্রাণ সংহারের চেষ্টা করে

আসছে। কিন্তু তার সকল চেষ্টাই একের পর এক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সে রাজ দরবারে বসে পাত্র মিত্র সহ গভীর চিন্তায় চিন্তিত হয়ে পড়ল কী ভাবে তা'কে শেষ করা যায়। এই রকম এক চরম মুহূর্তে রাজ সভায় দেখা দেয় বিবেক। সে এসেই গান ধরে :—

আমি বলতে পারি ব্রজের সমাচার
তুমি যা ভেবেছ, তাই হয়েছে
চমৎকার ব্যাপার।
আমি বলতে পারি ব্রজের সমাচার ॥
প্রাণের ভয়ে ভীত হয়ে
হৃদয় ভরা হিংসা লয়ে
জ্বাল দেবকীর পুত্র লয়ে
তবু বাঁচিল অষ্টম সন্তান।
তোমারে বধিবে যিনি
গোকুলেতে আছেন তিনি
শুধু প্রাণটুকু নিয়ে তিনি
যাবেন স্বর্গদ্বার।
আমি বলতে পারি ব্রজের সমাচার ॥

কংশ ত' রেগেই আগুন। নিজের অকৃতকার্যের কথা সভাস্থলে প্রকাশ হ'য়ে পড়ায় ধৈর্যচ্যুতি ঘটে আরকি। তক্ষুনি স্থির হয়, নন্দগোপের পুত্র কৃষ্ণকে ডেকে আনবে এক মল্লযুদ্ধে। ঠিক হ'ল ডাকসাইটে মল্লবীর চানুর এবং মুষ্টিক শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। প্রকারান্তরে এই ফাঁকে তারা গোপালের প্রাণ সংহার করবে।

সাব্যস্ত হ'ল, মহা ধার্মিক ঋষি অক্রুর যাবেন শ্রীকৃষ্ণকে আনতে।

সরল সহজ মানুষ অক্রুর এসেছেন শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে যেতে। শ্রীকৃষ্ণ আগ থাকতেই জানতেন ব্যাপারটা। তিনিও সুযোগ খুঁজছিলেন। তাই এই অছিলায় বৃন্দাবন ছেড়ে যাচ্ছেন মথুরার দিকে—চিরদিনের জন্য।

শ্রীকৃষ্ণ অক্রুরের রথে চড়ে রওনা দিলেন মথুরার পথে। খবর বাতাসের আগে প্রচারিত হ'ল বৃন্দাবনের ঘরে ঘরে। দেশ বিদেশের লোক ছুটে এল শ্রীকৃষ্ণকে শেষ বারের মত চোখের দেখা দেখতে।

সব চাইতে করুণ দৃশ্য যখন রাধিকার কাছে নিয়ে পৌছল এই খবর। খবর শুনেই শ্রীরাধিকা বুঝতে পারল—শ্রীকৃষ্ণ তাকে জন্মের মত ছেড়ে চলেছেন। তখনকার তার মনের অবস্থা এবং সমগ্র বৃন্দাবনের অবস্থা কী রকম হয়েছিল তা' উপভোগের বিষয়। পল্লী-কবি তার সহজ সরল ছন্দে শ্রীকৃষ্ণের এই বিদায় দৃশ্য যে ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে—তা' এক মাত্র পদাবলী সাহিত্যের সঙ্গেই তুলনীয় :—

একদিন অক্রুরের রথে চড়ি শ্রীকৃষ্ণ যায় মধুপুরী
বৃন্দাদূতী বলিছে রাধায়।
রাইগো তোমার প্রাণের বন্ধু গোপীশ্বর জগবন্ধু
(আজি) রথে চড়ে গেল মথুরায়॥
পেয়ে খবব কমলিনী সঙ্গে নিয়ে সব গোপিনী
উদয় হল যথা দয়াময়।
গিয়ে রাধিকা কয় বিনয় করি যাও যদি শ্যাম মধুপুবী
(ব্রজ) গোপিনীর কী হবে উপায়॥
সব গোপিনী করজোড়ে বলে সারথি অক্রুরেবে
ব্রজের জীবন নিওনা নিওনা।
মুনি এখানেতে রথে বসি দেখাও মোদের জীবন পাখী
প্রাণের পাখী বিনে প্রাণত বাঁচে না॥
ব্রজে আমবা যত গোপনারী সবাই ঐ পদের ভিখারী
পূজি মোরা ঐ যুগল চরণ।
আমবা ফুল চন্দনে সাজাইব হিয়ার মাঝে বসাইব
দেখব বঁধুর ও চন্দ্র-বদন॥
বলতে বলতে গোপীগণে ধরে রথের চাকা টেনে
রথের অশ্ব ধরে কমলিনী।
বলে বন্ধু তোমার বাঁশীর স্বরে রমণীর মন হরণ করে
বঁধু জন্মের মত বাজাও একবার শুনি॥

সব শেষ। বৃন্দাবন লীলা সমাপ্ত। শ্রীকৃষ্ণ চলে গেলেন মথুরায়। গোপীগণ সহ শ্রীরাধিকা অচৈতন্য হয়ে পড়ল মাটিতে। বনানী শান্ত, আকাশ বাতাস সব ব্যথিত—দুঃখে ভারাক্রান্ত।

এর পরের ঘটনা সকলেরই জানা। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়ে কংশকে নিধন করে সেখানকার রাজা হন। কিন্তু ওদিকে আর গান না থাকায় আমরা কংশ-বধ গীতি-নাট্যের এইখানেই পরিসমাপ্তি করলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"যাবৎস্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে
তাবদ্রামায়ণী কথা লোকেষু প্রাচিরস্যতি।"

—রামায়ণ।

পল্লী-গীতিকায় রামায়ণ পালা গান এবং রাম-যাত্রা আর একটি অদ্ভুত বস্তু। এর ভিতর 'রাম-যাত্রা' ও 'রামলীলা' অনেকটা কৃষ্ণলীলা এবং কৃষ্ণ যাত্রার মতই। কিন্তু রামায়ণ পালাগান তা' নয়। এর ভিতর একজনই সাধারণতঃ থাকে মূল গায়েন, বাদবাকী সবাই তার দোহার এবং বাইন (সঙ্গতকারীগণ)। এই বামায়ণ পালা-গানের মূল গায়ককে অঞ্চল ভেদে কথক ঠাকুর, অধিকারী অনেক কিছুই বলে। এরা গান গায় সাধারণ চলতি বেশভূষায়। 'রামযাত্রা'র মত এদেব নকল সাজ পোষাক লাগেনা। কিন্তু এদের সরস কণ্ঠস্বব ও গীতিতে সে অভাব পূর্ণ হয়ে যায়। আমরা তুলনামূলক ভাবে রামযাত্রা, বামলীলা এবং বামায়ণ পালাগানেব গীতি পাশা পাশি রেখে দেখাবার চেষ্টা করব। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পালাগানের গানগুলিই অধিকতর শ্রুতিমধুর। যদিও রামযাত্রার পদকর্তা এবং অধিকাবীরা অনেক সময় স্বল্প শিক্ষিত হয়ে থাকে কিন্তু পালাগানের কথক ঠাকুররা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরক্ষর। অবশ্য এর মধ্যে সামান্য ব্যতিক্রমও যে না দেখা যায় তা' নয়।

এই পালাগান ও গীতিনাট্য সম্বন্ধে বলতে গেলে সব প্রথম জানিয়ে দেওয়া ভাল যে এই সব পালাগানের রচয়িতারা, রামায়ণের মূল গল্পাংশটুকু কৃত্তিবাসী বামায়ণের কাছ থেকে ধার নিলেও হুবহু তার অনুকরণ কবে নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাত্র গল্পটুকু সম্বল করে তারা সৃষ্টি করে নিয়েছে কতকগুলি পালাব। যেমন:—(১) সীতার বিবাহ, (২) শক্তিশেল, (৩) রাবণ বধ, (৪) পিতা পুত্র এবং (৫) লক্ষ্মণ বর্জন।

এই সমস্ত পালাগান বা যাত্রা যেকোন সময়েই হতে পারে তা' নয়। এই সব পালাগান গাইবারও উপযুক্ত স্থান, কাল, পাত্র ভেদ আছে। যেমন:— (১) বাড়িতে সন্তানাদি হ'লে দেওয়া হয় 'সীতার বিবাহ' অথবা 'পিতা পুত্র' পালা। (২) পরিণত বয়সে কোন লোকের মৃত্যু ঘটলে হয়, 'রাবণ-বধ'

পালা। এবং (৩) অল্পবয়সী কেউ মারা গেলে হয়—'লক্ষ্মণ-বর্জন' অথবা 'শক্তি শেল' পালা।

এই সব পালাগানের রচয়িতাদের রচনায় ভাষার ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। অনেক সময় অনেক মন গড়া কাহিনীও পাওয়া যায়। কিন্তু সে সব আমাদের ছেড়ে দিয়ে দেখতে হবে, তাদের কথায় তাদের মনের ভাব প্রকাশ হয়েছে কতখানি। তাদের সৃষ্টি জনসাধারণ উপলব্ধি করেছে কতটুকু !!

সভা বসেছে। চার দিক লোকে লোকারণ্য। সবে মাত্র যন্ত্রীদল তাদের যন্ত্র থামিয়েছে। মূল গায়ক সভা-বন্দনা করল :—

স্বয়ং বিষ্ণু অবতার
ও তার ধরায় আসা সপ্তম বার
হরিতে ভূ-ভার এবার রাবণারি। [রামযাত্রা]

শুরু হয় পালাগান।

শ্রীরামচন্দ্র বাল্য, কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পা দিয়েছেন। ভাইদের নিয়ে মৃগয়া ক'রে হাসি খেলায় দিন কাটান। এমন সময় বিশ্বামিত্র মুনি এসে হাজির রাজা দশরথের কাছে। মুনি ঋষিরা সব বনে বসে যাগ-যজ্ঞ করেন, রাক্ষসকুল তাতে সৃষ্টি করে বিঘ্ন। বিশ্বামিত্র রাজার কাছে রাম-লক্ষ্মণকে চাইলেন তাদের যজ্ঞ রক্ষা করাবার জন্য :—

বিশ্বামিত্র মুনিবর গাধীর নন্দন
অযোধ্যা নগরীতে এসে দিলেন দরশন!
রাজারে চাহিয়া মুনি লইলেন রাম লক্ষ্মণ
সন্দেহ উদিল মনে জিজ্ঞাসে যখন।
কোন্ পথে যাবে বল দাশরথী শূর
বিনা বাঁধায় সাতদিন, সহজে বিপদ দূর।
এতেক শুনিয়া কুমার উত্তরিলা যবে
বিলম্বে কার্য হইলে বিপদে কে পড়ে?
বচন শুনিয়া মুনির সন্দেহ গেল দূর
রাম-লক্ষ্মণ কভু নহে এই দুই বীর।
ত্বরা করি যায় মুনি ফিরি রাজা পাশে
ক্রোধেতে অধীর হয়ে ভয় দেখায় শাপে।

ক্রোধ প্রশমিতে রাজা পাঠায় সত্বর.
বাম লক্ষ্মণ যুগল আসে অতঃপর।
বাম লক্ষ্মণ দুই ভাই নিয়ে মুনি চলিলেন বনে
নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাপন হ'ল অরণ্যের মাঝে। [পালাগান]

এব পব মুনি দুই ভাইকে নিয়ে এসে হাজির হলেন জনক রাজসভায়।

বাজা জনক প্রচার কবেছেন, যে হরধনুতে জ্যা রোপন করতে পারবে তিনিই সীতাকে লাভ কবতে পারবেন :—

অগুনতি লোকের শোভা ভারত ব্যাপী খ্যাতি,
সভায় আছয়ে দেখ মালা হাতে নন্দিনী।
কিবা শোভা অপরূপ বর্ণিবারে নাহি পাবি
মা কমলা আসিয়াছেন সীতারূপ ধবি।
বীরবর রামচন্দ্র স্মরিয়া শ্রীহরি
মুহূর্ত মধ্যে দেখ তুলিল ধনুকী।
দেখিয়া সভার লোক বিস্ময় মানিলা
বিস্ফারিত নেত্রে চাহে জনকেব বালা।
কবজোড়ে মাল্য হস্তে ডাকিছে নারায়ণে
এতদিনে ভগবান দরশন দিলে।
অভাগী সীতার কথা মনে যদি পড়ে
আমার প্রার্থনায় যেন প্রভু পরীক্ষা উৎড়ে।
জয় জয় বলি রাম ধনুকে জোড়ে তীর
মড্ মড্ শব্দ করি ভাঙ্গিল ধনুক খান
পড়ে যেন মহাবীর।
এইরূপে সভাজন হরষিত মন
সীতার যোগ্য পাত্র পাইল তখন। (রামলীলা]

শ্রীবামচন্দ্র লক্ষ্মণাদি চারভাই ত' জনকের চার মেয়েকে বিয়ে করে অযোধ্যায় নিয়ে এল। কিছুদিন কাটলও ভালই। এল শ্রীরামচন্দ্রের যৌব-রাজ্যে অভিষেকের পালা। কিন্তু বিধি বিপাকে অভিষেকের পূর্বেই তা'কে লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে চ'লে আসতে হ'ল বনবাসে। এখানে এসে হ'ল নূতন ফ্যাসাদ। রাক্ষস-রাজ ক'রল সীতা হরণ। বাধল রাম-রাবণে যুদ্ধ।

যুদ্ধ—ঘোবতব যুদ্ধ। দু'পক্ষেই ঘায়েল হয়েছে যথেষ্ট লোক জন। এইবাব যুদ্ধে এল ইন্দ্রজিৎ। সে ভীষণ যোদ্ধা। স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রকে পর্যন্ত একবাব বেকাযদায় ফেলেছিল সে। শুরু কবল মেঘেব আড়ালে থেকে যুদ্ধ। এক সময় সে হানে শক্তিশেল বাণ লক্ষ্মণেব বক্ষদেশ উদ্দেশ কবে।

লক্ষ্মণ অচৈতন্য। শ্রীবামচন্দ্র বালকেব মত লক্ষ্মণেব অচৈতন্য দেহটা বুকে কবে কান্না শুরু কবে দিয়েছে :—

মাতা গেলে মাতা পাব
কন্যা কোলে কবি,
পিতা গেলে পিতা পাব
পুত্র কোলে কবি।
সীতা গেলে, সীতা পাব
বিবাহ কবিয়া,
(কিন্তু) ভাই গেলে ভাই
আব না আসে ফিবিয়া। [পালাগান]

এব একটু পবে। শ্রীবামচন্দ্র কান্না থামিয়ে লক্ষ্মণেব বুক থেকে বিদ্ধ তীবখানা নিজ শক্তিবলে উপড়ে ফেলে দেবাব চেষ্টা কবেন।

কিন্তু তাতে ফল হ'ল বিপবীত। টানাটানিতে তীবখানা খুলে এল বটে কিন্তু তা' চাব অংশে বিভক্ত হযে পড়ল। এবং সেই এক এক টুকবো থেকে বেবিয়ে এল এক একটি নাবীমূর্তি। নাবীবৃন্দ এইবাব কবজোড়ে শ্রীবামেব চবণ বন্দনা কবে জিজ্ঞাসা কবছে, প্রভু আমাদেব ত' তুললেন, কিন্তু এখন আমবা থাকব কোথায ?

নাবীরূপী বাণদেব কথায় শ্রীরামচন্দ্র উত্তব দিচ্ছেন :—

প্রথম শেল ববে তুমি
পিতৃ শোকেব গায়।
দ্বিতীয় শেল ববে তুমি
পত্নী শোকেব গায॥
তৃতীয় শেল পাবে লোকে
অন্য শোক পাইয়া।
চতুর্থ বিষম শেল ববে তুমি
আমাব বুক জুড়িয়া॥ [পালাগান]

ত্রিভুবন বিজয়ী রাবণ বসে রয়েছে স্বর্ণলঙ্কার স্বর্ণসিংহাসনে। আশে পাশে পাত্র, মিত্র ও আমাত্যের দল। এমন সময়ে দেখা যায় বৈতালিক রাবণের সভা-বন্দনা করছে :—

জয় লঙ্কেশ, সুরা-সুরেশ ভূপ দশানন
শমন দমন সু-জন পালন জন্মগন মন তোষণ।
তব মহিমা ভুবন গাহে
সু-বাস পবন বহে
তব করুণা ধরণী চাহে
তোমার কীর্তি শোভে ভূষণ।
জগদীশ পদে করুণা মাগি
পরমায়ু তব দীর্ঘ লাগি
প্রজার কারণ প্রজানুরাগী
ভণয়ে নলিনীরঞ্জন। [রামযাত্রা]

কিন্তু বৈতালিকের বন্দনা গীতি সেদিন আর জমে না। বৃহস্পতির গণনানুসারে জানা যায় রাবণের মৃত্যুদূত জন্ম গ্রহণ করেছে অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র রূপে।

রাবণ সেদিন থেকেই শুরু করে রামচন্দ্রের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র। একদিন শোনা গেল ভগ্নী সূর্পণখার কাছে, রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে বনে এসেছেন। শুধু তাই নয়, এর উপর সূর্পণখার আবার নাসিকা ছেদন হয়েছে লক্ষ্মণের দ্বারা।

রাবণ ত' তখনই ছুটল সীতাকে হরণ করে নিয়ে আসতে। এমন সময় আসরে দেখা দেয় বিবেক। সে জানত রাবণের পাপের ভরাডুবি হতে আর বেশী বাকী নেই। তাই সে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে দিচ্ছে :—

মরবি কেন ওরে পাগল
পাগলামি কেন তোর?
সোণার পুরী করলি শ্মশান
তবুও কাটেনি ঘোর?
করিশ যদি বাঁচতে সাধ
রামের সাথে মিটাও বিবাদ

নইলে যে তোর ঘোর সান্নিপাত
রন্ধ্রগত শনি তোর।
রম্ভা হরণ করলি যেদিন
দিয়েছে শাপ কুবের সেদিন
মাথা কাটা গেছে সেদিন
কাটিতে হবে না তোর। [রামযাত্রা]

কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'। রাবণও তাই ওসব নিষেধ অগ্রাহ্য করেই হরণ করে নিয়ে এল সীতাকে। বিবেক তখনও বলে চলেছে :—

তোর স্বপনের ঘর, স্বপনেরই বাড়ি
স্বপনেতে আজ ভাসিল।
যা'র শক্তি পেয়ে তুই হলি শক্তিমান
সেই শক্তি তোর আজ ফুরাল।
শক্তি হ'তে তুই শক্তি পেয়ে যত
জ্ঞান করেছিশ ধরা সরার মত
শক্তি ধ'রে তোর শক্তি হ'ল হত
হাট ভেঙ্গে মাঠ করিলি। [রামলীলা]

সসাগরা বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিজয়ী বীর রাবণ হরণ করে নিয়ে এল সীতাকে। কিন্তু রাবণ রাক্ষস হলেও তার মর্যাদা বোধ আছে। তাই সীতাকে হরণ করে নিয়ে এসেই সঙ্গে সঙ্গে তা'কে পাটরাণী করে না বসিয়ে কিছুদিনের জন্য রেখে দিল অশোক কাননে—সহস্র রাক্ষসী পাহাড়াওয়ালীদের মাঝখানে।

নিবিড় বন। চারদিকেই শত্রু। কিন্তু বিধাতার আশীর্বাদের মত এরই মধ্যে জুটে যায় বিভীষণ পত্নী সরমাকে। অন্ধকার দিনগুলির মধ্যে সে যেন একটা হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানি! তাই সীতাকে বলতে শোনা যায় তার কাছে নিজের মর্ম ব্যথা :— আমি বলব কি সরমে, যে দুঃখ মরমে

আমার করমে যে, যেন কি বা হয়।
শুন প্রাণ সই, দুঃখে তোরে কই
আজন্মই আমার কেঁদে কেঁদে যায়॥
যেদিন আমি এলাম অযোধ্যায়
পলে পলে ভাগ্য কত বিপর্যয়॥

নিশি পোহাইলে, প্রভু রাজা হবে বলে
অধিবাস করি আসিনু লঙ্কায়।
যে চরণ লাগি, ধ্যানে মুনিগণ
সে চরণের দাসী কেঁদে ফেরে বন ॥
দেহি সে চরণ তরী, ওহে রাম রঘুবর।
তুমি বঞ্চিত না করো দীনে
আমি যে কিঙ্কর ॥ [রামযাত্রা]

সরমা সম ব্যথায় ব্যথী। তাই সেও উত্তর দিচ্ছে :—

দুঃখ নিশা প্রায় তব হবে অবসান!
দুঃখ শোক জন্যই যত সুখের নিদান ॥
সুখ দুঃখ চক্রবৎ করিছে ভ্রমণ।
কেবা পারে তাহা এই ধরামাঝে
করিতে লঙ্ঘন ॥
যা' হবার তা' হবেই হবে—
এ যে সেই বিধির বিধান ॥ [রামযাত্রা]

সরমা চলে যায়। আঁধার ঘেরা আকাশের বুকে স্নিগ্ধ তারার মত জ্বল জ্বল করে ওঠে অশোক কাননে সীতা। পতিপ্রাণাকে তাই বিলাপের সুরে গাইতে শুনি :—

আর কত দিন রব একা
বহি বিরহের ভার।
তোমার চরণ বিনা
নাহি গতি এ অবলার ॥
পতি প্রেমে হয়ে বঞ্চিত
কাঁদে প্রাণ অবিরত।
কবে তব দেখা পাব
ভাবি বসে অনিবার।
না জানি কি পাপের ফলে
ভুঞ্জি দুঃখ রক্ষপুরে।

বিনাশী রাবণে এবে
এ দাসীরে কর উদ্ধার॥ [রামযাত্রা]

একদিকে এই রকম অবস্থা অন্যদিকে রাম লক্ষ্মণ কুটীরে ফিরে এসে দেখে সীতা নেই। ডাকাডাকি করেও তা'র কোন হদিস পাওয়া যায় না। শ্রীরামচন্দ্র তখন বিলাপের সুরে বলতে থাকেন :—

কৈ সীতা, কৈ সীতা লক্ষ্মণ ভাইরে,
বুঝিনু সার, সীতা আর এজগতে নাইরে॥
দেশেতে মরিল পিতা
বনেতে হারালাম সীতা
ও ভাই লক্ষ্মণরে।
ওই যে জ্বলিছে চিতা, কি দিয়া নিভাইবে॥
বলরে বনের তরুলতা
সীতা আমার গেল কোথা।
কে বোঝে মোর প্রাণের ব্যাথা
যে বোঝে সে নাইরে॥
কী ক্ষণে আসিলাম বনে
হারালাম ধনে প্রাণে
ও ভাই লক্ষ্মণরে।
মরিব ডুবে জীবনে
জীবনে আর কাজ নাইরে॥
পেয়ে বুঝি সীতা পদ্মমুখী
পদ্মালয়ে রেখেছে লুকায়ে॥
পদ্মবনে অতি সঙ্গোপনে
পঞ্চবটী পুণ্য ভূমি জানি
গড়িনু আবাস মন সুখে
তাহে মোর বিফল ফলিল॥ [রামলীলা]

এইবার রাম-রাবণে যুদ্ধ।

একদিকে লঙ্কাধিপতি রাবণের অসংখ্য সৈন্য—দেব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ সবাই তার সৈন্য। অন্যদিকে ভিখারী রাঘব, জটা বল্কলধারী রামচন্দ্র, সুগ্রীবের সৈন্য

সামন্ত নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন কনক-লঙ্কায়। রাবণ এইবার যুদ্ধে পাঠাল মামা কালনিমিকে।

মামা কালনির্মি সংবাদ পেয়ে খুসীতে আটখানা। তখনই মনে মনে সুর ভাঁজে আর মতলব ঠিক করে, যুদ্ধে জিতলে সোনার লঙ্কার আধা আধি ত' পাবেই। এখন কোন্ দিকটা সে নেবে এই হ'ল সমস্যা। তার ওপর উপরি পাওনা আছে—ভাগ্নেবৌ মন্দোদরী (অবশ্য যদি ভাগ্নে রাবণ নিহত হয় তবে)।

তাই খুসির আমেজে তাকে গাইতে শোনা যায় ঃ—

বাহাবা হায়রে মজা
এবার আমি রাজা হব।
বসব রাজ-সিংহাসনে
প্রজাগণে সাজা দিব।
ভাগ্নেবৌ মন্দোদরী
সম্পর্কেতে মান্য করি
লজ্জা সরম ত্যাগ করি
বাম ভাগেতে বসাইব। [রামযাত্রা]

এর পরই দেখা যায় তা'কে যুদ্ধে যেতে। যুদ্ধের ফলাফল আমাদের জানা খবর। কিন্তু তার সেই যাত্রাকালীন মনোভাবকে উপলক্ষ করে পল্লীকবি বলছে ঃ—

কত রঙ্গে বি-রঙ্গে নাচে
কালনিমি চলিল রঙ্গে।

এদিকে যুদ্ধের তুমুল কোলাহল আর ওদিকে জনম দুঃখিনী সীতা অশোক বনে বসে কাঁদছেন ঃ—

কোথা প্রভু দয়াময় হরি
রক্ষ অবলারে।
তুমি বিনা কে রাখিবে মোরে
এই রক্ষপুরে॥
পতি প্রেমে হয়ে মগ্ন
ধরে আছি প্রাণ মম

বুঝি যাবে এ জীবন আজি
দশানন করে॥
তুমি হে আমার গতি
তোমা বিনা নাহি গতি
তোমার দয়া পদে স্মরি
আছি নির্ভয় অন্তরে॥ [রামলীলা)

কিন্তু রাবণের তখন ওসব দিকে নজর দেবার ফুরসুৎ নেই। যুদ্ধে একে একে মামা কালনিমি, ভাই কুম্ভকর্ণ, ছেলে বাসব-বিজয়ী ইন্দ্রজিৎও পরাজিত হয়েছে। সুতরাং এইবার তার নিজেরই যুদ্ধে যাওয়া প্রয়োজন। রাম-রাবণেব শেষ যুদ্ধ।

রাবণ আজ রণ সজ্জায় সজ্জিত। দশ মাথা কুড়ি হাত নিয়ে চলেছে যুদ্ধে, কিন্তু যাত্রা করে সে যে মুহূর্তে রথে পা দিতে গিয়েছে, ঠিক সেই সময় চারদিকে ঘিরে আসে সব অমঙ্গলের চিহ্ন :—

যাত্রা করে যখন রাবণ রথে দিল পা।
চতুর্দিকে অমঙ্গল ঘণায় আসে তা।
দক্ষিণেতে শৃগাল চলে, বামে কালো সাপ,
লাখে লাখে শকুনি গৃধিনী আর চূড়ায় বসে কালো পেঁচা
মুকুট খসিয়া পড়ে, হোঁচট খাইয়া পড়ে রথেতে উঠিতে
দশমুণ্ড কুড়ি হস্ত কাঁপে থরে থবে!
না বুঝিয়া তাই বুঝি চাহে চারি দিকে॥ [পালাগান]

এমন কি রাণী মন্দোদরী পর্যন্ত রাবণকে রণে যেতে নিষেধ করে :—

যেওনা যেওনা রাজা
বিদ্রোহী হইতে রণে।
শুকাইবে সুখ-সাগর
হারা হইবে ধনে প্রাণে।
হারাইবে শত পুত্র সওয়া লক্ষ নাতি
কেহনা রহিবে তোমার বংশে দিতে বাতি।
যত সধবা অধবা বিধবা সতী
শ্মশানেতে যাবে গড়াগড়ি। [রামযাত্রা]

কিন্তু রাবণ তা' শোনেনি। হ'ল রামের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ। যুদ্ধে হ'ত হল রাবণ। পালা শেষ। রাম-যাত্রার শ্রুতিধর শেষ গান ধরে :—

কেটে গেল দুঃখ নিশি
উদিল ঐ দিনমণি
এ মিলন পরশনে
দয়ালের শিরোমণি।
জন্মান্তরে সঞ্চিত ছিল তব যে কিঞ্চিত
না হবে তাহে বঞ্চিত, দুয়ারে তোর পরশমণি
ভবের আরাধ্য যাহা, তব ভাগ্যে আজি তাহা
এ সৌভাগ্য মনে তাহা, পরাজিত যোগী মুনি।

[রামযাত্রা]

রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে এসেছেন। ধন্য অযোধ্যা নগরী, ধন্য তার প্রজাবর্গ। অভিষেকের সময় আগত। কিন্তু হঠাৎ কুৎসা উঠল প্রজাদের ভিতর থেকে—সীতার চরিত্র সম্বন্ধে।

প্রজানুরঞ্জন রামচন্দ্র সীতাকে পাঠালেন বনে। সীতা আস্তে আস্তে সবই বুঝতে পারে। প্রজার জন্যই রাজা—প্রজার সুখ, প্রজার ইচ্ছাই রাজার ইচ্ছা। তাই লক্ষ্মণকে আবার সীতাকে রেখে আসতে হয় বাল্মিকী তপোবনে।

লক্ষ্মণ চলে গেছে। সীতা নিজের ভাগ্যদোষের কথা ভেবে বিলাপ শুরু করেছে :—

(ও) সীতা বলেরে বলেরে বলে
(ও) গুণের দেওর লক্ষ্মণরে
তাহার ত' নাই কোন দায়।
কোন অপরাধে আমায় দিলি বনেতে
বনে দিলেরে দিলেরে দিলে
সেও ছিল ভালো
পঞ্চ মাসের অন্তরাবতী
কী হবে উপায় লো ?
নারী অবলা সরলা,
এ দুঃখেতে প্রাণ বাঁচেনা

দুঃখের সময় যে ডাল ধরি
ভাঙ্গে সেই ডাল।
জন্মে মরিতাম, মরিতাম
সেও ছিল ভালো
দীনহীন পতি পেয়ে
কাঁদিতে জনম গেল। [পালাগান]

সীতা বাল্মিকী আশ্রমে আছে লব কুশ দুই ছেলে নিয়ে। তারা বনের ঋষি কুমারদের সঙ্গে দিন কাটায় আর মার কাছে শোনে রাম রাজার গল্প।

এদিকে শ্রীরামচন্দ্র করেন অশ্বমেধ যজ্ঞের ব্যবস্থা। তাই তা'র ঘোড়া ছুটল দেশ হ'তে দেশান্তরে। অপরাজেয় অশ্ব ছুটে চলে রাজত্বের পর রাজত্ব পার হয়ে। শেষটায় এসে পৌছয় বাল্মিকী তপোবনে। এই খানেই সে বন্দী হয় লব কুশের হাতে।

খবর পৌছয় অযোধ্যায়। আসে সৈন্য সামন্ত, লোকজন। চলে যুদ্ধ কিছুক্ষণ। কিন্তু সবই বিফলে যায়। রামচন্দ্রের সব জাঁদরেল সৈন্য সামন্ত এমন কি ভরত শত্রুঘ্ন পর্যন্ত শেষ হয়েছে যুদ্ধে। এইবার যুদ্ধে যাত্রা করেন স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র।

শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধের উদ্যোগ আয়োজন করছেন। বোধ হয় রাবণ বধের জন্যও এতবড আয়োজন করেছিলেন কিনা (রামায়ণের কথক ঠাকুরের গল্প অনুসারে) সন্দেহ। দেশ বিদেশে চর পাঠান হয় সৈন্য সংগ্রহের জন্য। শ্রীরামচন্দ্রের এই সময় মনে পড়ে অনার্য-রাজ তা'র বন্ধু গোবর্ধনের কথা।

শ্রীরামচন্দ্রের বিপদ এবং তা'র কাজে নিজে নিযুক্ত হয়ে কিছু করতে পারবে এই চিন্তাতেই রাজা গোবর্ধন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। শুধু কি রাজা গোবর্ধন ? সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হয়ে নিল তার মা, বৌ ও বোনেরাও :—

শ্রীরামের বার্তা পাইয়া, গোবর্ধন চলে ধাইয়া,
সৈন্য সামন্ত সব পাঠাইল ডাকিয়া।
(তখন) নাচে গোদা, নাচে গুদি, নাচে গোদার মা,
(আবার) গোদার মাইয়্যা নাচে বুঝি হাতে তালি দিয়া।
সাজিল, সাজিল সৈন্য, বাজে ঢাক ঢোল
জগঝম্প বাজে সঙ্গে সেতারা সানাই খোল। [পালাগান]

এই ভাবে রাজা গোবর্ধন ত' তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে রওনা দেয় যুদ্ধ করতে। পথিমধ্যে পড়ে এক নদী। বীরবর হনুমান তখন আর কি করে, নিজের লেজ বাড়িয়ে তৈরী করে এক বিশাল সেতু। কপি সেনার দল গেল তার উপয় দিয়ে। রাজা গোবর্ধন কিন্তু শ্রীহরির নাম স্মরণ করে সঙ্গেসঙ্গে বাড়িয়ে দিল তা'র গোদ। গোদার গোদ শ্রীহরির মহিমায় যোজন ব্যাপী বিস্তৃত হয়ে পড়ায় গোবর্ধনের সৈন্য সামন্তরাও সেই গোদ সেতুর উপর দিয়ে পার হয়ে যেতে শুরু করল :—

এত বলি গোদা তখন গোদ বাড়াইল
হবি হরি বলি সবে নদী পার হইল ॥
জয় রাম জয় রাম বলি গোদা উপনীত হইল
গোদারে হেরিয়া রাম পুলকিত হইল। [পালাগান]

এরপর শুরু হ'ল যুদ্ধ। দুই পক্ষই সমান প্রতিদ্বন্দী। বিজয় লক্ষ্মীকে যেন লবেব গলায়ই মালা পডাতে দেখা যাচ্ছে। একদিকে রাম ছাডে শব্দ-ভেদী-বাণ। কুশী সে বাণকে কেটে করে খণ্ড বিখণ্ড। অপর দিকে এই সুযোগে লব কবে রামকে তাডা। কুশী তখন :—

পাশুপাত বাণ কুশী জুডিল ধনুকে
বাণ মুখে অগ্নি উঠে ঝলকে ঝলকে।
বাণ দেখে লক্ষ্মণ বীরের ভয়ে ওডে প্রাণ
ভাবে এই বাণেতে এই রণেতে যাবে মম প্রাণ ॥
[পালাগান]

শেষ হয় যুদ্ধ। ত্রিভুবন বিজয়ী শ্রীবামচন্দ্রের নিজের ছেলের কাছে পরাজয়— এবং মৃত্যু পর্যন্ত। অবশ্য পরে বাল্মিকীর দয়ায় আবার প্রাণ ফিরে পান শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও অপর ভ্রাতৃদ্বয়। তবে সে ঘটনা এর মধ্যে না থাকায় আমরা সে বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করতে চাই না। রামায়ণ গীতি এবং রামলীলার কথাও তাই আমরা এইখানেই সমাপ্ত করলুম।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"গুণের সাগরী প্রিয়া শাহের কুমারী।
সুখে নিদ্রা যাও তব গৃহে হৈল চুরি ॥

*　　*　　*

বিষে মোর প্রাণ যায় না দেখ উঠিয়া।
থাকিতে না দেখ শেষে না পাবে কাঁদিয়া ॥"

—'বাইশ কবি মনসা মঙ্গল'

পূর্ববঙ্গ পল্লী-গীতিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ হ'ল ভাসান বা বয়ানী গান।

ভাসান গান মূলতঃ চাঁদ সদাগর তথা বেউলা-লক্ষীন্দরের কাহিনী ও মনসা দেবীর মাহাত্ম্য নিয়েই রচিত।

পূর্ববঙ্গ স্বর্প বহুল দেশ। স্বর্প-দেবী মনসার পুজোর ঘটাও তাই এখানে একটু বেশী রকমের। শ্রাবণ মাসের পহেলা থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতি ঘরে দেখা যায় সুর করে মনসা-মঙ্গলের পুঁথি পড়তে, শ্রাবণ সংক্রান্তিতে করে পুজো—কেউবা ঘটে, কেউবা মূর্তিতে। এরজন্য কুমোরদের এক বিশিষ্ট ধরনের ঘট বানাতে হয়—একে বলে 'মনসা ঘট'। ঘটের মূর্তিটাও একটু অদ্ভূত ধরনের। এর দু'পাশে থাকে দু'টো সাপ, মাঝখানটা মনসা দেবীর মুখাবয়ব।

সাধারণতঃ কোন লোক মনসার কাছে কিছু মানত করে সফলকাম হ'লে তার বাড়িতে আয়োজন করে রয়ানী বা ভাসান গানের। পশ্চিমবঙ্গে যাকে ভাসান-গান বলে পূর্ববঙ্গে তাকেই বলে রয়ানী। সুতরাং এরা এক এবং অভিন্ন। রয়ানীর বৈশিষ্ট্য হ'ল রামায়নী গান বা কৃষ্ণ যাত্রার মত এর পৃথক পৃথক পালা নেই। এ গানের আসর যেখানেই বসে সেখানেই এর আদ্যপান্ত শেষও হয়। কোনও কোনও জায়গায় সাত, পনের বা একমাস পর্যন্ত এ গান হয়ে থাকে। তবে এ একটু খরচা বহুল, তাই এর আবির্ভাবও খুব ঘন ঘন দেখা যায় না।

মনে করুন রয়ানী গানের আসর বসেছে। বিরাট মণ্ডপ। যাদের স্থায়ী মণ্ডপ নেই তারা অন্ততঃ এই রয়ানীর জন্য সাময়িক ভাবে তৈরী করায় এক অস্থায়ী মণ্ডপ। তার ভিতর বেশ মিছিল করে সাজান রয়েছে বিভিন্ন সাজ

পোশাকের পুতুল। কোনটি বা চাঁদ সদাগর, লক্ষীন্দর, বেউলা, ধন্বন্তরী-রোঝা, নেতা-ধোপানী, হর-পার্বতী। মাঝখানে রয়েছে শ্রীমনসার বিরাট মূর্তি। মূল গায়ক আসরে দাঁড়িয়ে চামর ব্যজন করতে করতে শুরু করে সভা বন্দনা গাইতে :—

ওগো আমার মা, বন্দিলাম, বন্দিলাম, চরণ তোমার
স্বর্গ হইতে বন্দিলাম দেবের প্রধান
সীমান্ত হইতে বন্দিলাম তোমায়
ওগো তোমার ও-চরণেতে মতি পাইলেন
আমি 'নারায়ণ' যেন তব চরণে পাই স্থান।
তবে সে বলিতে পারি মহিমা তোমার,
সরস্বতী দেবী তোমায় করিগো বন্দনা
যাহার প্রসাদে পাব দুঃখ হরির মন্ত্র
তাহার প্রসাদে জ্ঞান হইল আমার।
শিক্ষা-গুরুর চরণ বন্দি শিক্ষা-গুরুর পায়
ঐ যা'র দয়াতে আমার সকল শিক্ষা হয়।
পূর্বে বন্দি ভানুরে পশ্চিমেতে চাঁদ
উত্তরে বন্দি হিমালয় দক্ষিণে সাগর
স্বর্গ মর্ত্য বন্দি আমি বন্দিগো পাতাল।

এরপর শুরু হয় পদ্মার (মনসা) বাল্যলীলা বর্ণন :—

আড়াই বৎসরের পদ্মা হইল যখন
পরিবারে দিল তারে সুবর্ণ ভূষণ
পদ্ম-পুরাণ শাস্ত্র কহিবারে
লিখিয়া পড়িয়া পদ্মা উত্তম হইল
এইমাত্র পদ্মাবতী বাড়িতে লাগিল।
একদিন আচম্বিত হাত-খড়ি পড়িল ভূমেতে
পদ্মা বলে মা কুড়াইয়া দাও
মনসা বচনে বলে সবে রুষ্ট হইয়া,
'মাতা পিতা নাহি তোমার জড়ুয়া নন্দিনী
কেবা তুলিয়া দিবে তোমার হাতের খড়ি'।

শুরু হয় পদ্মার কান্না এবং নাগ-মাতা বাসুকির কাছে গিয়ে নিজের জন্ম-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা :—

ও দয়াল রে জাড়ুয়া বলিয়া পদ্মায় দিল গালি
ও তায় বিষহরি দেবী তখন কান্দিতে লাগিল।
কান্দিতে কান্দিতে গেল বাসুকির স্থানে
দেবী আবার সতী কোলে লইল সত্বরে।

এবং :—

ও বলরে পিতা আমার কোন্ জন
মাতা আমার কে
ও গো এই সকল বৃত্তান্ত ভাই
আমায় বলে দে।
শুনিয়া বাসুকি তবে দিলেন উত্তর
ওগো তোমার পিতা তপ করে কালিয়া ভবন।
যদি ভাই দেহ মোরে একটু অনুমতি
দেখ গিয়ে আছে আমার পিতা শূলপাণি।
বাসুকি আনিয়ে তখন ব্রহ্মা রক্ষক
আনিয়া দিল পদ্মার সমাজ।
উনকোটী নাগ পদ্মা করে করি ধারণ
পাতালেতে পদ্মাবতী করিল শয়ন।
গুপ্ত বেসে বইল গিয়ে সে শিবের পদ্ম বনে
পুষ্প তুলিতে এলেন দেব ত্রিলোচনে।

পদ্মার ইচ্ছা, শিব যদি দয়া করে তাকে দেব সমাজে পরিচয় করিয়ে দেয় তা' হলে হয়ত শিবের দয়ায় পৃথিবীতে তার পুজোটাও প্রচারিত হ'তে পারে। এই উদ্দেশ্যে সে প্রস্তুত হয়ে রইল মহাদেবের সঙ্গে দেখা করবার জন্য :—

পদ্মবনে দেখে শিব নাগের প্রচার
নাগ দেখে পশুপতি কম্পিত অন্তর,
ডাক দিয়া আনিল শিব গড়ুর মহাবীর
শিবের আদেশে হইল গড়ুর বাহির।

গড়ুর দেখে যত নাগের প্রচার
একে একে যত পারে তখন করিল আহার।
কত নাগ খাইল, কত নামিল পাতাল
দেখিয়া পদ্মাবতীর ভাবনা জন্মাইল
সহিতে না পারে পদ্মা নাগের দুর্দশা
পুষ্পবনে দেখা দিল দেবী পদ্মাবতী
দেবী পদ্মা দেখে মহাদেব মহা রাগে
বলে, কোথাকার কন্যা বেটি, কোথা তোর ঘর
প্রাণ যদি না লই তবে পরিচয় দে।

এইবার পদ্মার নিকট শিবের পরিচয় প্রার্থনা।ঃ—

দেও পরিচয়, কি তব যে নাম, সুবদনী রমা গো
শুন রমা গো—কেন যে পদ্মার স্থির
তুমি কি একাকিনী কি কর বসে উহার বৃত্তান্ত কী?
শুন রমা গো এ বনে অসুরে চড়ে
তুমি পরমা সুন্দরী—নাগিনী লক্ষণ রাখি
তোমার এ বাঁমাকি (বাম আঁখি) ভয় করে।
সুরমা মোরে দেওগো পরিচয়
মোরে কহগো রমা গো
তুমি কাহার নন্দিনী
তুমি কেমনে আসিলে হেথায়
কেবা তোমার বাপ মা
স্বরূপ কহ গো—।
এইত' নির্জন স্থানে—তোমাকে পেলে
আরাধনা তবে তো'
তোমাকে নিয়ে করিতে অপেক্ষা
তুমি কারে রাখ যৌবনে
আলিঙ্গন দেও আমারে
এবে তবে শিবের প্রাণ রক্ষা কর।

শিবের কথায় মনসা উত্তর দিচ্ছে :—

পিতঃ কেন চিন্তা কর তুমি
তোমার দুহিতা আমি
স্থির কর চঞ্চল মন।
বাপুহে, মহাদেব আমার বাপ,
চন্দ্র থুইল পদ্মপাতি
পদ্ম পাত গলে গিয়ে নামিল পাতালে
পাতালে দুঃর্ম আর বাসুকি পাইয়া
আমায় করল জীবন সঞ্চার।

পদ্মাবতীর কথায় শিব তখন :—

তখন শুনিয়া এ সব কথা
শূলপাণি লজ্জা পাইয়া
মুখেতে উত্তর কিছু নাহি আসে।
কী মতে আমার কন্যা হও তুমি
তার দেহ পরিচয়।
পদ্মা বলে একটু কাল অপেক্ষা কর
দেই পরিচয়।
আপনার বেসে পদ্মা জিনে ত্রিপুরারী
যেখানে যে শোভে শাপ
পরিল বিষহরি।
আড়াইল বেগা কাচুলি
ভালে সুচিল কাল রেখা
আরও নাগের তার খাড়ু আর শঙ্খ
নাগের মালা আর হাতে বাজু বাঁধে
আরও লবঙ্গের নিচে পদ্মা নাগকে পরে
কাল নাগিনীকে পদ্মা খোঁপার নিচে ভরে।
উদয় নাগের খাড়ু দেখিতে চমৎকার
অজগর নাগ চক্ষে দেয় চকমকি
তক্ষক নাগ দিয়া পদ্মা পরেছেন চাকি।

পায়ের নামালি ভাল, সাজিলেক ভাল
ওপরে মল খারুরে শোভিল জল রেখা
অনন্ত তক্ষক পদ্মার মাথার মাঝে ফুলা ।
আচম্বিতে হইল পদ্মা ভয়ানক
নাগ আভরণ পরিয়া পদ্মা
দাঁড়াইল গিয়া শিবের সম্মুখে ।
দেখিয়া তখন শিব হইল শিব
সহিতে না পারে শিব পডিল ঢলিয়া
কান্দিতে লাগিল পদ্মা কিনারা না পাইয়া ।

শিব মূর্ছাভঙ্গের পর উত্তর দিচ্ছেন :—

শিব বলে পদ্মাবতী তোমার বড তেজ
আমি না সহিতে পারি তোমার বেশের তেজ
আমি হইয়া তোমার তেজে পেলেম অপমান
আর কেহ হইলে আজি ঘটিত পরমাদ ।
শিব বলে পদ্মাবতী শোন দিয়া মন
পাতালেতে শীঘ্র তুমি করহ গমন ।

পদ্মা উত্তর দিচ্ছে :—

পদ্মা বলে পিতা আমি বলিহে তোমায়
দেখিলাম পিতা, এমন দেখিব আমি মায় ।

শিব কিন্তু স্ত্রী পার্বতীকে চেনেন, তাই উত্তর দিচ্ছেন :—

অন্ন বিনে শুকায় চর্ম, বস্ত্র বিনে ব্যাঘ্র চর্ম
স্থান বিনে শ্মশানেতে পড়ে থাকি
ভস্ম কপাল, অশ্ব নাই, বলদ বাহনে যাই
তাই সদা ভস্ম মাখি ।
আমার গুণের নাই অবধি
ভিক্ষা করি দিনবধি
তারা উঠলে তাড়া দেয় ।
কত গুণের ভার্যা চণ্ডী
ছুঁয়ে ফেলে কিলেন নিত্যি

ঘরে গেলে পদ্মাবতী
আমার এক তিলও নাই শান্তি।
চণ্ডীর ব্যবহারে আমার
শরীর হইল অন্ত
দেখ গঙ্গায় স্বর্গ থেকে
যখন ওঠে ডাকি
চণ্ডী তাহার সঙ্গে বিবাদ করে থাকি থাকি।

কিন্তু মনসা নাছোড বান্দা। সে ওসব কথায় না ভুলে উত্তর দিচ্ছে :—

'সতীনে সতীনে বাদ কলিতে যোগায়
আমার সঙ্গে বিবাদ কেন করবেন সৎমায়।
আমি পারি সব কাজ কর্ম করব সব সময়
কন্যাভাবে মায় আমার করবেন প্রতিপালন।'
তখন শিব বলে, ভাল যুক্তি করিছে পদ্মায়,
এত বলি কোলের রথে তুলে নেন পদ্মায়।
কিন্তু পদ্মাকে রাখিবে কোথায় চিন্তে মহেশ্বর
পদ্মাকে রাখিতে তাই সাজাইল এক ঘর
সাজিতে রাখিল গিয়া মণ্ডপের চালে
তপস্যা করিতে গেল সমুদ্রের কূলে।

শিব ত' মনসাকে ফুলের সাজির মধ্যে রেখে চলে গেলেন সমুদ্রের পারে। এদিকে আবির্ভাব ঘটল আমাদের নারদ মুনির। তাঁব কাজই হ'ল বিবাদ বাধান। সুতরাং সে বিবাদ বাধাবার এমন সুবর্ণ সুযোগটি আর কিছুতেই ছাডতে রাজী নয়। তাই চণ্ডীর কাছে গিয়ে কী ভাবে ব্যাপারটা ফলাও করে বলতে শুরু করল এইবার তা' দেখা যাবে :—

তথা হতে নারদ মুনি করিল গমন
চণ্ডীর নিকটে গিয়ে দিল দরশন।
নারদে বলে শুন মামী, শুন গো বচন,
তাহার রূপে গুণে মামী তুমি লাগ কিসে
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সে নিতে পারে বিষে।

এমন নাগিনী কন্যা তোমারও সতীন
আমি যে নারদ আমার চক্ষে আসে বারি
কার্তিক গণেশ ছাড়ি মামী যাওগো বাপের বাড়ি
সতীন ও-মেয়ে তোমার হবে খুবই শীঘ্রি।

নাবদের অস্ত্রোপচার সার্থক। চণ্ডীত' চটেই লাল। এইবার তার হাতে মনসাব কী দুর্দশা ঘটে দেখা যাক ঃ—

ক্রোধিত হইয়া চণ্ডী যখন চাবিদিকে চায়
বড় একখানা ফুলের সাজি দেখিবারে পায়।
ক্রমে ক্রমে সব পদ্ম পুষ্প চণ্ডী ফেলে বিছাইয়া
ক্রমে ক্রমে চণ্ডী দেবী সকল দেখে চাইয়া।
মায়া করি পদ্মাবতী লুকাইল কালি ঝুলে
চক্ষে দেখে ভবানী তার ধরিলেন চুলে।
কোথাকার কন্যা ওগো মূর্তি গুঁজে কে
তোমার প্রাণ যদি না খাই—পরিচয় দে।
তক্ষণ (তখন) কণ্ঠেতে ধবিয়া তাবে মাবিল ঠোক্কর
পদ্মা বলে সবাই আমার প্রাণ রক্ষা কব।
আজ তুমি কেন শুননা ওগো জননী
কেন কব যাতনা আমি বড অনাথা
কন্যার ডাক কেন তুমি কানে শুননা।
সতীন জ্ঞানে মারে চণ্ডী তখন ধবে দুই কান
পদ্মা বলে মাগো আমার গেল বুঝি প্রাণ।
পদ্মা বলে আমায় না মারিও আব
তুমি আমার মাতা শিব জনক আমাব।
দুঃখ পেয়ে পদ্মা তখন চণ্ডীর পদ ধরে
ওগো তথাচ পাপিষ্ঠা (?) চণ্ডী পদ্মাকে না ছাডে।
পদ্মার বাম চক্ষু নষ্ট হইল চণ্ডীর নখে।

চণ্ডীর প্রহারের চোটে পদ্মার অবস্থা কী রকম হয়েছে, বয়াণীকারের মুখেই শোনা যাক ঃ—

ওগো বাপু সরল মেয়ে চক্ষু ধরে হাতে
বলে এমন কালে কোথা রইলে
মোর পিতা মৃত্যুঞ্জয়
চণ্ডীর প্রহারে দেখ আমার প্রাণ বুঝি যায়।
চণ্ডী কষ্টেতে পড়িয়া পদ্মাকে মারিল বিস্তর
পদ্মা বলে সবাই আমার প্রাণ রক্ষা কর।
পদ্মা বলে মাগো তোমার কেন মনে রাগ
ওগো পদ্মবনে জন্ম আমার শিব আমার বাপ।
ওগো বিশ্বাস না করে চণ্ডী মনসাব কথায়
ওগো প্রহারে কাতর হল শ্রীমনসায়।
ওগো যোগের তুল্য ফল নাই আর ভক্তির তুল্য মান
ব্রাহ্মণ তুল্য জাতি নাই আর গঙ্গা তুল্য জল
কার্তিক তুল্য কায়া নাই আর বটের তুল্য ছায়া
আমন তুল্য ধান্য নাই আর সখী তুল্য মায়া।
পদ্মার দুর্গতি দেখেন গঙ্গা বিস্তর
সহিতে না পেরে তখন গেল ঘরের ভিতর।
গঙ্গাকে দেখিয়া দূরে তখন বলে মনসা
কী কাবণে গৃহমধ্যে লুকাল সৎমা।
আমার মরণে সবাই দেখ তোমার নাহি ডর
উচিৎ কথা ব'লে আমার প্রাণ রক্ষা কর।
শোন মাগো গঙ্গা মাই আমার প্রাণ রাখগো
পরিচয় দিয়ে মাগো তুমি বাহির কইরা দাও।
আমার খণ্ড খণ্ড হল প্রাণ, বুক মাঝে সহিতে না পারি।
চণ্ডী ধেয়ে এসে চুল ধরে, ওগো, শুধু লাথি কিল মারে
প্রাণ আমার বুঝি বাহির হয়।
চণ্ডী মোরে মারে দলন করি
মনসা বলে বিস্ময়েতে আমি
এত দুঃখ সহিতে না পারি
তোমরা সবাই আমার প্রাণরক্ষা কর।

মনসার নির্যাতন দেখে গঙ্গার দয়া হয়। তাই :—

ঘর হইতে বাহির হইল গঙ্গা ভাগীরথী
দ্রুতগতি চলে গেল যথায় পার্বতী।
গঙ্গা বলে চণ্ডী তুমি ক্ষমা কর মা'র
না বুঝিয়া এই কন্যা মার কী কারণ
যম অসুর বধ কর হাতে নিয়ে খাঁড়া
উচিত কথায় রাগ করা তোমার জাতেব ধারা।
ননীব পুতুল হেন দেখি কন্যাখানি
অকারণে তাবে কেন মারিছ ভবানী।

আবাব শুরু হয় গঙ্গা-দুর্গাব ঝগড়া। পাঠকবর্গ আমাদেব শিবায়নেব গীতি মনে করুন। গঙ্গাব কথায় চণ্ডী যেন আবও উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌লেন :—

চণ্ডী বলে গঙ্গা তুমি ভেজাইলা বড
পবেব শ্রাদ্ধে কেন দিতে এলে চাউল।
শোন গঙ্গাগো তুমি বড সতীনেব ঝি
এই কন্যার ভালমন্দ করি আমি
তার শাস্তি দিব আমি
তার জন্য তোমার কেন মাথাব ঝুলি।
শোন গঙ্গাগো ভাঙের খেয়ালে হবে
তোমারে ধরেছে শিরে
সেই হতে এলে আমার ঘরে।
জানি তোমার মনে পডে কুশলী ছিল ভাষায়
লোক মুখে হেন শুনি তোমাব মত মেয়ে
তোমায় জহ্নু মুনি গণ্ডুষে তুলিয়া কল্ল পান
তখন কাকুতি ক'রে শতে শতে
কম্পিত করিয়া জহ্নু মুনিরে
বাহির হইলে হাটু হ'তে
তবু তোমার নাই অবসান।

গঙ্গাও ছেড়ে দেবার পাত্রী নন। তাই তিনি পাল্টা জবাব দিচ্ছেন :—

যখন তোমার শিশুমতি
ছলিতে গেলেন পশুপতি
অকুমারী দিলে আলিঙ্গন।
যার তার ঘরে যাও
নিজে মাছ মাংস খেয়ে যাও
তুমি কি আমাকে বল মন্দ ?
দক্ষযজ্ঞে গেলে যবে
তথায় ফিরে পেলে অপমান।

এইবার রয়ানীকার নিজের ভাষাতেই বলছে :—

সহিতে না পারিয়া গঙ্গা ঘরের মধ্যে যায়
দুঃখ পেয়ে পদ্মা ধরে ভগবতীর পায়।
বলে মায়ে মায়ে সবাই কইরা ঝগড়া
আমারে যে মার তুমি হারাবা আপনা।
আমারে না চেন তুমি—আমি জয় বিষহরী
এখনি মারিয়া তোমায় জিয়াইতে পারি।
বিষ নয়নে পদ্মা ধরিল তখন
ঢলিয়া পড়িল চণ্ডী ভূমেতে তখন।
ঢলিয়া পড়িল চণ্ডী যখন দেবগণ আসে পাশে
ঘরের মধ্যে গিয়ে গঙ্গা খল্ খল্ হাসে।
গঙ্গা বলে পদ্মা উহার উচিত দিলে ফল
এতদিনে গেল আমার যন্ত্রণা সকল।
সতী কি মরিলে হয় সতীনের সম্পদ
সাপ হতে ঘুচিল আমার সকল জঞ্জাল ॥

এমন সময় নারদের আবির্ভাব ঘটে ঘটনাস্থলে। নারদের কুশলতা আমাদের জানা আছে :—

নারদ দেখে চণ্ডী দেবী ঘুমায় অচেতন
গঙ্গা দেবী গৃহমধ্যে করে দরশন।
ঢলিয়া পড়েছে দেখে আপনি ভবানী
মামী বলে কান্দে নারদ চক্ষে নাহি পানী।

তথা হ'তে যাত্রা করে নারদ মহামুনি
যেখানে তপস্যা করেন দেব শূলপাণি।

শিব আদ্যোপান্ত সব শোনেন নারদের মুখ থেকে :—

শিব বলে নারদ আমি বলিহে তোমায়
সেই কন্যার অঙ্গে আমি দেখিলাম নাগময়।
আমি সহিতে না পারি তেজ, চলেছিলাম পদ্মবনে
(তাই) যতনে রাখিলাম তারে নিজের বাড়ির চালে।
এমন নাগিনী কন্যা যে জন জন্মায়
মরিবে তা'র নিজের ইচ্ছায় আমার কিবা দায়।
নারদ বলে মামা আমি বলিহে তোমায়
এই জগৎমাতা মরিয়া গেলে কী হবে উপায়।

মহাদেব চিন্তা করে দেখেন নারদের কথাই ঠিক, জগৎমাতা চণ্ডীরই যদি মৃত্যু ঘটে তা'হলে সৃষ্টি থাকবে কী করে? তাই একেবারে সোজা এসে হাজির হন বাড়িতে :—

ব্যস্ত হয়ে ঘরে গেল দেব শূলপাণি
দেখে বিষেতে ঢলিয়া আছে আপনি ভবানী।
বিষেতে ভবানী দেবী আছেন অচেতন
চণ্ডীকে করিয়া কোলে কান্দে ত্রিলোচন।
শিব বলে আহা গৌরী আমায় গেলগো ছাড়িয়া
কীমতে সংসারী করি গৃহশূন্য হইয়া।
কার্ত্তিক গণেশ দুইটি পুত্র কে করিবে পালন
বিষাদ ভাবিয়া কান্দে দেব শূলপাণ।
তখন মহাদেবে বলে নারদ আমার কথা মান
বিলম্ব না করিও এখন মনসায় কর স্মরণ।
পদ্মা বিনে চণ্ডীর আর বাঁচার উপায় নাই
পদ্মাকে বন্দিয়া আনে নারদ গোঁসাই।
নারদ বলে মামা মোর মনে আছে
বিবাদ যখন হয়েছিল না আছিলাম কাছে,

অন্তরীক্ষ হতে আমি করলাম অধঃগতি
সেউজ বনে নাগ নিয়া গেছে পদ্মাবতী।
মিথ্যা না বলিলাম মামা আমায় লয় মনে
অনুমানে বুঝি পদ্মা গেছে সেউজের বনে।
ব্যস্ত হয়ে সেউজ বনে গেল পশুপতি
দেখে আঁচল পেতে নিদ্রা যায় দেবী পদ্মাবতী।
গায়ে হস্ত দিয়া শিব পদ্মাকে জাগায়
দেখিয়া লজ্জিত হ'ল শ্রীমনসায়।
শিব বলে পদ্মা তুমি কী কার্য কবিলা
দেবতাব সমাজে তুমি কলঙ্ক রাখিলা।
শিব বলে পদ্মাবতী আমার দিকে চাও
আমাব দিকে চেয়ে তুমি চণ্ডীকে বাঁচাও।

তখন মনসাও অভিযোগেব উত্তব দিচ্ছেন :—

আমাব সঙ্গে দেখ বাবা চণ্ডী কবে বাদ
বাঁচাইয়া কী ফল আমার ত্যাজিবে পরাণ।
অকাবণে মহামায়া মারিলেক যত
আঙ্গুল দিয়ে ক'বে দিল বাম নয়ন অন্ধ।
আমায় কত যে মারিল তাহা কহিতে না পারি
কেমনে বাঁচাব আমি দেহ শুভ যুক্তি।
শিব বলে পদ্মাবতী তুমি ক্ষমা কর মায়
ক্ষমা বিনা দেবতাব নাহিক লক্ষণ পায়।

শিবের কথায় শেষটায় মনসা বাজী হন এবং একেবারে গিয়ে হাজিব হন যেখানে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন দেবী ভগবতী। পবে শুরু কবলেন চণ্ডীকে বাঁচাতে :—

চণ্ডীব শিয়বে গিয়ে বসিলেন মনসা
বলিতে লাগিল পদ্মা গদগদ ভাষা।
বলে, কে তোমাকে আনিল বিষ, কেন এলে হেথা
পদ্মার সামনে বাবার ছাড মাথা ব্যথা।

শিবের কালীদহ হতে জন্মিল যে বিষ
তাহার মধ্যে করে বিষ ভার আসি।
তখন মূলমন্ত্র পড়িয়া পৃষ্ঠে কিল চাপড মারে
তখনি উঠিল চণ্ডী করি ধডফডি।
উঠিয়া চণ্ডী তখন চতুর্দিকে চায়
মনসাকে কাছে পেয়ে মারিবারে যায়।
এতেক দেখিয়া শিব বলে রও রও,
অন্যায় করে নাই পদ্মা তবু ক্ষমা দাও।
চণ্ডী বলে ভাঙ্গর তুমি এত জান তবে
কন্যা মাগীকে লইয়া ঘরে যাওনা কেনে।
আমাকে লইয়া যদি কর গৃহবাস
তবে গিয়ে মনসাকে দাও বনবাস।

চণ্ডী-পদ্মার বিবাদ এইখানেই শেষ। এখন আর চণ্ডী ও পদ্মার ভিতর কোন গোলযোগত' নেইই—উপরন্তু পদ্মা সেই থেকে বড হতে লাগল চণ্ডীর আশ্রয়ে কন্যাস্নেহে।

দিন যায়। পদ্মারও বয়স বাডে। শেষটায় এক সময় বিয়ের বয়সও হয়। চণ্ডীও মানুষের মতই মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজতে থাকেন। আজ পদ্মার উপর তার হিংসা, বিদ্বেষের পরিবর্তে দেখা দিয়েছে বাৎসল্য রস। বয়াণীকারও তার স্বভাবসুলভ কাব্যশক্তির সাহায্যে বর্ণনা করতে থাকে হর-পার্বতী ও মনসার ঘরোয়া কাহিনী :—

পূর্ণ যৌবন পদ্মার তখন চিন্তিত চণ্ডী
রূপ যৌবন তারে দেখিয়া পার্বতী
বলে কার কাছে দিব বিয়ে দেবী পদ্মাবতী।
ব্রহ্মা বলে আমার কথা ওগো শুন শুন মামী
জরৎকারু নামে জেনো আছে এক মুনি।
জরৎকারু নামেতে আছে মুনি একজন
তারে গিয়ে ত্বরা করে আনহ এখন।
যে কারণে জরৎকারু বিবাহ না করে
প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ হ'লে তবে বিবাহ করে।

একদিন গেল মুনি ফুল তুলিবারে
পিতৃলোকে দেখে মুনি নরকেব দ্বারে।
কুশেব শিকড ধরে যত পিতৃগণ
অধঃমুখে করে সবে নরক ভুঞ্জান।
জবৎকারু বলে তোমরা হও কোন্‌জন
এই নরক ভোগেব তোমরা কিসের কাবণ।
পিতৃলোকে বলে মোরা পাপ নাহি কাব
তপস্যা কবে সবে এলেম স্বর্গপুবী।
বংশ যখন ছিল মোদেব হইয়াছে নিধন
জরৎকারু নামেতে মাত্র আছে একজন।
বিবাহ করিয়া যেবা না দেখে পুত্রের মুখ
সেই জরৎকারুব জন্য আমরা পাই এত দুঃখ।
বিবাহ না কবি আমি প্রতিজ্ঞার কারণ
না যাচিতে কন্যা আমায় দিবে কোন্‌ জন।
না চাহিতে পাই যদি দেবেব কুমারী
প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ হলে তবে বিবাহ কবি।
বব দিয়ে পিতৃলোকে গেল নিজ ঘরে
সরোবরে ব'সে মুনি তপস্যা করে।
চাবিযুগ তপস্যা করে মুনি বসে সবোবরে
ভুজঙ্গে কবেছে বাসা জটার ভিতরে।
ব্রহ্মা বলে আমার কথা শুন শূলপাণি
এইখানে আন গিয়ে জরাৎকারু মুনি।
নারদ সাথে শিব তখন করিল গমন
দেখিতে চলিল তখন মুনি তপোবন।
শিব বলে মুনিপুত্র কর অবধান
আমার ঘরে চল এবে দিব কন্যা দান।
না চাহিতে মিলে কন্যা তার নাম জরাৎকারী
মুনি মহা তুষ্ট হয়ে বলে হরি হরি।

পদ্মার-বিয়ে। আমাদের পাঠকবর্গের শিবের বিবাহ-বাসরের কথা মনে

আছে নিশ্চযই। এক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থাই লক্ষ্য করতে পাববেন। তবে ভবসাব কথা এক্ষেত্রে শিব নিজেই উদ্যোক্তা কাজেই গণ্ডগোল আব বেশীদূব এগুতে পাবেনি:—

জবাৎকারু লইযা শিব এল আপন ঘবে
মুনিকন্যা এল যত বব দেখিবাবে।
যুবতী এল কত দেখিতে বব কেমন
জবাৎকাক নিযে শিব এল আপন ঘবে।
মুনিকন্যা এল সব পদ্মাব বব দেখিবাবে
কেহ বলে দেখ্‌বে সব, মুখে পাকা দাডি
কেহ বলে উডিযা বানবেব মত মাথা নাডে বাবে বাবে।
কেহ বলে কোথাকাব এই বিশ্ব আদাড
কেহ বলে কোথাকাব এই বীব হনুমান।
চুল পাক দূবেব কথা পেকেছে চক্ষু
পাগলেব মতন মুনি বাবে বাবে চায
'ও গা দিদি খেতে পাযনা বলে শুকায়েছে চম
এদিকে সেদিকে গোলদাডি মুখে নাই দন্ত।'
কেহ বলে 'পদ্মাবতী দেখ বাহিব হইযে
কেমন ববেব সাথে তোমাব হইবে বিযে।'

শিব দেখেন ব্যাপাব খাবাপ। এখুনি বুঝি দুর্গা এসে শুরু কবেন বিবাদ। তাই তিনি নিজেই উদ্যোগী হযে সব ব্যবস্থা কববাব ভাব নেন:—

তখন ধবিযা গৌবীব হাত
শিব বলে অপবাধ ক্ষমগো আমাব।
জামাই পেযেছি পূর্ণবব কন্যা সমর্পণ কবিব তাহাবে,
শিব বলে এবে তোমবা বিযেব সজ্জা কব গিবে ঘবে।
'কী কবিব বিযাব কাজ, তোমাব মুখে নাহি লাজ
আজ আমাব চাউল ঘবে নাই না পাই খাইতে
কে আস্‌বে বিযা দেখ্‌তে টাকা পাই কোথায'।
'আমি নিজে শূলপাণি, এব ভালমত ওষুধ জানি
দিগম্বব হব আমি ঐ সভাব মাঝে।

তাতে সকল আইওগণে লজ্জা পাইয়া যাবে আপন ঘরে'।
অতঃপরে করে সবে পদ্মার সনে জরাৎকারুর
বিয়াব আয়োজন।
সাঙ্গ হল বিয়ার কথা, এইবার শুনুন নূতন আলাপন॥

রয়াণী বা ভাসান গান যে একই বস্তু একথা আমরা আগেই বলেছি। এই বয়াণী বা ভাসানকে সাধারণতঃ দুই অংশে বিভক্ত করা হয় যথা:—পদ্মার জন্ম থেকে তার বিয়ে পর্যন্ত প্রথম অংশ, এবং চাঁদ সদাগরেব শেষবাবেব বাণিজ্যযাত্রা থেকে লক্ষ্মীন্দরের পুনর্জীবনলাভ পর্যন্ত দ্বিতীয় অংশ। এই সমস্ত রয়াণী বা ভাসানেব গানগুলি সব যে একই বয়াণীকারেব সৃষ্টি একথা বলা চলে না। আমারা নানাদেশের (পূর্ববঙ্গের) গান একত্রে আপনাদের কাছে উপস্থিত কবছি। এতে অনেক সময় এক গীতের সঙ্গে অপব গীতের বিশেষ কোন মিলও দেখতে পাবেন না। তবু এতে হতাশ হবার কাবণও কিছু নেই।

যা হ'ক এইবার আমবা চাঁদ সদাগরের সপ্তডিঙা মধুকব নিয়ে শেষবারের জন্য সমুদ্রযাত্রাব ছবি আপনাদেব কাছে উপস্থিত করছি:—

দেবী বন্দিয়া চাঁদ তখন চাহে বিলক্ষণ
চকমকি রাখিয়া তায় পূজিল অনুক্ষণ।
মুক্তা প্রবালাদি দিল যাহা ছিল
এইরূপে মধুকর সজ্জিত হইল।
এইরূপে দেবী তখন হইল সদয়
অভয়া চরণে রহে আমরা সবাই।

যাত্রার সময় এগিয়ে এল। আত্মীয় পরিজন সব এসেছে। এসেছে চাঁদের কুলপুরোহিত:—

শীতের স্বরূপ দ্রব্য যায় চিবযাত
রাতের বিহার ভাল নহে শীতের বাত।
প্রবেশ না করে শীত চট্ট গায়ে দিলে
চট্ট পরিলে রাজ্য হয় হরষিত
এমন কালে এল রাজার কুলপুরোহিত।
পুরোহিত এসে তখন বলিল রাজারে
বেটা এমন দ্রব্য পাইয়া না দিল পিতৃলোকেরে।

তখন বাজা বলে ঠাকুবমশাই না কবিও বোল
আমি কবিব পিতৃমন্ত্র কাঠ ঠোঙা গেলে।
ব্রাহ্মণ বলে ব্রাহ্মণী আমাব কাছে এসে।
এমন দ্রব্য তোমাব বাবাব দেশেনি আছে
লুকাইযা থোও গিযে ওগো পাছে কেহ দেখে।
তখন ব্রাহ্মণী লুকাইযা বাখে চট নিযা বুকে।

এই সময চাঁদবেনেব বন্ধু শাহ বেনেও সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলছেন :—

মিতাহে আমাব বাডিব কাছে
ঘব দু'চাব তাতী আছে
তাবা প্রচুব বুনাতে পাবে চট।
এই চট গাযে দিলে শীত যাবে চলে
বগু দূবকাব শক্তি টানিতে নাই পাবে।

তখন চাঁদও উত্তব দিচ্ছেন :—

চাদ বলে ওবে মিতা বিদেশে যাব আমি
একেশ্ববী দুঃখ পাব তোমাবে মিতালি।
চিন্তা কবে বাজা তখন ভাবে মনে মনে
দশ তোলা সোনা চাঁদকে কবিল অর্পণ।
দশ তোলা সোনা পেযে চাঁদ ভাবী পুলকিত
চাঁদ এখন কী দিবে ভাবে মনে মন
একখানা চট দিলা সে তখন।
চাঁদ বলে ওবে মিতা বিদেশে যাব আমি
একেশ্ববী দুঃখ পাব তোমাবে মিতালি।
যখন শুনিল বাজা সেই চাঁদেব গমন
বিষাদ সাগবে বাজা হল নিমগন।

এইবাব শাহ বেনে বলছেন :—

মিতা হে তুমিও যাবে বিদেশে আমাবত' বুক ভাসে
ভাল বস্তু আনিও শহবে।

মিতাহে ওগো বৎসবে আসিও একবাব
আসিও একবাব সুবর্ণ ভবিয়ে দিব তোমাব।
মিতাহে তুমি না কবিও আউ ঢাউ
আমি আসিব একা লইয়া লাউ শাক,
তাহাতে কবিও ভালো জল-সেচ।
(ও) মিতাহে তুমি আবও যদি কিছু চাও
আমি আনিব বানবেব ছাও
মিতাহে পুত্র কোলে চাঁদমুখ দেখো।
(ও) মিতাহে তুমি আবও যদি চাও কিছু
আনিযা দিব ভাউতা কচু
তাবে খাইলে গলা ধবে।
(ও) মিতা হে আনিব কচুপোড়া
যাহাব মূল্য লক্ষ টাকা
প্রাণ ভবিযা তাহা খাইও।
মিতাহে, আমড়া, চাউলতা, তাল
আব আনিব মাকাল
স্বর্গে দুর্লভ যাহা
মর্তে সুলভ সেটা
পাগল হইযা মর্তে তুলিলে এই সব
আনিলে জেনো দিব ধন।

এইবাব সত্যই চাঁদেব বাণিজ্যযাত্রা। চৌদ্দডিঙা মধুকব পব পব সাজান বয়েছে ঘাটে। প্রত্যেকটিব শোভাই বা কি চমৎকাব!! ময়ুবপঙ্খী ধবনেব সব বজবা। নৌকোব মাথা পিতলে মোড়া। মাজা ঘষাব জন্য সেগুলি ঠিক সোনাব মতই চকচক কবছে। নৌকোয বোঝাই সব পণ্য সামগ্রী। চাঁদ যেন উমাপতিব মত স্থিব সহাস্যমুখে দাঁড়িযে আছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বজবা মধুকবেব উপব। বযাণীকাব বর্ণনা কবতে থাকে ঃ—

ডিঙাতে উঠিল চাঁদ মহাদেবকে ভাবি
কতদূব গিয়ে চাঁদ পূজে গঙ্গাদেবী।

একে একে দেবগণ চাঁদ তখন পূজিল সকল
গঙ্গাপূজা করে দিয়া লক্ষ ছাগল।
একে একে দেবগণে চাঁদ তখন পূজিল সকল
কেবল পদ্মাদেবীর নামে না দিল ফুল জল।
তেত্রিশ কোটী দেব পূজা করিলেন চাঁদে
না দিল কেবল ফুল পদ্মার নামে।
যদি ব্রাহ্মণী বেশে এবে ভিক্ষা মাগে এবার
যদি ভ্রমে পূজে আমারে চাঁদ বিনয় দিয়া
বলামাত্র পদ্মাবতী ব্রাহ্মণীর বেশ ধারণ করে (হে)
আমার যাত্রাকালে বিধবা কন্যা এলি আমার ঠাঁই
আমার ইচ্ছা করে তোরে হেতালের বাড়ি দিয়া করি শেষ।
পদ্মা বলে কেন ত্যাজ সাধু সজ্জন
আমি শিবের কন্যা পদ্মাবতী নাম মনসা।
আমায় পূজে ফিরে যাও যেখানে যে দেশে
আমি নিজে কাণ্ডারী হইয়া বাইয়া দেই নাও।
আমি আসিবার কালে তোমাব হইলাম কাঙাল
আমি কপটে লুটিয়া দিলাম পদ্মার ভাণ্ডাব।
এখন আমারে দেও পুষ্পগতি তুলে
ও তোর ছয় পুত্র জিয়াইয়া দিব না কবিব আন।
চাঁদ বলে মরা যদি তুমি জিয়াইতে পার
তবে কেন ভাঙ্গা মাজা, কানা চক্ষের
ওষুধ কেন না কর।
তারপর সদাগর হেতাল গনিয়া হাতে
কলার চক্রে মাথা লাগে পদ্মাবতীর কাছে।
দৌড় দিল পদ্মাবতী আলুথালু চুলে
পাছে পাছে যায় চাঁদ ধর্ ধর্ বলে।

চাঁদ মনসাকে ভাগিয়ে দিয়ে আবার চলতে থাকেন :—

তথা হতে যাত্রা করল চাঁদ সদাগর
হেথায় চম্পক নগরের কিছু শোনেন খবর।

এক মাস দুই মাস কিছুই না জানি
ওরে পাঁচ মাসের গর্ভ ধরে সেনকা সৌদামিনী।
ছয় মাসে হল সনকার গর্ভের প্রচার
সাত মাসে তখন হইল সেই গর্ভের প্রসাব।
ঢাই (ধাই) চারীকে ডাক দিয়া বলে দিও বাবি
ও সাধ খাইতে মন যে চায়
কাঁদে লয়ে বেছুয়া হাবী গো।
বতি শাক তুলিতে বেডায় বাডি বাডিগো
হইল কমলা, খাবে পইংলা
বাতি বেলা কুচি তুলে গেছে দুধ
স্বত্রা চাল আব মধুলতা গো।
বতি ধইন্যা তোলে দিয়া কাটা গো
আমার অম্বল খাইতে মন চায় গো।
বুইনা (বুনো) তেঁতুল পাইব কোথায় গো॥
সেই সব শুভক্ষণে কবিল রন্ধন গো
এল শেষে হল শুদ্ধ মতি গো
তখন জগন্নাথে বন্দে পদ্মাবতী গো।।
দশ মাস দশ দিন হইল যখন
জন্মিলেন লক্ষীন্দর দেব সুলক্ষণ।
আর ভালো সিন্দুরে ভালো মঙ্গল ধ্বনি
জন্মিলেন লক্ষীন্দব হইয়া শুভক্ষণ
জয় জোকার এসে দিল যত নারীগণ।
ওগো জন্মিলেন লক্ষীন্দব শুভ সঙ্গে
সুবর্ণের কাটারী দিয়া করিল নাড়ী ছেদন।
ওগো নখাইর জন্মের কথা অতি বৃত্তান্ত
দিনে দিনে এল এই সব বৃত্তান্ত।
ছয় মাসে করে নখাইর অন্নপ্রাসন
ওগো জ্ঞাতীগণ লয়ে করে নামকরণ।
ওগো পাটলে যেতে কালে বলিলেন সদাগব

ওগো পুত্র হলে নাম রেখো সোনার লক্ষান্দর।
তখন পত্র পড়িয়া স্নেহ ভাবে মনে মন
ওগো লক্ষীন্দর নাম রেখো করে নামকরণ।
ওগো এই মতে আছে কথা কুমার লক্ষীন্দর।
ওগো বেহুলার জন্ম হ'ল উজানী নগর।
ওগো এই মতে আছে হেথা শাহের দুহিতা
ওগো পশ্চিমে গিয়াছে চাঁদ শোন তারই কথা।

আমরা চাঁদের বাণিজ্য যাত্রা বলতে বলতে (রয়াণীকারের ভাষানুসারে হঠাৎ লক্ষীন্দর ও বেহুলার জন্মবৃত্তান্ত বলে নিলুম। কিন্তু এদিকে চাঁদসদাগর বাণিজ্যে গিয়ে কী অবস্থায় পড়লেন শুনুন :—

কেন ওগো দিলে বর চাঁদ সদাগরে
বল বর দিয়ে কেন তারে ডুবাও অকূল সাগরে।
এক শিষ্য ছিল সে লবন অসুব
সব যুগ ধর্ম দিয়ে তারে পাঠালে ভুবন
করুণা কেন হ'ল লবন অসুরে।
আর এক শিষ্য ছিল তোমার মহাশূল শুলপাণ
সহস্তে মারিলে শিরে করলে খান্‌খান্‌।
আর এক শিষ্য ছিল সে যে লঙ্কার রাবণ
সবাকার শেষে বধিল শ্রীরামলক্ষ্মণ
আবার শেষে সে সেবক তোমার চাঁদসদাগর।

চাঁদসদাগর শিব-ভক্ত—পরম ধার্মিক। কিন্তু মনসাকে মোটেও পাত্তা দিতে চান না। অথচ মনসাও নাছোড়বান্দা—চাঁদের পুজো তিনি নেবেনই। তাই চাঁদ যখন কিছুতেই তা'কে গ্রাহ্য করতে চান না, তখন থেকেই তিনি শুরু করলেন চাঁদের বিপদ ঘটাতে :—

আজ্ঞা পেয়ে পদ্মাবতী করিল গমন
পাছে পাছে ডাকে তারে দেব ত্রিলোচন।
শিবের মুখেতে পদ্মা তখন পঠাইয়া প্রচার
খুঁজিয়া লইল মেঘ তখন উনপঞ্চাশ।

বাহিবে থাকিয়ে হয় পদ্মা সমুদ্রে কালীময়,
বলে আমি তোমাব সঙ্গে যাব।
পদ্মাব কথায় মেঘ তখন বড়ই ব্যথিৎ
পবনে চাপিযা চলে চতুর্দিকে
বাহিবে থাকিয়া ভুলাই তখন মাথাব দিকে চায়
বাহিবে থাকিযা তখন প্রাণ উপড়ায়।
বাহিবে থাকিয়া তখন ভুলাই ঊর্ধ্বে দিকে চায়
মেঘেব লক্ষণ দেখে কবে হায় হায়।
সঙ্গে সঙ্গে চড়াও হযে এল প্রভঞ্জন
চাঁদ বলে বক্ষা কব দেব পঞ্চানন।
বাত্রিভাগে যেখানে নোঙ্গব কবেছিল সদাগব
দেখিতে দেখিতে হল আসি ঝড় ও বাদল।
সমুদ্রেব গর্জন শোন মেঘে ধবে তান
চাঁদ বলে বক্ষা কব জয় মা দুর্গা।
হেথা লাঠি দিয়ে চাঁদ মৃতেব কায়া ধবে
এমনি মায়াব খেলা ডুবিল অতলে।
শিব দুর্গা বলে চাঁদ কান্দি কহে ভুলাই আব কিবা চাও
প্রাণবক্ষা পাব যদি এখন নোঙ্গব ফেলে দাও।
ওগো বলাবলি কবে সবাই
এইবাব তবাও ধব হবি লও নাও।
মনসা বলে ওহে চাঁদ শুন আমাব বাণী
এখনও দেও তুমি আমায় পুষ্পাঞ্জলি,
(এখনও তুমি আমায় দেহ পুষ্পাঞ্জলি)
ছয় পুত্র জিয়াইয়া দিব ডিঙা চৌদ্দখানি।

কিন্তু মনসাব কাকুতি বিফলেই গেল। গর্বিত চাঁদ মনসাব প্রভাবেব কাছে মাথা হেঁট করতে বাজী নন। এত বিপদ, এত দৈন্য, আসন্ন বিপর্যয় এমনকি মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও তিনি মনসাব কাছে মাথা হেঁট করতে রাজী নন। গোটা বয়াণী বা ভাসান কিংবা মনসামঙ্গলেব পুঁথিব মধ্যে এত বড় বলিষ্ঠ চরিত্র আর

নেই। মানুষ হয়ে দেবতার সঙ্গে এইভাবে পাল্লা দিয়ে চলার কথা তৎকালীন 'মঙ্গলকাব্যে' একটু ব্যতিক্রম বইকি। তাই রয়াণীকাবেব ভাষায় :—

চাঁদ বলে পার যদি মরা জিয়াইতে
তোমার ভাঙ্গা মাজা, কানা চক্ষে দোসব কেন না হয়।
এত শক্তি যদি বামা ধর তুমি
বিবাহের রাত্রে কেন ছেড়ে গেল স্বামী।
এতেক শুনিয়া পদ্মা ছাড়ে হুহুঙ্কার
চাঁদের চৌদ্দডিঙা ঘোরে যেন কুমারের চাক।
প্রথমে ডুবিল ডিঙা নামে গুয়াঠুটী
(ওগো) তার মধ্যে আছে যেন রাবণের লঙ্কাপুবী।
তারপরে ডুবিল ডিঙা নামেতে থালই
টোপে গনেনা তার ভরা তাতিয়ে উঠায় মাটি।
তারপরে ডুবিল ডিঙা নামেতে মকবা
ওগো সাত শত বাড়ুইতে যার গড়েছে এক গুড়া।
তারপবে ডুবিল ডিঙা নামে শঙ্খবার
ওগো আশী হাত জল ভাঙ্গে যায় সমুদ্র।
তারপরে ডুবিল ডিঙা নামেতে নগুন
তাব ভিতবে ভুবনের অসংখ্য মাণিক্য।
তাবপবে ডুবিল ডিঙা জলেতে ব্রহ্মাণ্ডি
ওগো সাত শত বাইছা যার চালাইত দাঁড়ী।
(তখন) তেব ডিঙার লোক গিয়া মধুকরে চড়ে
এই ডিঙায় যাবে সবে চম্পক নগরে।

চাঁদেব চৌদ্দডিঙার ভিতর তেরখানাই জলে ডুবল। এখন বাকীমাত্র চাঁদের বজবাখানা। তাও টল মল অবস্থায়। চরম মুহূর্তে আসন্ন সর্বনাশ জেনে চাঁদ শুরু করে চণ্ডীর স্তব স্তুতি :—

শুনগো মা দেহ গো মা বিষাদে পদচ্ছায়া
প্রাণহারা হইতে তারা দেখলাম যবে ও পদে
কত শত আঁচল পাতি কৃষ্ণ চাঁদ পূজে

শুন কালী বক্ষা কালী কালীকা শুনহে,
এসে দোলা কাল কালি তব কৃপা দে।
ঘুচাও কালি মাথাব কালি বব দে মা জগৎ জননী।
মাগো তুমি আদ্যাশক্তি শুনেছি মা শ্রবণে
সৃজনে জানে কি আছে শক্তি তব শক্তি না দিলে।
মাগো দূবেতে থাকিযা পবন কুমাব
ওগো শিবেব আজ্ঞা পেয়ে চাদ-সদাগব
ওগো শেষকালে কী কবিলি শিব গোঁসাই
ওগো প্রভাতে দেখিলে যাব কিছু নহে কাজ।
ওগো হাইগ্যা না শোচে মুইত্যা না নেয পানী
ওগো তোকে কে পাঠাযে দিছে বক্ষমণি।
ওগো এই কথা শুনিযা হল কুপিত অন্তব
ওগো লম্ফ দিযা পডিল গিযা ডিঙাব উপব।
ওগো হনুমানেব গাযে আছে পর্বতেব ভাব
ওগো ঝলকে ঝলকে পানী উঠে ডিঙাবপব।
ওগো না জানে মাবে কত বাসুবে লইলবা
ওগো জলেব মধ্যে চাঁদকে ফেলাইল ঠেলিযা।
চৌদ্দডিঙা ডুবিল জয ব্রাহ্মণী
জলেব মধ্যে সদাগব ভাসে হইযা পাবি।

চাদেব চোদ্দডিঙা মধুকব এখন জলেব তলায। সমস্ত ধনসম্পত্তি এখন গঙ্গাগভে। তিনি ভেসে চলেছেন স্রোতেব উপব গা ভাসিযে দিযে। ভাসতে ভাসতে শুরু কবেন বিলাপ :—

ওগো কাশীনাথ বক্ষা কব মোবে
ওগো সঙ্কটে পডিযা চাঁদ চতুর্দিকে চায
এমন সময কাশীনাথ বহিলে কোথায।
বণিক কুলে জন্ম আমাব বণিকি আমাব মতি
আমি কি জানিব তোমাব চবণেব ভকতি।

বণিক কুলে জন্ম আমার বণিকি আমার মা
বণিক কুলে জন্ম ভাল সাধন করলাম না।
বণিক কুলে জন্ম আমার বণিকের নন্দন
আমি কি জানিব তোমার সাধন ভজন।

শুরু হয় চাঁদের দুঃখ দুর্দশা একটার পর একটা :—

চোয়াল মাছে নিয়ে গেল চাঁদের হেতাখানি
সমুদ্রের মধ্যে চাঁদ হাবুডুবু খায়,
কূলে থেকে পদ্মাবতী দেখিবারে পায়।
এত ব'লে পদ্মাবতী শোন আমার বাণী
চাঁদ বেনে দিলে মোরে পুষ্পাঞ্জলি,
চক্রবর্তী বলে পদ্মা ওগো আমার কথা ধর
চাঁদের যাতে রক্ষা হয় তার উপায় কর।
পদ্মভেলা দেখে চাঁদ তখন মারিলেক ঠেলা
থুঃ থুঃ করিয়া চাঁদ দিল ফুলমালা।
শতাধিক বারে তীরে এল সদাগর
চরের উপরে চাঁদ হাটিয়া বেড়ায়।
মড়া মানুষের দড়ি কাছি চরের উপর পায়
মড়া মানুষের দড়ি কাছি চরের উপর পাইয়া
চাঁদ নেতি নিল হাতে।
মনসার বিবাদে চাঁদের হল দুর্গতি
শেষে কচুর পাতায় করে লজ্জা নিবারণ।

একদিকে চাঁদের এই রকম দুর্গতি অন্য দিকে স্বর্গপুরে মেঘ লোকে পাষাণের ঘরে পাথরের আসনে বসে মনসা দেবী চিন্তিতভাবে কি যেন ভাবছেন। এমন সময় সেখানে এসে হাজির পরিচারিকা নেতা। সে এসে খবর বলে চাঁদের :—

নেতা বলে পদ্মাবতী হল সর্বনাশ
মুখে পোড়া খেলে চাঁদের যাবে জাতিকুল।
শিব না পূজিয়া চাঁদ কিছু নাহি খায়
সিনান করিতে চাঁদের কত সময় যায়।

চিল রূপে পদ্মাবতী চলিল উড়িয়া
যেখানে ছিল মহেশ আসিল উড়িয়া।
কূলেতে উঠিয়া চাঁদ কবে হায় হায়
কেমনে হাটিয়া যাব কানিব মুই থাই।
বিনোব চাল বিয়াব চাল মেগে ঘবে ঘবে
ছুধাব উপব খুচিল থাইবাবে।
শিব না পূজিয়া চাঁদ কিছু নাহি খায
সিনান কবিতে চাঁদেব কত সময় যায়।
কাক রূপে নেতা অতি চলিল সত্বব
চাউল হবিতে ওগো চলে যে সত্বব।
চাঁদ বেনে ভিক্ষা কবে দিকে দিকে চায
কতই বলে কাঙাল বেটা এই দিকে আয।
চাউল কলা খেয়ে গেলি গুযা এবং পান
জ্যোতি বলে কাঙাল তুই কাব পুত্র নাতী
কোন্ অপবাধে তোব এতেক দুর্গতি।
আমি কাঙাল নয চাঁদ সদাগব
বাব বাজ্যে ঘব আমাব চম্পক নগব।
নানামতে ধন উপার্জন কবলাম অতি সব
মনসাব কোপেতে সব চলি গেল বসাতল।
বলে, সেইত পদ্মাবতী জানি মহাদেবেব ঝি
এখন বলব কি লজ্জা নাহি লাগে।
তথা হতে ব্যস্ত হযে চাঁদ বেনে যায
বাধ্য হয়ে ফিবে গিয়ে কাষ্ঠ কুডায।
কাষ্ঠ কুডাযে চাঁদ বাধিলেক আঁটি
বেচিবাবে নিয়ে গেল কুমাবেব বাটী।
কাষ্ঠ বোঝা মাথায় নিয়ে চাবিদিকে চায়
সেনকা বেটী বলে এই দিকে আয়।
কাষ্ঠ বোঝা থুইল নিয়া কুমাবঝিব পাশে
কাষ্ঠ বোঝা থুইয়া তার পরিচয় ভাসে।

তখন চাঁদ বলে তোমার পরিচয় কী ?
জেনে বলে আমার স্ত্রীর নামে নাম তোমার
তুই আমার সই !
তখন কুমারেরঝি বলে বেটা কে তোর সই বটে
ছাড় ওকথা।
চাঁদ বলে তোমরা ত' কুম্ভকার
আমার কাষ্ঠের মূল্য দে।
কে বুঝিতে পারে তবে মনসার ছলনা
আচম্বিতে কাষ্ঠবোঝা হয়ে গেল সাপ।
কাষ্ঠ বোঝা সর্প হয়ে চারিদিকে ধায়
কুমারের ঝি দেখে সাপে তরাসে পালায়।

এইভাবে কোনগতিকে একটু ভদ্র হয়ে চাঁদ এসে পৌছয় বন্ধু শাহের বাড়ি। বন্ধুত' শুনেই অবাক। শেষটায় বন্ধুকে যথাযোগ্য সমাদর করে খাইয়ে দাইয়ে পালকি করে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন তার দেশে। কিন্তু দৈবের ইচ্ছা! দেশে যাবার সময় চাঁদকে আবাব পড়তে হ'ল মনসার কোপে। শুরু হ'ল আবার তার দুঃখ কষ্ট ও লাঞ্ছনা :—

তখন ভোজন করিয়া চাঁদ করে আচায়ন
কর্পূর তাম্বুলে করে মুখ প্রক্ষালন।
সুবর্ণের খাটে পড়ে নেতের চামর
ওই তাহাতে শয়ন করিল চাঁদ সদাগর।
চাঁদ বলে ওরে মিতা কোথা যাব আমি
একেশ্বরী তোমার মিতালি দুঃখ অনেক আছে।
এতেক শুনিয়া সাধু হরষিত হইল
সুবর্ণের পাকাটী কলম উপহার দিল।
চড়িবারে দিলা আবের দোলা
ঐ দোলায় চড়িয়া চাঁদ ঘরের মুখে চলিলা।
টেনার বোন ধামাই তখন চলিল অকস্মাৎ

পথের পরে গিয়ে ধামাই দিল দরশন।
বলে ওগো সদাগর তুমি আমাব দোলায় চড
চম্পক নগরে তোমায় নিয়া যাব।
একেত' চাঁদ বেনিয়ার মন্দি বেসন ভুলে
তাই মিতার দোলা ছেড়ে চড়ে টেনার দোলে।
পথ না পেয়ে ধামাই চাঁদকে ফেলায়
চড়াইতে চড়াইতে মুখ করল রক্ত ক্ষয়।
এই মুখে বেটা তোর এতেক আস্পর্ধা
চাঁদেব মুখ যেমন শামুকেব ন্যায়।

চাঁদেব দুর্ভোগ এইখানেই শেষ নয়। পথিমধ্যে পুনবায় :—

মায়া কাঁঠাল দেখে চাঁদ কাঁঠালের দিকে চায়
পক্ক জাতী দেখে তার খেতে ইচ্ছা যায়।
পাড়িয়া আনিতে যদি যায়
ভাবে এই কাঁঠাল খেলে হবে পরিত্রাণ।
চাঁদ ওঠে ওই গাছে—চাঁদ উঠল কাঁঠালের কাছে
টান দিল সে কাঁঠাল ধরিয়া।
কাঁঠাল নয়রে ভেমরুল, চাঁদ হ'ল নিস্তব গো।
তখন সর্ব অঙ্গ লইল বেড়িয়া
তখন বেটা দুখে চাঁদ যায় রাখালের জলে গা ভেজায়গো।
সেই চোতরাপাতা তাহে দিল ঘষিয়া
বলে গন্ধ পদ্মার চরণ সাথে গো
বলরে কেমনে এল চাঁদ বেনিয়া।
এই মত চাঁদ তবে এড়ায় সঙ্কট
দিবা অবসানে গেল দিল্-মাহের ঘাট।
সর্বলোকে বলে পাগল আমাদের কথা ধব
এই কাঙাল বেটাকে এনে নদীর ওপর রাখ।
লাঠিখান রাখ বেটার নিকেরিয়ায় দাও
কোথা থেকে এনে দেবে খেওয়ার কড়ি।

চাঁদ কহে আমি কাঙাল নই—চাঁদসদাগর
রাঙরাজ্য ঘর আমার সেই চম্পক নগব।
এতেক শুনিয়া তখন পাটনী পাব করে দিল তারে
নদীর ওপারে।
চাঁদ তখন তথা হতে চলে এবে সত্বব
প্রবেশ করিল চাঁদ চম্পক নগর।
বলে দিবসে না যাব আমি পুরীর ভিতর
না যাইল রইল এবে কলা ছোপের ভিতর।
সুন্দর লক্ষীন্দরের জন্য এলে কাটিতে বামকলার পাতি
খাঁড়া দেখিয়া চাঁদ ওগো ভয়ে কম্পমান
এক কোপ দিয়া পাছে করে খান্ খান।
অমনি তথা হতে দৌড দিল চাঁদসদাগব
পলাইয়া রইল গিয়ে বেগুন বনের ভিতব।
চাঁদের ছয় পুত্র-বধূ এল তখন বেগুন তুলিতে
অন্ধকারে সদাগরে না পারে দেখিতে।
তখন বেগুন ভাবিয়া মনে চর্ম ধরিয়া টানে
ছয় পুত্রবধূর টানে চর্ম বুঝি ছেঁড়ে।
ছোট বউ উঠিয়া বলে—মেজবৌলো দিদি
এক বোঁটায় দুই বেগুন মিলাইল বিধি।
কলার ভাতরা চাঁদ ওগো গলাতে উঠিয়া
অমনি সেনকার সাক্ষাৎ নিল গো টানিয়া।
সেঝ বধূ বলে দিদি এ চোর বিষম
নোয়া বধূ বলে দিদি এ চোরের নাই মোচ।
কাটিবারে আজ্ঞা দিল তখন সেনকা আই কানী
এমন সময় ভাবে মনে চাঁদ মহামনি।
আমি কাঙাল নই চাঁদ সদাগর
উত্তররাজ্য ঘর আমার চম্পক নগর।
এত করি চাদর মুখে আসিল স্ববল
প্রভু প্রভু বলে সেনকার ধরিলেক হাত।

ভুল ভেঙ্গে গেছে সনকারও। এতক্ষণে সেও চিনতে পেরেছে স্বামীকে। তাই গভীর বিষাদের পর মিলন শুরু হয় কান্না দিয়েই :—

প্রাণ বঁধুয়ারে ভাল করি তুমি পরিচয় দিয়ে
কী কারণে প্রভু তোমার এত লড়ি দড়ি
চৌদ্দখানা ডিঙ্গা প্রভু তুমি কারে দিলা ভাসি।
সঙ্গে নিয়া ছিলে প্রভু চৌদ্দশ বাইছাক
তাদের যত স্ত্রী পুত্র সব আসিবে এখনি
কারো বাপ, কারো ভাই, কারো দ্বিজ পতি
কোথায় রাখিয়া এলে ঠাকুর মহামতি।
এমন সময় সনকা লখাইরে কোলে করি
চাঁদের নিকটে এল সনকা সুন্দরী
লখাইকে দেখে চাঁদ ভাবে মনে মন
কার পুত্র নিয়ে তুমি এসেছ এখানে
অন্য পুরুষ সঙ্গে করলি গৃহ বাস
সেই কারণে চৌদ্দ ডিঙা সমুদ্রে হল নাশ।
এতেক সনকা তখন ভাবে মনে মন
চাঁদকে আনিয়া দিল গর্ভের লিখন।
সত্য সত্য ওগো সত্য কইছ তুমি
আমার সাধ ধন দিয়াছিলেন তোমায় অর্বাণয়া
বার বছরের লখাইরে না করালা বিয়া।
যজ্ঞ স্থানে যাইয়া বিয়া করাইও তুমি
তোমার চরণে ধরিলো দেবী হউক সদয়া
এতেক শুনিয়া চাঁদ বলিল তখন,
উজানী নগরে গিয়া পাত্রী আনিব এখন।

এক নিমিষে ভোজ-বাজীর মত চাঁদ ফিরে পেলেন তার রাজ্য-পাট। ফিরে আসে হারানো সুখ শান্তি। এখন তার সর্ব প্রধান কর্তব্য হল লক্ষীন্দরের বিয়ে দেওয়া। তাই লক্ষীন্দরের জন্য মেয়ে খুঁজতে রওনা দেন বন্ধুবর শাহ বেনের বাড়ির দিকে।

কিন্তু এদিকে বেহুলা সুন্দরী দৈবজ্ঞের গণনানুসারে তোলা-জলে স্নান করতে হয় বলে বড়ই আক্ষেপের সঙ্গে কান্না শুরু করে দেয় :—

ওগো মাগো শিবের নন্দিনী
কেউ আমায় দেখিতেছে কি।
শয়ন মন্দিরে বেউলা করিছে রোদন
ওগো তাই শুনে সুমিত্রা রাণী দিল দরশন।
সুমিত্রা বলেন বেউলা করে নিবেদন
বেউলা বলে ওগো মাতা আমার বড়ই দুঃখ
ওগো তোলা জলে স্নান করিতে চিত্তে না ছিল সুখ।

তাই বেহুলা একদিন বাড়ির অজান্তে সখী সঙ্গে গিয়ে হাজির হয় নদীর ঘাটে :—

চল চল ওগো বেউলা চলগো সত্বর
ওগো তড়িতে আসিও যেন না জানে সদাগর।
তখন সখী সঙ্গে চলে বেউলা শিব শিব জয়
মুক্ত তীরের ঘাটে গিয়া হইল উদয়।
এতেক বলিয়া জ্যোতি ছিলে কতক্ষণ
পালন করিলে মাত্র শিবের ছাওয়াল।
আর যত তারা কেউনা আসে ঘাটে
তুমি ধেয়ে ধেয়ে কেন আস ঘাটে।
তোমায় কেমন করে লজ্জায় পায়
ধরলে আলিঙ্গন পায়।
তোমার জ্যোতি জানা যায় ছারেখারে
খাড়া দেখে দুইটা তন বার পুরুষের যায় লোভ
আমার তরেগো ওগো সুমুখ পানে চাও।
ঘাট না পেয়ে বেউলা নামে পাশ দিয়ে
কাণী মনসা বইস্যা ছিল সেই ঘাটের পারে।
কী করিলি ওগো মাগো তোর মাথায় হউক বজ্রপাত
বাসী বিয়ের রাত্রে খাবি স্বামী না হইবে আন,
দুই চার দিনের মধ্যে পাবি এই কথার প্রমাণ

বেউলা বলে তোমাব শাপে হবে কী
আমাব মায আছে দেবী লক্ষ্মীবতী।
এই বলিয়া ডুব দিল বেউলা জলেব ভিতবে
সাজ সজ্জা নিযে বেউলা উঠিল সত্ববে।

বেহুলা স্নান কবছে, দূব থেকে তা' লক্ষ্য কবছেন চাঁদ বেনে :—

এই কন্যা পেলে লখাইব সাথে অবশ্য দিব বিযে
মইলে মবা এই বধূ আনবে জিযাইযে।
স্নান কবে বেউলা বমা চলিল সত্বব
আপন গৃহে গিযে কবিল প্রবেশ।

এবপব চাদেব কথা শুরু হয শায (শাহ্) বেনেব সঙ্গে। শা'া বেনে বলছেন :—

আমাব ভাল কন্যা আছে বিযা দিতে চাই
যাগ্য পাত্র পেলে আমি বিয়া দিব।
এখন লখাইব বেউলাব কুষ্ঠী আনিযা দিল দৈবজ্ঞেব হাতে।
ওগো বেউলাব কুষ্ঠীতে দেখে অপূব লক্ষণ
জন্মিযাছে সিংহ বাশে মূলে বাক্ষস গণ।
এব জন্য এ কর্ম সদাগব কবিবে কেমনে
পবে সব ব্রাহ্মণে বলে কেমন কবে হবে।

এদিকে সৃষ্টি কর্তা ব্রহ্মা দেখেন মহা অনুপায এখনই বুঝি সব বববাদ হযে যায, তাই, তক্ষুনি পাঠালেন নাবদকে একেবাবে ঘটনাস্থলে :—

ব্রহ্মা বলে নাবদ তুমি আমাব কথা ধব
উজানী নগবে গিযে দণ্ডকাল বিশ্রাম কব।
যাতে লখাই-বেউলাব কুষ্ঠীতে হয মিলন
এই কর্ম শীঘ্র গিয়ে কবগে এখন।
আমি যে অবধি হয়েছিলাম সমুদ্রেব মধ্যে
প্রথম ভোজনে আমি লোহাব কলাই সিদ্ধ খাই।
যদি হয বুড়ি লোহাব কলাই সিদ্ধ কবাইতে পাবে
লোহাব কলাই দিল তাকে বাধিতে তাব মায
সিদ্ধ কবিতে নিজ হাতে।

স্বপনে দেখায়ে দেবী হল অন্তর্ধান
চৈতন্য পাইয়া বেউলা ভাবে মনে মন
নিকটে আছিল কুমার বাড়ি তথা হইতে
কী যে নিল কাজ করি
ঐ কাঁচা হাঁড়ি নিয়া বেউলা আসে বাড়ি,
এক মুষ্টি হাতে খড়ি নিল কেবলি।
যুবী লক্ষপুরী রেখে উত্তম সেচন
বলিতে লাগিল বেউলা কবে নানা বিচিত্র
কেন গো মা তুমি চডালে বন্ধন
ওগো বঙ করিলা তুমি আলোব সাগর।
সাগব ঘব পোড়ে শায়ের পোড়ে চৌদ্দ ঘব
বোঝায় বোঝায় পোড়ে হাঁড়িয়া চামব।
ক্রমে ঘাটে নহে হ'ও গো কাই
বধ্যে মাথায় বেথে আমি তোমাব সাক্ষাতে
কাঠি দিব লাগিতে।
তখন এই সব হাঁড়ি আবো বেউলা কাটল তিয়াবী
তখন শিবের মনসার নামে তুলে দিল হাঁড়ি।
তখন ভাতের ওজনে দিল হাঁড়িতে জল
তখন বেউলাব জ্বালে গলিল লোহার কলাই
বেউলা বাঁধিল উত্তম।
ওগো কাঁচা বিন্নাব জ্বাল চট্ পট্ ওঠে
ওগো আডাই কুড়া জ্বালে বেউলার লোহার কলাই ফুটে।
তখন লড দিয়া (দৌড দিয়া) সুমিত্রা বেউলাকে নিল কোলে.
ওগো লজ্জা রক্ষা হ'ল মাতা তোমাব কারণে।
বার্কী যা নিয়া গেল কামার তখন বেনিয়ার ঘরে
তারপবে সবে ফিরে চলে ঘরে।

লক্ষীন্দরের বিবাহ।

বিবাহে বৈচিত্র্য কিছুই নেই। দু'পক্ষই সমান ওজনের ধনী ও সম্ভ্রান্ত। কাজেই আর পাঁচটা রাজ রাজরার সভাব মতই এখানেও একই অবস্থা। কিন্তু

পূর্ববঙ্গীয় প্রথানুসারে বাসী বিয়েই আদত বিয়ে। কারণ, কুশণ্ডিকা না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ শাস্ত্রীয় মতে সিদ্ধ হয় না। এই কুশণ্ডিকা কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাহের রাত্রেই শেষ হয়, কোন কোন জায়গায় তার পর দিন অথবা বরের বাড়িতে ফিরে গিয়েও হয়। এই কুশণ্ডিকা বা বাসী বিয়ের খরচা সাধারণতঃ ছেলে পক্ষীয়েরই। তাই বড় বড় বিবাহ ব্যাপারে অনেক সময় কুশণ্ডিকাটা ছেলের বাড়িতেই হয়।

এক্ষেত্রেও দেখছি, লক্ষীন্দর বিয়ের পরই চলল নিজের দেশে, বেহুলা চলল তার শ্বশুর বাড়ি, স্বামীর ঘর করতে। এখানেই হবে তার বাসী বিয়ে—সীমন্তে ধারণ করতে শুরু করবে এয়োতীর চিহ্ন ঃ—

প্রভাতে উঠিয়া লখাই হরিষে বিষাদ
বাসী বিয়ার সজ্জা তখন করিল বিশেষ।
স্নান করি লক্ষীন্দর বসিলেক ভূমে
সঙ্কট কালে এনে দিল সোনাই পণ্ডিত,
স্বর্ণের দোলা খানা নিলো বিগুমান
যাত্রা করিয়া লখাই করিল পয়ান।
ওগো বেউলার মায় কান্দে হবে তার বিয়ে
বেউলা বলে মা তুমি না কান্দিও আর
কন্যা জন্মিলে মাগো দুঃখ অপার।
কন্যার দুঃখ এইত বাড়িল অধিক
কান্দিতে কান্দিতে লোক বাড়িবে অধিক।
তোমার কাছে আমি আর কী কহিব অধিক
সিদ্ধ হবিদ্রার মেলে পাও তবে জেনো ভালো আছে মা
নইলে আমার প্রাণ নাই।
তথা হ'তে চলিল মাণিক লক্ষীন্দর
তড়িতে চলিতে গেল চম্পক নগর।
দোলার কাপড় তুলিয়া বেউলা শ্বশুরের রাজ্য দেখে
দ্বাদশ জন বিধবা নারী দেখিলা সম্মুখে।
দক্ষিণেতে শিয়াল দেখে, বামে দেখে সাপ
তাহা দেখে বেউলার নয়নে এলো জ্বালা।

তখন এমন নানা মতে এমন দেখিলাম বটে
তুই মাসে চম্পক নগবে হল উপস্থিত।
চম্পক নগবে এল লখাই বেউলা তুই জন
জয় জোকাব দিল এসে যত নাবীগণ।
তখন বেউলাব কনিষ্ঠা অঙ্কুলী ধবিয়া লখাই
অমনি চলিয়া গেল লোহাব বাসবে।
চাঁদ বেড়িল লোহাব ঘব ঘিবে নানা অস্ত্র সাজি
ওগো শত শত ময়ুব থুইল, শতে শতে বেজী।
উপবে তরুযা তলা নামে প্রহাবি
প্রহবে প্রহবে বেড়ে শাঁখে ভবি।
এখানে কাশী তৈযাব—শিব আলপনা
লোহাব গৃহে বাখি এল বেউলা লক্ষীন্দব।
ভাজুধ নামে এল চাঁদ বাক্য কব খান
তবাসে পলাইযা যায় গজমতী হাব।
প্রহবিযা ঘবে গেল সদাগব
লখাই বলে ওগো বেউলা আমাব প্রাণ বক্ষা কব।
লখাই বলে ওগো বেউলা শাহেব কুমাবী
কাল বাত্রি না খেলাম তোমাব বাপেব বাড়ি।
আমাব ক্ষুধায প্রাণ যায লোহাব ঘবে
দেহ বেঁধে শীঘ্র কবে।

এইবাব নাটকেব চবম মুহূর্ত। নব দম্পতি নূতন সুখেব চিন্তায বিভোব। এমন সময় লোহাব ঘবে ক্ষুধা পায লক্ষীন্দবেব। কিন্তু ওখানে না আছে চাল, না আছে চুলো। এমন অবস্থায় বেহুলা কিইবা কবে? :—

নাহি লবন নাহি তেল ভাবিল তখন
বিষাদ ভাবিয়া বেউলা যুড়িল ক্রন্দন।
ভাবিতে চিন্তিতে বেউলা গো
ওগো বেউলা গো হল বড জ্বালা
তখন মঙ্গল ঘটে দিল বেউলা কিছু চাল
তখন মাজ কাটাই ছিড়ে বেউলা গো

ওগো বেউলা গো কাটিল ত্রিহাবী
অবলাবে স্মরিয়া মনসার পদে নামাইয়া দিল হাঁড়ি।
উঠিয়া রন্ধন করে বেউলা সুন্দরী
বন্ধন করে বেউলা রমা গো,
উনানেবে লয়ে জ্বাল—ঘৃতেতে ভাজিয়া লইল
সওয়া পবিমাণ।
জল হাতে নিয়ে লখাইর চক্ষে জল দিয়া বলেগো
বেউলা বলে উঠ প্রাণেশ্বর—
আমি সুধা অন্ন রেধে থুইলাম হইল কড়্ কড়্।
অন্ন দেখিয়া লখাই গো, মনে মনে ভাবে
তখন, ভোজন করিল যেন মাস উপবাসী।
ভোজন কবিয়া লখাই করে আচায়ন
কর্পূবে তাম্বুলে করে মুখ শোধন।
লখাই বলে ওগো বেউলা আমায় পাখাব বাতাস কব
শোনগো নাড়িলে পাখা ওগো বেউলা আনিয়াছে
পায়ে ধবিয়া বেউলা লখাইকে বুঝায়
ও মনেতে প্রবোধ পেয়ে লখাই সুখে নিদ্রা যায়।

লক্ষীন্দব ভোজন শেষ কবে ঘুমিয়ে পড়েছে। বেহুলা বসে পা টিপে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে তা'বও ঝিমুনি এসে যাচ্ছে। ঘরেব বাইবে চাঁদ সদাগব নিজে হেতালেব লাঠি নিয়ে ঘরের চারিদিক ঘুরে ঘুরে পাহাবা দিচ্ছেন। তা ছাড়া, ময়ূব, নেউল যে কত আছে এবং বাসব ঘরের অন্ততঃ পক্ষে এক মাইলেব মধ্যে সিপাহী, শান্ত্রীরা সব মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে। সাপ আটকাবার ব্যবস্থার কোন ত্রুটিই নেই।

এদিকে মেঘ লোকে পাষাণের ঘরে পাথরের সিংহাসনে বসে আছেন দেবী মনসা। চাঁদের এই সব আয়োজন দেখে তিনি ক্রমান্বয়েই কুপিতা হয়ে চলেছেন। তিনি কী যে কববেন কিছুই যেন ঠিক করে উঠতে পাচ্ছেন না। তাই ডাক দিলেন তার সহচরী নেতাকে। নেতা ধোপানী মনসার সহচরী আজ্ঞাবাহী। মনসার ডাকে এসে পৌছলে সে মনসাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে কালবাত্রি উপস্থিত,

এই সময় মধ্যে যদি লক্ষীন্দরের প্রাণ সংহার না 'করা যায় তবে তা' আর হবে না :—

প্রবোধ পেয়ে লক্ষীন্দর সুখে নিদ্রা যায়
নেতের সঙ্গে যুক্তি করে শ্রীমনসায়।
নেতা বলে পদ্মাদেবী এই ত' সুসময়
বাসী-বিয়ের রাত্রিতে হবে লখাই নিধন।
এ কথা শুনিয়া জুড়িল সকল
উনকোটি নাগকে গুয়া পান দিয়া পদ্মা
বসে বসে ঘন ঘন ডাকে।
চাঁদের সাথে বিবাদ আমার বাধিল দেবী নামে
আমি ছয় পুত্র মারিলাম বেটার কিছু নাহি চিং
কোন মতে না পারিলাম চাঁদকে পরাজিতে
লক্ষীন্দরকে দংশন করে তোমরা করহে নির্মূল
তবে সে তোমরা আমার প্রাণ সমতুল।
অসময়ে কালিয়া নাগ তোমায় করিবে উদ্ধার
তোমার ধামা ধোরা চলে যায় কালিকে আনিবার।
বসিয়া গুয়া দিল ধামারি তথায়
গুয়া নিয়ে ধামাই তখন চলিল কালীদহে।
কতদূরে গিয়ে ধোড়া দোয়াড়ে দেখে মাছ
ধরাতে না পারে প্রাণ করে সাত পাঁচ।
ধামার বাক্য না শুনিয়া সে দোয়ারেতে যায়
কোনে কোনে সব মাছ বসে বসে খায়।
মৎস খেয়ে পেট অমনি করিল ডাঙর
বাহির হইতে না পারে ধোড়া হইল ফাঁপড়।

এইবার নাটকের চরম মুহূর্ত। ধামা দেখে ধোড়া'ত ঐখানে আটকে পড়ল, সুতরাং সে একাই চলল কালিয়া নাগকে খবর দিতে।

ধামার কাছে সব শুনে নিয়ে কালিয়া নাগ এসে দংশন করল লক্ষীন্দরকে :—

একা কেমনে যাব কেমন সংসার
ফিরে যদি ঘরে যাই মনসারে করি ভয়
অপমান করবেন পদ্মা করাল করলে।

আমি সাহস করিয়া যাব কালীদয়।
কালী কালী বলে ধামা ডাকিল তখন
কষ্টে পড়িয়া তখন উঠে কাল নাগিনী।
এক ডাক দুই ডাক দিল ততক্ষণ
তিন ডাকে ধামাইর দিল দরশন।
তখন ধামাই দেখে আচম্বিতে
নাগিনী হল না জানি কাজের কি বা সঙ্কটে মানুষে।
ধামাই বলে শোন কথা
আমি যে কার্যে এসেছি হেথা,
ও মাসী গো দেবকলে প্রমাদ গো
ওগো মনসার বিষম জ্বর
ওগো লড়িতে চড়িতে না পারে
ও মাসীগো দেখ্‌বা যদি সত্বর চলো।
তারা জলে স্থলে পাঁচ ভাই
কারও ধৈর্য সহ্য নাই
নাগ্‌ পেলে বধিত পরাণ।
ওগো পদ্মজন সাথে
পদ্মার চরণ মাথে
বার্তা পেয়ে কালী নাগ চলে।
ধামার সাথে কালী করিল গমন
উপনিত হল গিয়ে পদ্মা দরশন।
কালীকে দেখিয়া পদ্মা চমকিত মন
গৌরব করিয়া দিল বসিতে আসন।
(বলে) আমি চাঁদের ছয় পুত্র শেষ করেছি
তার বক্তে বাগান ভস্ম করেছি।
পরে বেটার সাঙাত ছিল ওঝা ধন্বন্তরি
তারও ধ্বংস করেছি জয় বিষহরী।
পূর্বে অঙ্গিকার করলে তুমি আমার স্থানে
আমি অসময়ে পড়েছি কার্য কুলাও এইক্ষণে।

বাসরের ঘরের কথা তখন কাহল সকল
অমনি তূণীতে জুড়িয়া দিল বিষ অষ্ট পণ।
ছয় থলি বিষ রেখো নিজ লহবে
দুই থলি বিষ ঢেলো লক্ষীন্দরে।
বিষ খেয়ে কাল নাগিনী বিষেব ত্বেজে ঢোলে
শতে শতে যেন তার মুখে আগুন জ্বলে।
লেজ বাড়িয়া পাক্ দিল কালী নাগ
কণ্ঠগস্ত হ'ল বিষ হ'ল এক আই।
দক্ষিণ ধারেতে গিয়া তখন মোমেব গন্ধ পায়
সুতা প্রমাণ হয় কালীনাগ ঘবে প্রবেশ হয়।
চিন্তা করে কালীনাগ লখাইব দিকে চাইয়া
কেমন করে দংশিব আমি এ শিশু প্রাণ।
ক্রোধ করি কালী নাগ উঠিল জ্বলিয়া
অমনি রাখিলেক নাগ চিন্তা প্রচাবিয়া।
আর বার কালীনাগ লখাইব দিকে ফিবে চায়
আর বার কালীনাগ লখাইব যৌবন ফিবে চায়।
এর পব লক্ষীন্দবেব পাও লাগল নাগেব মাথায়
আব কালী বলে লখাই তুমি দুঃখ দিও কেনে
আমি এ দোষ ক্ষমিলাম মন্ত্রপুবে লোচনে।
আর বাব কালীনাগ শিথান দিকে যায়
লক্ষীন্দরের হাত লাগল নাগেব মাথায়।
এই না দোষ পেয়ে লখাই তোমাকে জানাই
আমার কোন দোষ নাই,
ধর্ম তুমি সাক্ষী থাক, যত দেব গণ,
চন্দ্রাদেবী সাক্ষী থাকে অনলের কারণ।
অনল অর্পিল সাপ যত যাহা ছিল
শয্যা থেকে যেতে যেতে বলে 'সাক্ষী থেকো পদ্মা'
সু-বুদ্ধি ঘটে নাগের মাথায়।
যাবার আদেশে লখাইর সাজ চেনা যায়

পদ্মা বলে কালীনাগ এইকি তোমার কাজ
তোমাকে পাঠায়ে আমি পেলেম বড় লাজ।
পদ্মার কথায় কালীনাগের অমনি বাড়ে ক্ষোভ
শুক্‌না কাঠে দিল যেমন কুড়ালের কোপ্।
হু হু করিয়া উঠে ধরিল ঊর্মিপর
অমনি হাতের কাটারী পইল লেজের উপর।
অষ্ট আঙ্গুল লেজ তখন কাটারী ক'রে কাটে
সার্ সার্ করে নাগ বের হল পাছে।
লেজের রক্ত পড়ে যায় আহা কান্দিতে কান্দিতে
মনসার নিকট গিয়া লাগিল উৎসিতে।
কালীদয় সাগরে আছে আমার পাঁচ বেটা,
কাটা লেজ দেখাইয়া আমাকে দেবে খোঁটা।
'আজ হতে যে নাগ করিবে দংশন
তোমার মতন হবে তারও লেজ নিধন।'
কালীনাগকে বলে পদ্মা কালীকে কুমার
চৈতন্য পেয়ে লখাই বেউলারে সুধায়।
ওঠো ওঠো প্রাণ বেউলা সুন্দরী,
এখন আমি কাল বিষে এলাই ওগো জ্বালায় মরি।
কোথায় রইল মাতা পিতা, কোথায় প্রহরী
ওগো এখন কী বলিব মায়ের কাছে পোহাইলে রজনী।
সাধেতে করলাম বিয়া বিষম ঝকমারি।
ওগো আমায় জন্মের মত বিদায় দেও শেষ করিল বিষহরী।
এক দিবসের লাগি হলেম তোমার বধের ভাগী
ওগো আমায় দুঃখের জ্বালা দিওনাকো
ওগো শাহের দুলারী।
না জানি কামড়াল কোন সাপে গো
উঠ প্রিয়া শশীমুখী, জীবন্তে তোমারে দেখা
শোন গো আর না হইবে দরশন গো।
উঠ প্রিয়া মোর কাছে, যাবৎ চৈতন্য আছে

বেউলা গো—থাকে যেন কাল সদাগরও।
আমার কণিষ্ঠ আঙ্গুলে ঘা, নড়িতে না পারি গো
কাল-নিদ্রা যাও কী কারণ।
(তখন) ঠেলে ফেলল লক্ষীন্দর উত্তর শিয়র
বেউলা তখন পাইল চৈতন্য।

সব শেষ। লক্ষীন্দর আর ইহলোকে নেই। বেহুলা হয়ত বা একটু ঘুমিয়েই পড়েছিল। চলিত প্রবাদ অনুসারে স্বামীর মৃত্যুর সময় স্ত্রীর চোখে হয়ত এই রকমই গাঢ় ঘুম আসে। কালিয়ানাগ যে কখন এসে লক্ষীন্দরকে দংশন করে চলে গেছে তা' সে টেরও পায়নি। লক্ষীন্দরের ধাকায় যখন সে জেগে উঠল তখন দেখে বাকী আর কিছুই নেই। লক্ষীন্দরেব সোনাব বর্ণ গেছে কালো হয়ে। পদ্মের মত নরম গা আস্তে আস্তে হয়ে উঠ্‌ছে কাঠ। এইবার তাই শুরু হয় বেহুলাব বিলাপ :—

'ওগো জীবন থাকতে কেন ডাক দিলে না
ওগো প্রাণনাথ।
ওগো হায়রে আমার প্রভু মইল
কেন ডাক দিলে না।
জাগো ওগো, জাগো তোমরা
ওগো কেন নিদ্রা যাও।
বিষেতে ঢলিয়া পড়িল গো
তোমরা কেন জাগো না।
বিষেতে ঢলিয়া মরিল চম্পকের রাজা
কেন দেখা দিলে না।
বেউলা বলে শ্বশুর শাশুড়ী
তোমরা সবাই জাগো।
বেউলা বলে চন্দ্র সূর্য
তোমরা জাগো।
বেউলা বলে দিবা রাত্রি
তোমরা জাগো।

বেউলা বলে অভাগিনী
প্রভুরে কামড়াল কোন সাপে ?'
হায়রে বলিয়া বেউলার
বাড়ে কান্নার ধ্বনি,
ঘরে হতে শোনে সেনকা সাউকালী।
সেনকা বলে ওরে প্রভু শোন বিপরীত
লোহার ঘরে ক্রন্দন কেন শোন আচম্বিত।
মায়ের প্রাণেতে যেন এলো কালদূত
বুকে ঘা দিয়া সেনকা বলে ভগবান
লাথি মারিয়া কপাট ফেলাইল দূরে
সোনা কান্দিতে কান্দিতে গেল লোহার বাসরে।
ছেলে সুখের পড়ল লখাই পড়িছে বধিয়া
কাদিতে লাগিল সোনা পুত্র কোলে নিয়া।
ওমা বলে কে ডাকে মোরে
তুমি একবার কোলে এসো আমার লখাইরে।
পূর্বে মোর ছয় পুত্র মৈল, সোনার রত্ন ছিলি,
পূর্বে ছয় পুত্র মৈল রূপেতে পরশমণি।
ছয় বধূ জুড়িয়া কান্দে থাকিতে না পারি
তুমি একবার কোলে এসো পাণ (প্রাণ) লখাইরে।
আমি কারবা করলাম চুরি সোনার পুতুলী
ওগো পুত্রচোরা বলে আমায় কে বা দিল গালি,
তুই এসো আমার লখাইরে।
খেলাইতে গেছে সে পাছনী হাতে লইয়া
তুমি বিজয় করিতে গেছ ঘোড়ায় চড়িয়া।
ভোজন করিতে গেছ ভাণ্ডারের ঘরে
তুমি বিবাহ করিতে গেছ উজানী নগরে।
লখাইর হাতের বাঁশী, কার বা হাতে দিব
ওগো চন্দন কাজল দিয়ে কার মুখে চাব।

কাঁদিতে কাঁদিতে হ'ল তুই প্রহর বেলা
চাঁদ বলে কেন কাঁদ অভাগী সেনকা।
কাল আমি শায়ের বাড়ি খবর দিয়াছি
সুখে অন্ন খেতে আমায় দিবে না বিধাতা।
আমি ভাল মৎস আনি করিলাম রন্ধন
আজ কাল দেখ সোনা তোমার ঋতু ভোল
এই ঋতুতে হবে তোমার আর এক ছাওয়াল।
তোমার আশায় যদি জীবিত থাকেন গোঁসাই
পাছে জোতা থাকিলে ফলেব নাই অভাব।
সোনা বলে পাপিষ্ঠের না ঘুঁচিল আশ
কাটা ঘায়ে দেও কেন নেবুর রস।
সে বধূর ঠাই আর মাকে কী জানাব
বিষ খেয়ে মডিব লখাইর সাথে।
শ্বশুবের বচনে বেউলা তখন মনে পেয়ে ভয়
যাত্রা মোর করে তখন ব্রাহ্মণ সম হয়।
পূর্ব কালের কথা যত কইছে বুড়া বুড়ি
স্বর্পাঘাতে মইলে পরে না তা'রে পুড়ি
জলেতে পড়িলে যথা তথা যায়
উপযুক্ত মুক্তি পেলে তাতে বাঁচি যায়।
তখন নাগেশ্বর মালী ছিল বেউলার সঙ্গী
তার কাছে গিয়ে বলে বেউলা সুন্দরী।
নিকটে এসো মালীপুত্র আমি তোমার মা
আমার বাপের দেশে তোমার বাড়ি
আমার নিজ গ্রাম
দৈব যোগে সর্বনাশ, শক্ত করে
আমায় একটি ভেলা বাঁধিয়া দিয়া
আমার কর উপকার।

বেহুলা যখন কিছুতেই কারও নিষেধ মানতে চায় না তখন ছুতোর আর কী করে। বাধ্য হয়েই সে বেহুলার আদেশে ভেলা বানাতে বসে ঃ—

বেউলা পাঠালো আমায় সাজাতে ভেলা
আজ্ঞা করো সদাগর কাটিব কোন্ কলা গাছ
চাঁদ বলেন কলা নাহি দিব পূজিব কিসে ?
সবরি কলা নাহি দিব দুধে ভালো,
আনাজী কলা নাহি দিব তরকারী হয়,
কোন কলা দিবে চাঁদ ভাবিছে হায় হায়।
রাম কলা গাছ আছে আমার কলার প্রধান,
সেই কলা দিতে চাঁদ বলে বিদ্যমান।
ষোল গাছি কলার বাছিয়া লইল খোল,
তার দুই পার্শ্বে লাগাইল বড় বাঁশের খিল।
চার পাশ ছাউনী উপরে বাঁধে ম্যারাপ,
শুধু পুষ্প দিল নাহি দিল খড়
সহস্র প্রদীপ দিয়ে তুলিল ভেলাতে
খাট এক অতি অনুপম
ভেলা ভাসে নদীতে।
ছয় পুত্রবধূ এসে দিল দরশন
পিছন হ'তে কেহ কেহ করে নিবারণ।
কেহ ধরে বেউলার হাতে কেহ বা ধরে পাও
এ বয়সে যাইবা পরবাসে একেলা,
বেউলা তখন ডেকে কয়—দিদি,
আমায় তোমরা বারণ কোরো না।
আমি এই প্রভুর সনে চলিব এখনে
মনে করেছি বাসনা।
আমি করেছি সাবিত্রী-ব্রত
দিয়া তার চরণের দোহাই
চেষ্টা করে দেখি প্রভু আমার
পাই কি না পাই।
আমাকে নিষেধ দিদি কর কোন্ কথায়
আমি সাধ্যাসতী হলে তার পতি কী যায় ?

প্রমাণ অশ্বাবতী রূপে গুণে ধন্যা
সাবিত্রী আছিল তার নাম।
বরণ করল সত্যবানে কম আয়ু জেনে
তবু পূর্ণ হল তার মনস্কাম।
এক বৎসরের পরে সত্যবান যবে মরে
এই কথা ঋষি জানেন
কহিছে সাবিত্রী ধনি ভেবেছো সত্য নাই
আমার পতি ভালো
হল দু'জনে পরিচয়
সত্যবান—চলে দিন যায়
ওগো সেদিন যবে বর্ষ পূর্ণ সাবিত্রী পেরে ছিল
অমনি সতী সাবিত্রী পিছে ধায়।
পতির সাথে গেল চলে, গেল কাষ্ঠ আহবণে
উঠে বৃক্ষে কাষ্ঠ আহরণে।
দৈবের কারণ পূর্ণ হল শিরঃ পীড়া হল তখন
ডেকে বলে সাবিত্রীরে আমাকে ধর এখন।
অমনি স্বামীরে করিয়া কোলে বসিলেন ঠাঁই
তখন এল সত্যবানের কাল
বার্তা পেয়ে বারীসুত পাঠাইল নিজ দূত।
চলে সত্যবানের আত্মা নিতে যম,
চলিল সব যম দূত—নিতে সত্যবানে
ওপার হতে সতীর দিকে চায়।
ঘষে আসে বৃক্ষ মূলে সঙ্গে লেন সেঁজ জেলে
দেখতে যেন অগ্নির কুণ্ডলী প্রমাণ।
চর্ম ভুরি করে মহিষের ষাঁড় চড়ে যমরাজ
দিল দরশন এসে বলে সতীর ঠাঁই।
মাগো মরা নিয়ে বসলে কী কারণ
কাল পূর্ণ হলে পরে সবাই আবার
হইতে পারে তোমার পতির মত।

কাল পূর্ণ হল এবে ছেড়ে দাও
পতি দিয়া সমনেরে সাবিত্রী যাবে ঘব
যম রাজা দিলেন অনুমতি।
ওগো সত্যবানেব আত্মা লইয়া
যম রাজা যাইছে ধাইয়া
সঙ্গে সঙ্গে চলে সতী।
যত দূর যম যায়, পাছে ফিরে চায়
সাবিত্রীরে করে দরশন।
বলে মাগো আমাব কথা মান,
পাছে পাছে আস কেন
মবা দিয়ে কী প্রয়োজন ?
বলে সাবিত্রী, ধর্মরাজ,
আমাব শ্বশুরের আমি ছাড়া আব কেহ নাই।
মীন কভু বাঁচে কি জল ছাড়া
জল বিনে বাঁচে কি কোন জীব ?
আমার পতিব আসার সাথে সাথে
আমার সবই পড়ে আছে স্বামীর সাথে
পতি বিনা আমি কভু পারি কি ঘরে যাইতে ?
বলো বলো ধর্মরাজ এ কাজ কি কবেছি অন্যায়।
সত্যবানের জীবন দিয়ে যে বেদনা তোমাব প্রাণে
মানি সত্য,—অন্য যে কোন বর চাইয়া লও।
সাবিত্রী কয়, যেন আমার শ্বশুরের চোখ পায়
এই বর দাও।
যম বলে যাবে শ্বশুর ঘরে।
আজ্ঞা দিয়ে যম যায় পাছে সতী দেখে
মাগো আমার কথা মানো,
আর কেন আস আমার পিছে পিছে।
সতী বলে যম,তোমার কথা ধার্মিকের নয়,
কে দেখেছে এ পৃথিবীতে আয়ত ছাড়া কে আছে

প্রাণপতি আমার কায়া তুমি কায়া দিলে
কায়া বীর বলে।

কায়া যখন চলে গেছে
ছায়া তার পিছে আছে
তবে কায়া ধরে কেন দাও টান ?
আমার আজি মন্দভাগ্য,
শ্বশুর শাশুড়ী সন্দ
তারা পায় যেন দৃষ্টি শক্তি
এই নিবেদন তোমায়।
আজ্ঞা দিয়ে যম যায় পাছে ফিরে চায়
আবার করে সতী দরশন।
বলে, 'এলেম রৌরব নগরে
তবু কেন আস আমার সঙ্গে ?
যাও, মনের কথা মনে আছে
আমার সঙ্গে আস কেন
তোমার কী কোন বিচার নাই ?'
'আমার হাতে প্রেমের লাটাই ঘুড়ি
তুমি দূরে নিয়ে যাও ঘুড়ি লাটাই লইয়া
ধরে দেও টান আমি কি আর রইতে পারি,
আমার প্রতি কেন কর আন'।
সতী বলে যমের ঠাঁই,
বর যদি দিবে শুন আমার সুখের সীমা নাই।
আমাকে দাও এই বর যেন হই শত পুত্রের মা।
তথাস্তু বলে যম বর দিয়ে মরা নিয়ে চলে
সাবিত্রী কাছা ধরে বলে, কোথা যাও চলে,
এই মাত্র বর দিলে এখন কেন স্বামী নিয়ে যাও ?
এতেক শুনিয়া যম ফিরে দিল প্রাণ,
সতী সাবিত্রী যবে ঘরে গেল, ধন্য ধন্য রব পইল
সকল দেশের মধ্যে।

এইবাব বেহুলাব যাত্রা হ'ল শুরু :—

ছয় বধূ তখন কবে নিবেদন,
তখন বেউলা বলে, ঠাকুবাণী স্বামীব জননী
তোমাব সেবা না কবিলাম আমি অতি অভাগিনী
এই পত্র লিখিলেন বেউলা
পত্রেব উপব পদ্ম, ভাবে বেউলা অন্তব
শ্বেত কাক রূপে এল নেতা ধোপানী
পত্র ফেলিযা বেউলা দিলেন আপনি।
ঠোঁটে কবিযা পত্র উডিল সত্বব
উডিযা পডিল পত্র উজানী নগব।
সুমিত্রা বলেন পুত্র মোবে কেন ধব
বেউলাকে আনিযা আমাব প্রাণ বক্ষা কব।
বুন বুন বলিয়া চাবি ভাযে উচ্চৈস্বরে ডাকে
ভেলায় থাকিযা বেউলা একদৃষ্টে চায
হবি সাধু ব'ল বেউলা গো তুই ফিবে ঘবে আয
তোমাব জন্য কেঁদে আকুল হ'ল আমাব মায।
আমবা পুডিযা ফেলিব লখাই চন্দন কাষ্ঠ দিযা
তোমাকে বাখিব বেউলা যতন কবিযা।
বেউলা বলে 'হবি সাধু না বলিও আব
স্বামী বিনে স্ত্রী লোকেব গতি নাহি আব।
সংসাবে স্বামীব গৃহ সুখ নিকেতন
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সকলিই এই পবাণ।
কেহ দিবে গালাগালি কেহ দিবে হাঁডি
ছয় বধূ খোঁটা দিবে বেউলা কাঁচা রাঁডি'।
ব্যস্ত হয়ে হরি সাধু বেউলায় ধরতে যায
বেউলা বলে পদ্মা কোথায় ?
পদ্মাব মায়ায় ঢেউ হইল সত্বব
জল খেয়ে হবি সাধু হইল ফাঁপব।

বেউলা বলে পদ্মাবতী তোমারে বন্দি
এবে আমার ভাইর প্রাণ রক্ষা কর।
বেউলাব বোলে পদ্মা না করে আন
ঢেউতে ঢেউতে ফেলিল নিয়ে কূলে।

বেহুলা চলেছে দিনের পব দিন ধরে। একে একে ছাড়িয়ে গেল কত দেশ, কত পথ ঘাট। এরই মধ্যে এক সময় এসে ভিড়ল ধোনা মোনার ঘাটে। ধোনা জাতে জেলে। মাছ ধরে, আর তাই বেচেই তার দিন চলে। নদীতে রূপসী বেহুলাকে দেখে তার সাধ যায় ওকে বিয়ে করতে :—

না'চেরে সারিন্দা গোদারে।
আমি এই ঘাটে মৎস ধরি কইলাম তোমায়
এই ঘাটে কত লোকে আরও মৎস চায়
ইহার সমান মৎস কেহ নাই পায়।
মরা স্বামী নিয়ে কেন ভেসে চল
ওগো মরা কোলে করে কেন পাও এত দুঃখ
ওগো তোমার সাত পুরুষ বসে করো নানা সুখ।
তুমি পাছে ভাবলো সতীনের বড় ঘটা
তুমি খাইও ভাল মাছ আমারে দিও কাঁটা।
ঢেপেব বিচি পান্তা ভাত রইয়া রইয়া খাইও
ভুটি টানাইয়া দিব সুখে নিদ্রা যাইও।
তুমি পাছে ভাত খাইও গোদার নাইকো কিছু
একুশ খানে পুতে এলাম চৌদ্দ মন ঘেচু।
অকালে পাকলে তুমি সেই ঘেচু খাইও
ঘেচু ফুরাইয়া গেলে বাপের বাড়ি যাইও।
তুমি পাছে গোদার জয় ফল
রাত্র হলে তুমি আমার গোদে দিও কিছু তেল।
তুমি পাছে ভাব গোদার নাইকো ধন
একুশ খানে পুতে এলাম কড়ি চাইর পণ।
চার পোণ কড়ি তার দুই পণ ব্যাজ,
উহার থিকা কিছু কিনা দিব শিরোমনি কাঁচ।

শিরোমণি কাঁচে দিব বান্দারি আলে পার
ওগো ফুলের ধুনিতে যেন জন্ম জন্ম করে।
এক পুত্র আছে গোদাব সেওত' অবোধ
হুয়াব দেয়না বাহির হয়না তার চার গোঁজ'।
বেউলাকে ধবিতে গোদা সাঁতার দিল জলে
পদ্মা পদ্মা ভাবে বেউলা নিজের অন্তবে।
ঢেউব উপবে ঢেউ হইল সত্বর
জল খাইয়া গোদা বেটাব হইল ফাঁপব।
ভাসা ফল পাইয়া গোদা কার্যে দিল ছুটি
বলে প্রাণ বক্ষা কব মাগো আমি তোব বেটা।
বেউলা বলে পদ্মাবতী তোমাব অতি দয়া
প্রভুব কল্যাণে গোদাব প্রাণ রক্ষা কব।
বেউলাব বাক্য গোদা না কবে আন
ঢেউয়েতে ঢেউয়েতে গিয়ে উঠিল ওপাব।
বেউলাব বাক্য লঙ্ঘিতে না পারে মনসা
হিল্লোলে হিল্লোলে নিয়ে গোদায কূলেতে ফেলায়।
এইরূপে এই ভাবে যায় পুনঃ পবে ডাক
তড়িতে পড়িল গিয়ে নেত্রাবতীব বাঁক।
বেউলা ডুবে গিযে ধবিল পায়
ত্রাসে ডাকে নেতা 'কোথা গেলে ধনপতি
সত্বর চলে আয়'।
নেতা বলে অবোধ পুত্র তুমি কব কী
দূব হতে এসেছে বেউলা হয় আমার বুনঝি।
আমাব বোনঝি হ'লে তোমার হয় বোন
তুমি তাকে বল্লে কী?
মায়েব বাক্যে ধনপতি লজ্জা পেয়ে
গেল একদিক
বেউলাকে দেখিয়া নেতের দুঃখে বুক ফাটে
দুই জনে কয় কথা সব কিছু তার।

রাত পোহালে বস্ত্র নিয়ে চলে কাচিতে
নেতা হতে বেউলার ছিল অনেক গুণ
তার জন্যে দিল খুলে চুল।
মল পাড় শাড়ির মধ্যে দিল সব পরিচয়
মরা পতি নিয়ে স্বর্গে এসেছে আজ উষা
পরীক্ষার জন্য আজ প্রস্তুত হইও মা মনসা।
ত্রিশ অক্ষরে লিখে মনসার স্তব
পরে বস্ত্রের ভাঁজেতে তাহা দিল যতন করে।
দ্বিতীয় প্রহর বেলা হল তাই
বেউলা বস্ত্র নিয়ে গেল নেতের ঠাঁই।
বস্ত্র পেয়ে নেতা তখন হরষিত মন
একে একে দিল সকলের বসন।
শাড়ি খুলে পদ্মাবতী নিরখিয়া চায়
শাড়ির ভাঁজে বেউলার লেখা পত্র
দেখিবারে পায়।
পদ্মা বলে এত তুমি কেন কর মিছি
আমার শত্রুরে বাখিলা ঘরে মিতী।
পদ্মাবতী বলে মোর বোল ধর
তোর ঘর হতে এখন বেউলাকে দূর কর।
এ কথা শুনিয়া নেতা নিল পদধূলি
দূর হতে ডাকে নেতা বেউলা বেউলা বলি।
নেতা বলে বেউলা তুই অন্য স্থানে চল
তোর জন্যে আজ আমি না পেলাম
দেবকুলে স্থান।

বেহুলা স্বর্গে গিয়ে পৌছেছে। মনসার কথায় নেতা যখন তাকে অন্য জায়গায় যেতে বলে দিচ্ছে বেহুলা তখন বিলাপ শুরু করে :—

মাসী আমার প্রভুর প্রাণ দিয়ে যাও গো।
প্রভুর লইগ্যা ছয় মাস ধরে গো অন্ন নাহি খাই
প্রভুর লইগ্যা ছয় মাস ধরে গো নিদ্রা নাহি যাই ;

তোমাব ধোপা হয়ে গো—কাপড় কাচিলাম গো
তোমাব দাসী হয়ে গো—বাটনা বাটলাম ,
প্রতিজ্ঞা প্রভুব জন্য কবিয়া কবেছি সবখানি
আমাব প্রভুব প্রাণ দিলে খাব অন্ন পানি।

বেহুলাব কাতবোক্তিতে নেতা গলে যায়। সান্তনা দিযে বলে, যে কবেই হ'ক সে যাতে তাব স্বামীব প্রাণ ফিবে পায়, তাব ব্যবস্থা সে কববেই কববে।

নেতা মনে মনে ঠিক কবে, মহাদেব হল মনসাবও গুরু, যদি একবাব তাঁকে ধবা যায় তা' হলে হযত কার্য সিদ্ধি হতে পাবে। তাই তা'কে বলতে শোনা যায় :—

আমাব পুত্র ধনপতি সত্যে বড হয
তাহাব স্থানে আছে অনেক মৃদঙ্গ ,
কল্য প্রভাতে যাব মহাদেবেব স্থান
এ কথা বলিযা নেতা শয্যায দিল মন,
বলে বেউলা এখন এসে শয্যায দে মন।
হেন কালে সাজাইতে গেল সব বাত্র আছে অনেক
বেউলা বলে বাইবে যাব মুই।
নৃত্য কবে বেউলা বমা ঘন নাডে হাত
নৃত্যেতে মোহিত হইল ত্রৈলক্ষেব নাথ।
কোন গাইনে গান কবে তাবে ডাক দিযে আন
বহিঃ দ্বাবে কবে গান শুনিতে না পাবি আমি তান।
লক্ষকোটী স্বর্গ নর্তকী বস্তু না লাগে ভালো শিবেব
বৈকালী দেখিতে নৃত্য এখন শিবেব এমনিতব তানে।
বেউলাব মন হয় আনন্দিত
নৃত্যেতে মোহিত হলেন মহাদেব।
শিব বলে নর্তকী নৃত্য বন্ধ কব
মানা শুনে যা চাবি তাই দিব বব।
বেউলা বলে ঠাকুর, অমন
আলগা বরের কাজ নাই।
একবারে চাই দিবে কি না বল সত্য করে।

মহাদেব বলে এবে করিলাম সত্য
আঁচল পাতিয়া বেউলা
মাগে স্বামী বর
মহাদেব তথাস্তু তথাস্তু বলে দিলেন স্বামী বর।
আমি বুঝিতে না পারি কাশীনাথ তোমার লীলা খেলা
হরিয়েছেন মহাকাল লখাইরে, বুঝি সর্বনাশ
এই বুঝি প্রাণের কুমারী উষাহে।

এইবার বেহুলার নিজের পরিচয় দিয়ে স্বামীর প্রাণ নিয়ে ফিরে যাবার পালা :—

বেউলা বলে ঠাকুর শাপের ফলে
জন্মিয়াছি ক্ষিতি তলে
মনসা করেছে হেন দশা হে।
কাশীনাথ আজ তব লীলা খেলা,
পাকাল মাথার জটা ভার, বৃদ্ধ কালে পরদার
কিসেব জন্য জন্মিয়াছ দেব কুলে হে।
অতি দিব্য ধবে এমন নারী তোমার ঘরে
তাহার আমি দাসীর যোগ্য নই হে।
তুমি যে আমায় কাছে ডাক
কেমন করে স্পর্শ করবে মরেছে আমার স্বামী ;
অশুচি হয়েছি আমি, অশুচি ছুঁইতে নাই পারহে।
যেই লক্ষীন্দরের গতি সেইসে আমার গতি
অন্য পুরুষ বেউলার কে ?
শুনিয়া এসব বাণী লজ্জা পাইল শূলপাণি
কী দিবে উত্তর না আসে মুখে হে।
শিব বলে শোন ওহে নন্দী মহিমা
চট্ করে মনসারে আমার পুরে আন।
হেথা হতে নন্দী তবে করিল গমন
পদ্মার নিকটে গিয়া দিল দরশন।
নন্দীকে দেখিয়া পদ্মা চমকিত মন
গৌরব করিয়া দিল বসিতে আসন।

নন্দী বলে পদ্মা আমার বসবার কাজ নাই
তোমাকে নিতে মোরে পাঠালেন গোসাঁই।
তথা হ'তে নন্দী তখন কবিল গমন
শিবপুরে গিয়ে দু'জনে দিল দরশন।

এইবার উপসংহার। মনসা কর্তৃক লক্ষীন্দরেব প্রাণ দান ও বেহুলাব শ্বশুর গৃহে প্রত্যাবর্তন :—

মনসা দেবীর দয়ায় লক্ষীন্দর পায় প্রাণ
মনসা সহ দেবগণে প্রণমিয়া বেউলা ঘরে যান।
ছয় মাস পরে যখন লখাইর শ্রাদ্ধ উপস্থিত
হেনকালে লখাই সহ বেউলা আসে আচম্বিত।
মরা পুত্র ফিবে আসে শুনেছ কী কোথাও
ছুটে আসে রাজা রাণী, আসে লোক জন।
বেউলা বলে পিতা তুমি মোব কথা ধব
মর্ত্যালোকে তুমি দেবী মনসার পূজা কর।
এত শুনি চাঁদ বেনে বলে আক্ষেপে
যে হস্তে পূজিয়াছি শিব শূলপাণি
কেমনে পূজিব সেই হাতে আমি
চ্যাঙ মুই কানী?
আকাশ হ'তে দৈববাণী তখন বুঝি হয়
বাম হস্তে কর পূজা সন্তুষ্ট নিশ্চয়।
এত শুনি চাঁদ বেনে বাম হাতে দিল পুষ্পাঞ্জলি
আকাশ হ'তে পুষ্পবৃষ্টি ফিরে এল সকলি।
চাঁদের চৌদ্দ ডিঙা মধুকর আব মাঝি মাল্লা যত
আসিল নিমেষে তারা ভোজবাজির মত।
একে একে আসিলেক আরও পুত্র ছয় জন
আনন্দের ফোয়ারা তখন ছোটে ত্রিভুবন।

রয়ানী গানের এইখানেই শেষ। 'পদ্মপুরাণ' বা 'বাইশ কবি মনসা মঙ্গলে' বেহুলা লক্ষীন্দরের স্বর্গ যাত্রার বিবরণ থাকলেও রয়ানীকার আর সে পর্যন্ত এগুতে চায় নি। তার মূল কথা, চাঁদ সদাগরকে নিয়ে। কাজেই আমবাও এই প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ করলাম।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবী সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয় মুদীরয়েৎ ॥"

সাময়িক গানেব ভিতর 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী' অন্যতম। হিন্দুদের 'সত্যনারায়ণ' এবং মুসলমানদের 'সত্যপীব'কে অনেকটা 'কমন' দেবতা বলা চলে। এই দুই পুজোব ধরন-ধাবন প্রায় একই। তা' ছাড়া সত্যনারায়ণ পুজোয় মুসলমানদের উপস্থিতি এবং সত্যপীর বা মাণিকপীবেব শিবনিতে হিন্দুব উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই এই দুই দেবতা সম্বন্ধে উভয় সম্প্রদায়ই বিশেষ শ্রদ্ধাবান। এই পরিচ্ছেদে এখন আমরা 'সত্যনারায়ণ পুজোয়' গ্রাম্য যুবক ও প্রৌঢের দল একযোগে যে পাঁচালী পডে থাকে সে বিষয়েই কিছু বলব।

সত্যনারায়ণ পুজো সাধারণতঃ প্রায় প্রতি শনিবারেই কোন না কোন গৃহস্থের বাড়িতে হ'য়ে থাকে। এ পুজোর আরও একটি বিশেষতঃ এ পুজোর নিমন্ত্রণ কেউ পাক বা না পাক, কোন বাড়িতে এ পুজো হ'চ্ছে শুনলেই যেতে হয়। পুরুত ঠাকুরের পুজোর সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায় পাড়ার—অনেক সময় গোটা গ্রামের উৎসাহী যুবক ও প্রৌঢ়েরা একযোগে সম্মিলিত কণ্ঠে স্থর করে পডতে থাকে 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'। এই পাঁচালীর গল্প বা উপাখ্যান এক এক দেশে এক এক রকম হয়ে থাকে। এর কারণ এই পাঁচালীব রচয়িতা একজন নন। বিভিন্ন কবির ভিন্ন ভিন্ন উপাখ্যান ও বিভিন্ন ছন্দের ও স্থরের পাঁচালীই প্রচলিত আছে। কিন্তু মোদ্দা কথা সেই একই—এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কী করে সত্যনারায়ণের দয়ায় প্রভূত ধনৈশ্বর্যের মালিক হয়, পরে নারায়ণের কোপে তার সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট এবং পরিশেষে সত্যনারায়ণ পুজো করায় সমস্ত নষ্ট সম্পত্তি ফিরে পায়।

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পাঁচালীর গল্পাংশ তুলনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ আমাদের উদ্দেশ্য তা' নয়। আমরা দেখতে পাব শহর-সংস্কৃতি ও হল্লা হৈ-চৈ এর বাইরে থেকেও সেখানকার সরল প্রাণ পল্লীবাসীরা তাদের উপযোগী করে কী রকম কাব্য গাথার স্থষ্টি করেছিলেন, এরা নাম চাননি—তাই দেশ জোড়া নাম তাদের কোন দিনই হয়নি বা হবে না—কিন্তু ঐ সব পল্লী কবির পাঁচালীর প্রতিটি

ছত্র গ্রামবাসীদের কর্ণে অহরহই বাজতে থাকবে। তাদের কাছে তাদের গাঁয়ের কবির দাম অনেক বেশী। তাই পল্লীগীতিকা আলোচনার ব্যাপারে এঁদেরকে বাদ দিতে পারিনি।

এই প্রসঙ্গে এত কথা বলার জন্য আরও একটু বলে নেওয়া ভাল যে এই সব পাঁচালীকারগণ—নীলের গান রচয়িতা, রামায়ণ পালা গান, কৃষ্ণলীলা বা বয়ানীকারদের মত একেবারেই নিরক্ষর ছিলেন না। এঁরা অল্প বিস্তর ভাষা জ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন। এঁদের কাব্য থেকেই এ কথা পরিষ্কার বোঝা যাবে। এ বিষয়ে আর অধিক না বললেও চলবে।

আপাততঃ আমরা এর মূল ঘটনায় এসে পৌঁছতে চাই। মনে করে নেওয়া চলে, কোন এক বাড়িতে পুজো হচ্ছে। সেখানে জমায়েৎ হয়েছে পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো। তাদের কাছে খোলা রয়েছে সত্যনারায়ণের পুঁথি। তা' থেকে প্রথম একজন সুর করে পড়ে চলেছে, সে থামলে তা'র গানের পুনরোক্তি করছে বাকী সবাই। অনেকটা অন্যান্য পালাগান বা কবি বা তরজার পালট গানের মতই।

এরা জমায়েত হয়ে সুর করে পড়তে থাকে :—

আগে বন্দম্ গণপতি
পার্বতী নন্দন (ও হে) ॥

এরপর শুরু হয় ত্রিপদী ছন্দে সত্যনারায়ণের গুণ কীর্তন :—

বন্দি গজানন, বিঘ্ন বিনাশন হে
গৌরী সুত লম্বোদর।
জাপ্য মাল্য ধর, অভয়ার বর হে
শোভা পায় চারি ধার ॥
করীন্দ্র বদন, জিনিয়া মদন হে
কুসুমে বেষ্টিত তনু।
সিন্দুরে কী শোভা, জগমন লোভা হে
জিনিয়া প্রভাত ভানু ॥
সর্ব বিঘ্ন হর, তুমি সর্বেশ্বর হে
সর্ব আগে তোমায় পুজে।

তুমি গুণ ধাম, পূর্ণ কর কাম হে
যে তোমার চরণ ভজে ॥
যত মহাকবি, ও চরণ সেবি হে
প্রকাশ পুরাণে যত।
চারি বেদ সার, মহিমা তোমার হে
অপার কহিব কত ॥
কৃতাঞ্জলি করে, শত নত শিরে হে
প্রণাম তোমার পায়ে।
বাসনা মনের তুমি পূর্ণ কর হে
কৃপা করি গণ রায়ে ॥

এবপব শুরু হয় সত্যনারায়ণের বন্দনা গীতি ঃ—

অবনী লোটায়ে কায়, সত্যনারায়ণ পায় হে
বন্দি দেব দেবেব প্রধান।
চক্রপাণি অংশ ভূত, কে জানে মহিমা কত হে
দয়ানিধি পূর্ণ ভগবান ॥
অতি মনোহব রূপ, নিন্দি কত সুধা কূপ হে
অপূর্ব বসন যুগ্মধারী।
গলে দোলে মণিহাব, বিবিধ ভূষণ আব হে
ত্রিভুবন জন মন হারী ॥
গন্ধর্ব কিন্নরাপ্সর, সঙ্গে সব সহচর হে
মগ্ন সদা নৃত্য গীত গানে।
শ্রুতিতে কুণ্ডল শোভা, নিন্দি কত রবি আভা হে
রতন মঞ্জরী দু'চরণে।
শর শরাসন করে, অরি কম্প বাণ ডরে হে
বিক্রমে বিশ্বেতে নাহি সীমা।
অনাদি অনন্ত কায়া, কত রূপে কত মায়া হে
কেবা জানে তোমার মহিমা ॥
তুমি দয়া কব যারে, বিপদে ডরায় তারে হে
সেই সদা সম্পদ ভাজন।

যে তোমাব শবণ লয়, তাহার নাহিক ভয় হে
বণে বনে সমুদ্রে কখন ॥
দীন দয়াময় নাম, দয়া নিধি গুণ ধাম হে
দয়া কল্পক্রম মন পুব।
অকিঞ্চন দীন জনে, দয়া কব নিজ গুণে হে
বিপদেতে দয়াল ঠাকুর ॥
আশুতোষ নাম তব, কত গুণ কী বর্নিব হে
আমি অকিঞ্চন অভাজন।
দয়া কব গুণ ধাম পূর্ণ কর মনস্কাম হে
দীন হীনে সত্যনাবায়ণে ॥

এইবাব শুরু হল উপাখ্যান। পাঁচালীকাব 'তোটক ছন্দে' বর্ণনা কবতে লাগলেন কী ভাবে সত্যনাবাযণ মর্ত্য লোকে আবির্ভূ'ত হলেন :—

অতঃপব মর্ত্যে শুন এক চিত্তে
যে রূপে নাবাযণ প্রকাশিল মর্ত্যে ॥
পুবা স্বর্গ ধানী, লয়ে লক্ষ্মী বাণী
সদানন্দ চিত্তে আছেন চক্রপাণি ॥
কদাবাণী সঙ্গে, নানালাপ বঙ্গে
হ'ল গান উপাখ্যান প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে ॥
বলে লোল বাণী, কবে যোড পাণি
হয চিত্ত মধ্যে সুসঙ্গীত শুনি ॥
শুনি হৃষিকেশ, ঈষৎ হাস্য ভাষে
আন অপ্সবী জয় বিজয়কে আদেশে ॥
চল ব্রহ্মলোকে, বল সব দেবেকে
আন হব হিমালয় হতে পার্বতীকে ॥
প্রণমিয়া পার্শ্বে, চলে দ্বাবী হর্ষে
বিধি সন্নিধানে নিবেদি বিশেষে ॥
অতঃপর নাগেশ্বব, করিলেক যাত্রা
বলে পঞ্চ বক্ত্রে সুসঙ্গীত বার্তা ॥

শুনি হর বৃষ পর, চলিলেক রঙ্গে
গিরিজা গজানন ষড়ানন সঙ্গে ॥
উপনিত গিয়া, বৈকুণ্ঠ ধামে
বসিলা মিলি অচ্যুত আত্মাবামে ॥
হরি হর একত্রে, উমা সিন্ধু সুতা
করি দেবপাঠ আসিলা বিধাতা ॥
পরে অপ্সরীগণ, প্রণমিয়া বাণী
ধরে তাল হেন কাল সুসঙ্গীত শুনি ॥
অনাদি প্রসঙ্গে, করে গান রঙ্গে
মহাশক্তি বর্ণি প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে ॥
শুনিয়া অমরগণ, ভাসে অশ্রু নীবে
হল হব দিগম্বর মহানন্দ ভরে ॥
দেখি অপ্সরীগণ, হরোন্মত্ত রঙ্গ
মহালাজ ভাবে কবে তাল ভঙ্গ ॥
সুসঙ্গীত ভঙ্গে, কোপে অচ্যুতাঙ্গে
পরিশ্রম বারি বহে পৃথ্বী সঙ্গে ॥
সুনির্মল ঘর্মে হৈতে সত্য জন্মে
দেখে চক্রপাণি বসি বিশ্বরম্যে ॥
হরি সন্নিধানে, রহে দণ্ড মানে
করে স্তুতি বাণী বেদাদি প্রমানে ॥
তুমি সর্ব আদ্য, স্তুতি বেদ সাধ্য
তুমি বীজ বর্ণ রচ গদ্য পদ্য ॥
তুমি সর্ব জন্য, গুণত্রয় মান্য
গুণ ভেদে কর্তা গুণাতীত গণ্য ॥
তুমি সৃষ্টি কর্তা, পালনাদি হর্তা
তুমি বেদ বিজ্ঞ তুমি বেদবেত্তা ॥
অনাদি অনন্ত, কৃত সংকৃতান্ত
কৃপানিধি কাল স্বরূপ কালান্ত ॥

তোমার অঙ্গ ঘর্মে, হৈল মোর জন্ম
কর প্রভু আজ্ঞা করি কোন এ কর্ম ॥
পরে অঙ্গ জাতে, বলে লক্ষ্মীনাথে
তুমি সত্যনারায়ণে প্রকাশিবে মর্ত্যে ॥
তুমি সত্যনারায়ণে, যে পূজিবে
গৃহে সিন্ধু সুতা অচিরাতে পাবে ॥
বিপদ ঘোর মধ্যে, ভাবিলে তোমাকে
পরিপূর্ণ বাঞ্ছা পাবে সর্বলোকে ॥
তবে সব দেব, গেল নিজ ধানী
হিমালয়ে গেল হর লইয়া ভবানী ॥
পরে দেব সত্য, চলিলেক মর্ত্যে
পূজার প্রশংসা প্রচারিতে চিত্তে ॥
পথে কাশী-ধামে, সদানন্দ নামে
দেখে দুঃখী দ্বিজে ভজে কৃষ্ণনামে ॥
ভালে দীর্ঘ ফোঁটা, গলে যজ্ঞ সূত্র
মহাজীর্ণ ধুতি বিহীনান্ন বস্ত্র ॥
ধরে ভিক্ষা জন্য, করে মৃৎ পাত্র
মিলে দিন অন্তে উদরান্ন মাত্র ॥
দেখি সত্য দেবে, আসি দ্বিজ বেশে
কহে ভিক্ষুককে মৃদু মধু ভাষে ॥
কহে বিপ্র ঠাকুর, কোথা যাও কী কার্যে
বলে বিপ্র ভিক্ষা করি রাজ্যে রাজ্যে ॥
দরিদ্রের কার্য, কী আছে কোথা ভাই
যথা মুষ্টি ভিক্ষা মিলে সেইখানে যাই।
উদয়াস্ত ভিক্ষা, করি গ্রাম মধ্যে
উদরান্ন মাত্র মিলে কষ্ট সাধ্যে ॥
যে আমার হেন আর, দশা কার কোথা নাই
করি জ্ঞান গেলে প্রাণ পরিত্রাণ যেন পাই ॥

তবে কন নারায়ণ, দরিদ্রত্ব যাবে
ভজ সত্যনারায়ণে ভক্তি ভাবে ॥
দ্বিজ কয় মহাশয়, কী বল আপনি
কভু সত্যনারায়ণে নাহি জানি ॥
কী রূপে ভজে তায়, বল দেখি আগে
কিবা তন্ত্র মন্ত্র কত দ্রব্য লাগে ॥
নিজে হই দরিদ্র, কোথা বিত্ত পাব
বলনা তাঁহাকে কীরূপে ভজিবে ॥
শুনি হাস্য তুণ্ডে, বলেন বিপ্র আগে
নহে সে সেবাতে বহু দ্রব্য লাগে ॥
চিনি আটা দুগ্ধ, সুবস্তা সহিতে
দিবে সত্য রূপে সোয়া পবিমিতে ॥
বাখি বস্তা পাত্রে, পবে ভক্তি ভাবে
নিয়ে বন্ধুবর্গে প্রশংসা শুনিবে ॥
চতুর্থান্ত নাম, নিয়ে প্রণবাদি
নমঃ সংযোগান্তে দিবে সব নিবেদি ॥
নৈবেদ্য প্রসাদ দিয়ে, সব লোকে
খাবে ভক্তি ভাবে ভাবিয়া তাঁহাকে ॥
পূজার প্রশংসা, বলি ভিক্ষুককে
গেলা অন্তবীক্ষে নহে ভিক্ষু দেখে ॥
নিজে দ্বিজ জাতি, তবে চিত্তে ভাবে
বুঝি সত্য সেবা হ'তে দুঃখ যাবে ॥
তবে বিপ্র ঠাকুর, বলেন এক চিত্তে
গেলে দুর্গতি মোর ভজি আমি সত্যে ॥
অতঃপর দ্বিজবর, চলে ভিক্ষা জন্য
দরিদ্রত্ব নাশ ছিল পূর্ব পুণ্য ॥
পরে সে প্রবেশে, নগরে দ্বিজবর
মিলে অর্থ ভিক্ষা নগরে বহুতর ॥

মহাহর্ষ বিপ্র, সদানন্দে ভাসি
ডাকে ব্রাহ্মণীকে নিজাশ্রমে আসি ॥
ওগো কী করগো, আছ কিনা ঘরে
দেখ আজ বিধাতা প্রসন্ন তোমারে ॥
ধর অর্ঘ পাত্র, রাখ গৃহ মধ্যে
কর সত্য সেবা যথারূপ সাধ্যে ॥
শুনি বিপ্র জায়া, মহানন্দে ভাসি
ডাকিয়া অনিল যত গ্রাম বাসী ॥
কিনি সব সামগ্রী, আনি তৎক্ষণাতে
করে সত্য সেবা যথার্থ বিধিতে ॥
লইয়া প্রসাদ গেল, প্রতিবাসী
সুখে দম্পতিতে পোহাইল নিশি ॥
পূজিলেক নারায়ণ, মহাভক্তি ভাবে
বাড়ে ধন ধান্য তাঁহার প্রভাবে ॥
হৈল হয় হাতী দাস, দাসী ঘর বাড়ি
মহোৎসব কলরব বাজে দিব্য ঘড়ি ॥
দেখি নৃপ দূতে, কহে রাজ আগে
হেন কাজ মহারাজ দেখি ভয় লাগে ॥
মহা দুঃখী বিপ্র ছিল, অরণ্য মধ্যে
মহা ভয় লাগে তায় বলা কার সাধ্যে ॥
কী জানি কোথাকার, মারি কোন সদাগর
লয়ে অসংখ্য বিত্ত হল সে ধনেশ্বর ॥
কোপে তায় রাজা কয়, ডেকে সৈন্যগণকে
নিয়ে আয় হাতে পায় বেঁধে ব্রাহ্মণ কে ॥
নৃপতি অদেশে, চলে সৈন্য বর্গে
করে রোল মহা গোল উঠে ধূলি স্বর্গে ॥
ধরি তার হাতে পায়, দিয়া রজ্জু বান্ধে
মহাভয় লাগে তায় ভাবি সত্য কান্দে ॥

দ্বিজে কয় মহাশয়, কী আশ্চর্য লীলা
দিয়া ধন নারায়ণ বুঝি প্রাণ নিলা ॥
ধনেতে প্রয়োজন কী আছে দরিদ্রের
কর ত্রাণ ভগবান নৃপতি সমুদ্রে ॥
তবে নিজ দাসে, দেখি বন্দি পাশে
বলেন সত্যনারায়ণ স্বর্গ দেশে ॥
হৈল দৈব বাণী, কেন বিপ্র আজি
স্ব-রাজ্যে স্ববংশে মজিলে আপনি ॥
নহে বিপ্র দস্যু, সেবে সত্য দেবে
থাকে যদি বাঞ্ছা তাহাকে সুধাবে ॥
তবে রাজধানী, শুনি দৈব বাণী
মহাভীতি যুক্ত হ'ল রাজ-রাণী ॥
অতি ব্যস্ত চিত্তে, বলে পাত্র মিত্রে
আননা কারাগার হতে ডাকি বিপ্রে ॥
শুনি শীঘ্র বিপ্রে, আনিলেক দূতে
বসিতে সভাতে দিল নৃপ সুতে ॥
ভূপে কয় মহাশয়, কী আশ্চয বাণী
এত ধন কিরূপে পাইলে আপনি ॥
ভয়ে বিপ্র কাতর, কহে প্রণিপাতে
যে রূপে দরশন হল সত্য সাথে ॥
শুনিয়া সভাজন, চমৎকার লাগে
ধনেশ্বর সদাগর বলে বিপ্র আগে ॥
ভাঙ্গি লক্ষ মুদ্রা, সেবি দেব সত্যে
যদি মোর ঘরে হয় কোন অপত্যে ॥
কিবা পুত্র কন্যা, যদি মোর কিছু হয়
তবে সত্য বাণী জানিলাম নিশ্চয় ॥
মাগি বর সদাগর, নিজাশ্রমে আসি
সুখে দম্পতিতে পোহাইল নিশি ॥

কে বা কী বুঝিবে, বিধির ইচ্ছা ভিন্ন
সদাগর ঘরণীর হইল গর্ভচিহ্ন ॥
পরস্পর ঘরে ঘর, ঘোষে নব নারীগণ
কুলাচার করে তার যে আছে নিরূপণ ॥
পরে পূর্ণ মাসে, কুমারী প্রসবে
ধনেশ্বর সদাগর মহানন্দে ভাবে ॥
করে ধন বিতরণ, দিতে দুঃখী দীনে
মহোৎসব নহবৎ বাজে থানে থানে ॥
তবে ষষ্ঠী পূজা, পরে ছয় দিবসে
দিল অন্ন ভুঞ্জে পরে পঞ্চ মাসে ॥
দিনে দিন হয় পীন, জননীর কক্ষে
পরস্পর সুধাকর যেন সিত পক্ষে ॥
গত সে অবস্থা, খেলে বাল্যকালে
নানা পাঠ শিক্ষা করে পাঠশালে ॥
পরে যৌবনাস্য, শরৎচন্দ্র আভা
জিনিয়া সাপিনী করে বেণী শোভা ॥
শেতাম্বুজ আস্য, প্রফুল্ল সুহাস্য
সুধাসিক্ত বৃষ্টি করে বাক রহস্য ।
জিনি তপ্ত স্বর্ণ, হৈল বর্ণ আভা
মহাক্ষীণ মধ্য মুনি মনো লোভা ॥
উরুস্তম্ভ রম্ভা তরু, চারু সৌম্যা
সুনীতা সুধীরা সুশীলা সুরম্যা ॥
গজেন্দ্র গামিনী, কামিন্যাগ্র গণ্যা
সদা হাস্য আস্যা সুবাচ্য সুধন্যা ।
দেখি রূপ সুধা কূপ, সদাগর ঘরণী
কহে ভর্ত্তৃ অগ্রে মহাহর্ষে বাণী ॥
সুতা যৌবনস্থা, কেন আর বিলম্ব
করনা বিবাহের শুভযোগ আরম্ভ ॥

শুনিয়া সদাগর, বলে ডাকি ঘটককে
আন যোগ্য পাত্র যেখানে থাকে ॥
রূপবান গুণযুত, কুলে বংশে শুদ্ধি
ধনেতে জনেতে থাকে যার বৃদ্ধি ॥
দেখিয়া আনিবে, সুতা যোগ্য পাত্র
যেন যশ ঘোষে সব দেখি ইষ্ট মিত্র ॥
চলিল ঘটকবর, সদাগব আদেশে
দেখি বর নিরন্তর ফিরে দেশে বিদেশে ॥
জানকী রামের সুত, সুধানাথ নামে
আনে বর মনোহর বাড়ি কাঞ্চী ধামে ॥
অতঃপর নরেশ্বর, দেখিয়া সুপাত্র
ডাকিয়া আনিল যত ইষ্ট মিত্র ॥
করে ধীর দিন স্থির, সুলগ্ন নিরূপণ
আনে সব সামগ্রী অসংখ্য আয়োজন ॥
কাজে গেল মহারোল, হৈল সব সুখাস্পদ
বাজে ঢোল কাবা খোল নাগেবা নহবৎ ॥
দেখি বব পরস্পব, সবে কয় বিলক্ষণ
দ্বিজে কয় মহাশয় হৈল কাল শুভক্ষণ ॥
শুনিয়া সদাগর, আবম্ভিল কার্য
কবে সব নারীগণ বালিকা সুসজ্জ ॥
তবে কেশ ধরি বেশ, বান্ধি দিব্য খোঁপা
তাতে ফুল দিল তুল মহাগন্ধ চাঁপা ॥
আনিয়া বালিকা, যথা বেদ বিধিতে
ধরি কর সদাগর দিল পাত্র হাতে ॥
সুতাবর নিয়ে ঘর, করে সব স্ত্রী আচার
রসভাষ পরিহাস নাহি তার পারাবার ॥
গেল সব সভাজন, সবাকার নিজ ঘর
যামিনী অমনি পোহাইল সদাগর ॥

জামাতা দুহিতা, সহ হর্ষ চিত্তে
কতকাল বসিয়া খাইল পূর্ব বিত্তে ॥
জামাতা সহিতে, করে কল্প ধার্য
যাবে সিংহলেতে করিতে বাণিজ্য ॥
সাজায়ে তরণী, ভরিয়া নানা ধন
করে ধীর দিন স্থির সুলগ্ন নিরূপণ ॥
ডাকি ইষ্ট মিত্রে, বলিলেক বার্তা
জামাতা সহিতে করিলেক যাত্রা ॥
চলিল তরণী, বাহিয়া ত্বরিতে
কাশীতে আসিয়া পূজে বিশ্বনাথে ॥
ঘাটেতে আসিয়া, পূজে জাহ্নবীকে
তরণী বাহিয়া চলে সব নাবিকে ॥
বাহি সব নদী জল, চলে রাত্র দিনে
করে সব দেবার্চন যে আছে যেখানে ॥
অতঃপর সদাগর, গেল সিন্ধু তীরে
করে তর্পণাদি সমুদ্রের নীরে ॥
দেখে ভয় ডেকে কয়, যা কর ভবানী
কর বোল হরিবোল বেয়ে যাও তরণী ॥
গেল ধার হয়ে পার, তরী সিংহলেতে
চলে পর সদাগর নৃপতি ভেটীতে ॥
ভূপতি সমীপে, করে সব নিবেদন
ভূপে কর মহাশয় কর ক্রয় মনে লয় যত ধন ॥
ভূপতি আদেশে, করে সে বাণিজ্য
বলে ভাই কোথা নাই হেন ধন্য রাজ্য ॥
শতে শত তরণী, ভরিয়া সুবর্ণে
মাণিক্য প্রবাল মণি নানা বর্ণে ॥
স্বদেশে যাবে সে, পরে চিত্তে ভাবে
হ'য়ে বিস্মৃত না সেবে সত্য দেবে ॥

চলিল স্বদেশে, না বলি ভূপেকে
তে কারণ নারায়ণ লাগিলেক বিপাকে ॥
শুনিয়া ভূপতি, কোপে কয় দূতেকে
নিয়ে আয় হাতে পায় বেঁধে দুই বেটাকে ॥
ভূপতি আদেশে, ধেয়ে সব দূতে যায়
আনিলেক বাঁধিয়া দোঁহাকে হাতে পায় ॥
দেখিয়া রাজা কয়, দু' আঁখি করি ঘোল
কোথাকার সদাগর ওরে দুই বেটা বোল ॥
কোথা ধাম কিবা নাম, কেবা কি জানে তোর
এত ধন অগনন হরি বেটা চোর ॥
রাখনা কারাগার, বলে ভূপ দূতেকে
শুনিয়া মশানে রাখিলেক দোঁহাকে ॥
হেথা তার নিকেতন, ছিল যে কিছু ধন
নারায়ণ কোপে তায় লইলেন হুতাশন ॥
জননী দুহিতা, কাঁদে রাত্রি দিনে
কখন বা অনাহার রহে অন্ন বিনে ॥

পরে দৈব যোগে, দেখে বিপ্র পাড়া
পূজে সত্যনারায়ণে সব দ্বিজেরা ॥
লইয়া সেই প্রসাদ, বলে ভক্তি ভাবে
সদাগর এলে ঘর পূজি সত্য দেবে ॥
পরে তায় দয়াময়, করুণা প্রকাশে
গেলা সিংহলেতে বৃদ্ধ দ্বিজ বেশে ॥
বসিয়া ভূপতি, সভা মধ্য ভাগে
ডেকে কন নারায়ণ কোপে রাজ আগে ॥
কেন ছল করি বল, কর এ অবিচার
অকারণ সাধুগণ রাখিলে কারাগার ॥
ভাল চাও ছেড়ে দাও, ভরি দাও নানা ধন
নহে তার প্রতিফল পাবে ভূপ বিলক্ষণ ॥

বলিয়া ভূপেকে, হৈল দ্বিজ অদর্শন
ভূপে কয় একি দায় ঠেকালেন নারায়ণ ॥
আনিয়া কারাগার, হতে তুই সদাগর
দিয়ে ধন অগণন বলে যাও নিজ ঘর ॥
ছিল বন্ধ লেখা, যে কোন বিপাকে
চলিলা স্বদেশে না বলি আমাকে ॥
বিনয়ে দোঁহাকে, তুষিলেন নৃপবর
তুষিয়া ভূপেকে চলে ঘর সদাগর ॥
লইয়া অসংখ্য বিত্ত, মহাহর্ষ চিত্তে
চলে সিন্ধু মধ্যে নানা বাদ্য নৃত্যে ॥
বীণা কাঁশী বাঁশী, সাবিন্দাদি কর্ণাল
কারা তানপুরা ঝাজ বাজে সব করতাল ॥
টিকারা নাগেরা, শতে শত বাজে ঢাক
ক ৩ বঙ্গে কড়খা বাজে দিব্য জয় ঢাক ॥
ভেরী ঢোল তবল খোল, বেহালাদি ঘোর ঘাই
ঢোলক সেতারা তানপুরা শঙ্খ সানাই ॥
সিঙ্গা সেতারা ডিম্ ডিম্ ডিমি ডিমি ভাল
ঝাকে ঝাক বাজে ঢাক থাকে থাক থেকে ভাল ॥
চড়ে জুম করে ধুম, দাড়ি সব নেচে দাঁড
হাঁকে থাক বলে বাথ্ দেখি পাক খবরদার ॥
মহাগোল হরিবোল, বোলে হয় চমৎকার
গেল ধার হয়ে পার বলে বল আর একবার ॥
হ'যে পার বেয়ে দার, চলিলেক এবিতে
ধরে সব তরী তার পরে সব নদীতে ॥
বেয়ে সব নদী জল, চলে রাত্র দিনে
করে অর্চনাদি দেবালয় যেখানে ॥
চলে ঘর সদাগর, সদা গান নৃত্যে
কভু সত্য সেবা নাহি ভাবে চিত্তে ॥

ত্রিবেণী নিকটে, বৃদ্ধ দ্বিজ বেশে
বসিয়া নারায়ণ কহে মৃদুভাষে ॥
কোথাকার সদাগর, নিয়ে যাও কিবা ধন
হেসে কয় মহাশয় লতা আর পাতা বন ॥
পরিহাস ভাষে তার, কুপিলেন নারায়ণ
লতাময় তরী হয় ছিল তার যত ধন ॥
ভাসি ভার টুটিয়া, উঠে সব তরী তার
সবে কয় মহাশয় একি দায় পুনর্বার ॥
দেখি পরে সদাগর, তরী সব লতাময়
বিষাদে নিষাদে দ্বিজ দীন হীনে কয় ॥

এইবার আবার সদাগরের কান্নার পালা। সদাগব সব ধন রত্ন হারিয়েছেন নারায়ণের কোপ দৃষ্টিতে। তাই দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে সদাগর শুরু করেন বিলাপ :—

কান্দি কয় সদাগর, কোথা হে পরমেশ্বর
একি মোর হ'ল অকস্মাৎ।
কত মত বিডম্বনা, ছিল তোমার বাসনা
পথিমধ্যে তাহে বজ্রাঘাত ॥
বাণিজ্য সিংহল দেশে, অকারণ বন্দী পাশে
কত দুঃখ দিলে কারাগার।
সমুদ্রে বিষম বেলা, কৃপা করি সেই বেলা
অনাসে করিলে তাহে পার ॥
লইয়া অসংখ্য ধনে, আসিলাম রাত্র দিনে
কোথা কিছু নাহি অমঙ্গল।
আনি প্রাণ ত্রাণ করি, রাখিলা সর্বস্ব হরি
কেমন বিষম কর্মফল ॥
এত বিড়ম্বনা লাভ, আজ হতে বুঝি ভাব
ঠেকিলাম বিধাতার কোপে।
কে হেন দেখেছ কোথা, এত ধন লতা পাতা
অকস্মাৎ হ'ল কার শাপে ॥

করি তারে প্রণিপাত, কহে পরে সুধানাথ
শুন সদাগর মহাশয়।
দ্বিজবর গঙ্গাতীরে, তোমারে জিজ্ঞাসা করে
তুমি পরিহাস ভাষ তায়॥
নহে সে মনুষ্য কায়া, হবে কোন দেব মায়া
চল গিয়ে ধরি তার পায়।
শুনি বাণী সদাগর, লইয়া দুহিতা বর
তরণী ফিরায়ে তথা যায়॥

দেখে ত্রিবেণীর ঘাটে, আসনে বসিয়া তটে
দরশন দিলেন নারায়ণ।
বসন বাঁধিয়া গলে, কাঁদিয়া চবণ তলে
পরে দুই সাধুর নন্দন॥
বলে তুমি জগন্নাথ, জগত জনাব তাত
আমি অতি অকৃতি তনয়।
যদি ক'রে থাকি দোষ, কৃপা করি ক্ষম রোষ
দাসে দয়া কর দয়াময়॥

তুমি বিনাশিবে যাবে, কে তারে রাখিতে পারে
রাখিলে নাশিতে পারে কেবা।
ঠাকুর বলেন পর, কেন কাঁদ সদাগর
পূর্বেতে স্বীকৃত ছিলা সেবা॥
সেবা না করিলা তুমি, বিপাকে লাগিলাম আমি
সিংহলেতে ভূপতির আগে।
পথে সুধালাম হাসি, তাহে পরিহাস ভাষি
গমন করিয়া রাগে রাগে॥

ছিল তব বহু দোষ, এবে শান্তি হ'ল রোষ
পরিতোষ হইলাম মনে।
কর গিয়ে সেই সেবা, বিপদে উদ্ধার হবা
তরী পূর্ণ হবে পূর্ব ধনে॥

প্রণমিয়া নাবায়ণ, চলে সাধু দুই জন
আসি দেখে তরী পূর্ণ ধনে।
নারায়ণ সেবা তুল্য, রাখি রত্ন বহু মূল্য
আনন্দে চলিল নিকেতনে ॥
বাহি সব নদী জল, নানা বাদ্য কোলাহল
চলে সারি গেয়ে দাঁড়ীগণে।
লাগায়ে তবণী ঘাটে, অতিদ্রুত দূতে উঠে
সমাচাব দিলেক ভবনে ॥

শুনিয়া ঘবণী তাব, কবিয়া মঙ্গলাচাৰ
চলে বামা তবণী বরিতে।
হেন কালে দ্বিজগণে, সেবি সত্যনাবায়ণে
প্রসাদ আনিয়া দিল হাতে ॥
প্রসাদও খাইয়া মায়, তবণী ববিতে যায়
ফেলাইয়া চলিল দুহিতা।
প্রসাদেব অপমানে, কোপ যুক্ত নাবায়ণে
অকস্মাৎ ডুবিল জামাতা ॥

ডুবিল দুহিতা বব, কান্দে সাধু ধনেশ্বব
কবাঘাত হানে ভালে।
বাণিজ্যে যাইয়া সাথে, কত দুঃখ পাইল পথে
ঘাটে আসি ডুবিল সলিলে ॥
পড়িয়া ধবণী তলে, ঘবণী কান্দিয়া বলে
বলে কোথা গেল সুতাবর।
লইয়া দুহিতা পতি, বাণিজ্যে করিলা গতি
কী কারণে দেখি একেশ্বর ॥

শুনিয়া বিশেষ কথা, কাঁদে সদাগর সুতা
ঝাঁপ দিতে চাহে সে সলিলে।
কখনও ভূমেতে পরে, কাঁদে পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে
কাটারি ধরিতে চাহে গলে ॥

পাষাণ ধরিয়া কবে, শিরেতে আঘাত করে
বলে প্রবেশিব দাবানল।
কেমন দৈবেব গতি, দেশেতে আসিয়া পতি
ঘাটে আসি হল বসাতল॥
দারুণ অশনি পাত, শিবে হ'ল অকস্মাৎ
ছিল মোর কবমেবি লেখা।
সমাচাব দিল দূতে, দেশে আসিয়াছে নাথে
ঘাটে আসি না পাইলাম দেখা॥
বুঝিলাম বিধিব বাদ, জীবনে নাহিক সাধ
অবশ্য খাইব হলাহল।
শোকে হ'য়ে জ্ঞান হত, পড়ে মৃত কায়া মত
মূর্ছাগত হ'য়ে মহীতল॥
মূর্ছাগত স্বপ্নাদেশে, নাবায়ণ দ্বিজ বেশে
ঠাকুব আসিয়া সন্নিধানে।
জীবন ত্যাজিবে কেন, কহি উপদেশ শুন
এ দশা প্রসাদ অপমানে॥
প্রসাদ ফেলেছ যথা, পুনবায় যেয়ে তথা
ভক্ষণ করহ ভক্তিভাবে।
কহিছে কমলা কান্ত, হ'য়ে সাধু সুধা শান্ত
ভজ সত্যদেবে পতি পাবে॥

নাটকের শেষ অঙ্ক। জামাতা সহিত কন্যার মিলন ও কলিতে সত্যনাবায়ণ পূজাব প্রচার। এর পবই প্রসাদ ভক্ষণ। সে দিনকার মত পূজা পর্ব ঐখানেই শেষ। পাঁচালীকাব তাই উপসংহারে বলতে শুরু কবেন :—

হ'য়ে মূর্ছা ভঙ্গ, পরে পঙ্কজাক্ষী
নরাঙ্কিত বাক্যে পাইলেন সাক্ষী॥
পরে চিত্ত মধ্যে, ভাবি সত্য দেবে
নিল সে প্রসাদ মহাভক্তি ভরে॥
নারায়ণ আদেশে, ভাসে সব তরী তাব
উঠে ভর্ত্রী সঙ্গে ঘাটেতে পুনর্বার॥

তরণী বরিতে, চলে ঘর একত্রে
সদাগর সুতাবর সুতা আর কলত্রে ॥
নিয়ে ধন নিকেতন, মহানন্দ ভাবে
দিয়ে লক্ষ মুদ্রা সেবে সত্য দেবে ॥
আনি দেশ বিদেশ, হ'তে ইষ্ট মিত্র
দিল সব দ্বিজেরে নিমন্ত্রণ পত্র ॥
ডাকিয়া আনিল, যত গ্রামবাসী
সুখে দম্পতিতে পোহাইল নিশি ॥
দিল দুগ্ধ পূর্ণ, সহস্রেক কুম্ভ
আরম্ভিল কার্য প্রণমি হেরম্ব ।
ভাবিয়া নারায়ণ, মহাভক্তি পূর্বে
শুনিল প্রশংসা নিয়ে বন্ধু বর্গে ॥
অতঃপর দ্বিজবর, কবে সব নিবেদন
দিয়ে তাম্বূলাদি প্রণমে নারায়ণ ॥
প্রসাদে তুষিল, যত বন্ধু বর্গে
পরে দৈববাণী হইলেক স্বর্গে ।
শুন সর্বলোকে, কহি সত্য কথা
কলিতে নারায়ণ সেবা দুঃখ নাশা ॥
ভজিলে দরিদ্রের, দরিদ্রত্ব যাবে
হলে পুত্রবাঞ্ছা বহু পুত্র পাবে ॥
বিপদ ঘোর মধ্যে, বিষাদে বিপাকে
পাবে ত্রাণ পরিত্রাণ ভাবিলেক তাঁহাকে ॥
গমনে গহনে, গেলে সিন্ধু তীরে
হবে জয় নাহি ভয় কিছু ঘোর সমরে ॥
যথোক্ত বিধানে, ভজে যে তাঁহাকে
পরিপূর্ণ বাঞ্ছা পাবে সর্ব লোকে ॥
শুনিয়া সভাজন, সবিস্ময় চিত্তে
গেল সব নিজালয়ে প্রণমিয়া সত্যে ॥

সদাগর রহে ঘর, সুতাবর সহিতে
হল সত্য সেবা প্রকাশ এই রূপেতে ॥
মহীতে নারায়ণ, সেবা কল্প শাখা
বিপঙ্কংশ ভানু মনু বেদ লেখা ॥
যুড়ি কর মাগি বর, কমলাদি কান্তে
নারায়ণ বলি প্রাণ ত্যাজি যেন অন্তে ॥

ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি ওঁ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নানান দেশের নানান ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা ?
কত নদী সরবর, কিবা ফল চাতকীর
ধারা জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা ?

—নিধু বাবুর টপ্পা (রামনিধি গুপ্ত)।

পূর্ববঙ্গকে এক কথায় যেমন গ্রামে গাঁথা দেশ বলা হয়, তেমনি যদি একে গানে গাথার দেশ বলি তা' হলেও আশা করি কেউই দোষ ধরবেন না। রোগ আছে, শোক আছে, আছে এখানে দুঃর্ভিক্ষ মহামারী। কুশিক্ষা, নিরক্ষরতা, পরশ্রী কাতরতা—অভাব নেই কিছুরই। কিন্তু এ সবকে নিত্য সহচর করে নিয়েও তারা গান গায়। গান তাদের যেমন পালপার্বণের একটা অঙ্গ, তেমনি এ যেন এদের বেঁচে থাকবারও উৎস। ঘটা করে আসর জাঁকিয়ে গান ছাড়াও তারা গান গায় পাট কাটার সময়, ক্ষেত চাষের সময়। নিশীথ রাতে একাকী মেঠো পথ ধরে চলবার সময় তারা গান ধরে, আবার কবি বর্ণিত শুভ মুহূর্তেও তারা গায়। গান তাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার একটা অত্যাবশ্যক অঙ্গ।

এদের এই গান সব যে একই শ্রেণীর নয় তা' নিশ্চয়ই আর বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। উপরন্তু এই সব গায়কদের গানের তাল, ছন্দ, মান-মাত্রাও যে সব সময় ঠিক থাকে এমনও নয়। কিন্তু একটা জিনিষ থাকে, সেটা তাদের মনের আনন্দ। গান মনের আনন্দেরই ধন, এরা সব সুরশিল্পী বা সঙ্গীতজ্ঞ না হলেও এরা গায়। এই সব গানের মধ্যে একাধারে বাউল, বৈরাগীর গান থেকে ব্যঙ্গ ও রঙ্গ রসিকতার খোরাকও মেলে। সমালোচকরা পল্লীবাসীদের এই সব হঠাৎ গাওয়া গানগুলিকে "মেঠো গান" আখ্যা দিতে পারেন।

এদের আরম্ভ বিস্তার সব মাঠেই! কাজেই এদের উপভোগ করা চলে কিন্তু এরা সমালোচনার ধার ধারে না। এই মেঠো গানগুলিই নিরক্ষর পল্লীবাসীদের নির্দোষ অবসর সঙ্গীত।

এ সব গানের বিশেষ কোন ভূমিকার প্রয়োজন নেই। তবু মনে করুন কোন কৃষাণ ঘরণী যেন তার ভাশুরের প্রেমে পড়েছে। এই নিয়েই শুরু হ'ল গান :—

রঙিলা ভাশুর গো,
তুমি কেন দেওর হইলা না।
তুমি যদি হইতা রে দেওব
খাইতা বাটার পান
(আর) রঙ্গ রসে কইতাম কথা
জুড়াইত পরাণ।
বঙিলা ভাশুব গো
তুমি কেন দেওর হইলা না।
হাটে যাও বাজারে যাও
আমার একটি কথা
(ঐ) দিদির লইগ্যা পান সুপারী
আমার আলাপাতা।
বঙিলা ভাশুর গো,
তুমি কেন দেওব হইলা না।

পূর্ব বাংলায় "বৌ-নাচ" এবং 'পুতুল নাচের' এক সময় খুব প্রচলন ছিল। এই বৌ-নাচ অনেকটা সংএর মতই বটে। এরা গান গায়, গান গেয়ে যা পায় তা'তেই এদের স্ফূর্তির খরচা চলে :—

হায়রে মুনিয়া মাঝি, তোর গাঁজার নৌকা
পাহাড় দিয়া যায়।
গাঁজা খাইয়া শুইয়া থাকি,
সিঁথানে পুষ্কর্ণী দেহি,
আবার বাজার দেহি
তাল গাছের আগায় (রে)
(মুনিয়া মাঝি তোর গাঁজার নৌকা
পাহাড় দিয়া যায়)
(আবার) ভ্যাদা মাছে ক্যাদা খায়
পুঁটি মাছে পান চিবায়

(আর) পোটকা শালা,
গাল ফুলাইয়া রয়।
(হায়রে মুনিয়া মাঝি, তোর গাঁজার নৌকা
পাহাড় দিয়া যায়)।

রাধা-কৃষ্ণের প্রেম লীলা রূপক কি না জানিনা। তবে শত সহস্র রাধা যে একই ভাবে তার দয়িতের প্রতীক্ষায় থাকে এ কথা অনুমান করা শক্ত নয়। তাই এই সব ক্ষেত্রে ললিতা বিশখাদেরও প্রবোধ দিতে শোনা যায় :—

তারে তুমি সখী দিওনা আর মন
তারে মন দিলে সখী
হবে জ্বালাতন।
আমি যারে ভালবাসি
সে'ত গলায় দেয় গো ফাঁসী
শঠের পীরিতি যেন জলের লিখন।
তারে সখী তুমি দিও না আর মন।

এর পর যদি কলির কেষ্টরা সত্যিই ফিরে আসে তখন আমাদের বাস্তব শ্রীরাধারাও নিশ্চয়ই উত্তর করবে :—

দু'টো কথাও কি
তোমার প্রাণে সয়না?
এক ঘর এক ঘর করতে গেলে
ঝগড়া কি তায় হয় না?
যখন পীরিত ছিল আঁটা আঁটি
কেঁদে ভিজাতাম মাটি—
এখন বোঝার উপর শাঁকের আঁটি
তাও কি প্রাণে সয়না
(লো, দুটো কথাও কি তোমার প্রাণে সয় না?)

এর পর যদি আমাদের গেঁয়ো কবিরা কল্পনা করেন যে, এই সমস্ত উপেক্ষিতা নারীরা তাদের দেবরের প্রতি অনুরক্তা তা হ'লে তাদের দোষ দেওয়া চলে কি? :—

ছোট দেওরা তোর আওড়া কথা
প্রাণে সহে না (রে ছোট দেওরা)
ভাতার গেল ধান কাটতে
বাঘে ধইরা খাউক
(মোর) সোনার দেওরা বাঁইচা থাউক ॥
দেওরা মোরে করল পাগল
প্রাণে সহে না (রে)
ছোট দেওরা তোর আওড়া কথা প্রাণে সহে না ॥
পান ত' চিলি চিলি
সুপারীর বাহাদুরি,
সোনা মুখে পানের খিলি
দিলেও ত' খায় না।
(লো ছোট দেওরা তোর
আওড়া কথা প্রাণে সহে না) ॥

কলকাতার ধনী গৃহস্থ এবং মেসবোর্ডিএর বাবুদের সব সময়ই নির্ভর করতে হয় ঠাকুর চাকরের উপর। এই সমস্ত রাঁধুনী বা পাচক ঠাকুররা যে কি জাতের থাকে তা' সব সময় জানা যায় না। অনেকে সময় সমাজে অচল জাতও অনেকে গলায় পৈতে ঝুলিয়ে ব্রাহ্মণ সেজে রান্না করে। কিন্তু সত্য ত' আর চাপা থাকে না। এই কথা যখন একদিন প্রকাশ পায়, তখন কল্পনা করতে পাবেন কি রকম হয় সেই বর্ণ-চোরা ঠাকুরের অবস্থা ? :—

রাম প্রভু দেশ ছাড়ি দুঃখ পাইনু কত।
গিয়েছিলাম কইলকাতায়
শিখে আইলাম ডাইল ঘোড়া,
(আবার) ফেটি সুতা গলায় দিয়া
হইয়াছি ব্রাহ্মণ জাতি।
যখন বাবু ঠিক পাইলা
ধরি কিরি কিল কিলাইলা

(আবার) পিঠের উপর ভাঙ্গি দিলা
গটা নূতন জুতা,
রাম প্রভু, দেশ ছাড়ি দুঃখ পাউচি কত ?

গ্রামে আসে বহুরূপীর গান। তা'রা বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান গায় :—

ও মরা গুগলী লা লো—
মায় কইছে মাইয়্যার
ছুরাত খানি ভালো
(ওই) কালা পাতিলের মত
মাইয়্যার আমাব
ছুরাত খানি ভালো।

কিংবা :—

আমি বন্ধুর তালাসে
যাব কোন দেশে
তোদের অনুমতি চাই।
বন্ধু বুঝি মথুবাতে নাই ॥
(ও) তবু কেন মানুষে এত ভালবাসে
আমি বসে ভাবি তাই
বন্ধু বুঝি মথুরাতে নাই।

খেমটা গান অনেক শুনেছেন। কিন্তু এই রকম 'মেঠো' খেমটা শুনেছেন কি (কোন কোন অঞ্চলে অবশ্য একে ছাত পেটার গানও বলে) :—

মাইবি খোঁদি তোর পীরিতি জানতে পেরেছি।
তুই লো আমার গামলা ভরা
পঁচা পান্তা ভাত্,
ও আমি মাছি হইয়া ভ্যান ভ্যান করি
ও তুই কুকুর হইয়া চাট্
মাইরি খেঁদি তোর পীরিতি জানতে পেরেছি।

বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন চৈতন্য দেব। কিন্তু তা'র মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে এই সম্প্রদায়ের ভিতর ঢোকে গলদ। ক্রমান্বয়ে বৈষ্ণব ধর্ম বা বৈষ্ণব বলতে লোকের মনে আসে গাঁয়ের ভেকধারী বোষ্টম-বোষ্টমীর কথা।

এই বোষ্টম-বোষ্টমীদের দু'দশ দফা কেচ্ছা সব দেশেই আছে। কিন্তু এই সম্প্রদায় কতকগুলি দুষ্ট লোকের জন্য কি ভাবে সাধারণের মনে তিক্ততার সৃষ্টি করেছে তা' গাঁয়ের নিরক্ষর কৃষাণদের মেঠো গানের মাধ্যমেও জানা যায়।

মনে করা যা'ক কোন বোষ্টমের যেন বোষ্টমী পালিয়ে গেছে। তা'তে বোষ্টম বাবাজীর মনে কি রকম দুঃখ উপস্থিত হয়েছে সে বিষয় এক সরস চিত্র এঁকেছে বরিশালের কৃষাণ মজুররা :—

পরাণ বঁধুয়ারে, পরাণ বঁধুয়া তুই
খাইতে চাইলি ঘুঁঘুঁ
সেই ঘুঁঘুঁ আইনা দিলাম
আঁধার নিশা কালেরে
পরাণ বঁধুয়া তুই।
ঘুঁঘুঁরে নাড়িলাম ঘুঁঘুঁরে চাড়িলাম
ঘুঁঘুঁর নাইরে পাখা।
পিদ্দিম জ্বালাইয়া দেহি
দাঁড় কাগের বাচ্ছারে
পরাণ বঁধুয়া তুই।
পরাণ বঁধুয়ারে, পরাণ বঁধুয়া তুই
খাইতে চাইলি কাড়াল।
সেই কাড়াল আইনা দিনু
আঁধার নিশা কালেরে
পরাণ বঁধুয়া তুই।
কাড়ালে নাড়িলাম কাড়ালে চাড়িলাম
কাড়ালের নাইরে কাড়া,
পিদ্দিম জ্বালাইয়া দেহি
চাউলের কুমড়া রে
পরাণ বঁধুয়া তুই।

এইখানেই শেষ নয়। বোষ্টম বাবাজী এর পরও নাকি গান ধরে :—

কালা কেষ্ট কয় মোরে
লাউর বয়সে করলরে বৈরাগী।

(ও আমি) কাশী গেলাম, গয়া গেলাম
সঙ্গে নাই লো বৈরাগী।
কালা কেষ্ট কয় মোরে
লাউর বয়সে করলরে বৈরাগী।
(ও) লাউর আগা খাইলাম, ডগা খাইলাম
খাইলাম লাউয়ের তরকারী।
কালা কেষ্ট কয় মোরে,
লাউর বয়সে করলরে বৈরাগী।
টাকা আছে, কড়ি আছে
আছে দুই গাছ চাপ দাঁড়ী।
কালা কেষ্ট কয় মোরে
লাউর বয়সে কবলবে বৈরাগী।

এই পরিচ্ছেদের সমুদায় গানই অবসর সঙ্গীত। এই অবসব সঙ্গীত যে শুধু পুরুষেরাই গায় তা' নয়। পূর্ববঙ্গে বহু নারী গায়িকা ও বৈষ্ণবীর দেখা পাওয়া যায়। এদের রচিত অনেক পদেব কথা আমরা এব আগে বলেছি! নিছক সময় কাটাবার জন্য এই সব বোষ্টমীদেরও গাইতে শোনা যায় :—

প্রেম নগরে ঘর বাঁধিব
প্রেমের সাথী নিয়া
প্রাণ বঁধুয়ার মন মজাব
যৌবন ডালি দিয়া।
প্রেমের ফাঁসী পইরা গলে
যৌবন জ্বালায় অঙ্গ জ্বলে
আমি ঘরে রইতে নারি
পাগল হইয়া বনে ঘুরি
প্রাণের বধুঁ, প্রাণের সাথী
তোমার সাথে ঘর বাঁধিব
নিরাল নদীর ধারে।

কখনও কখনও এরূপও শোনা যায় :—

থাকতে পার ঘাটেতে
তুমি পারের নাইয়া
অ' দিন বন্ধুয়ারে
আমার দিন কি
এমনি যাবে বইয়া ॥
ও বন্ধুরে, আমি দীন ভিখারী
পাড়ের কড়ি
ফেইল্যাছি হারাইয়া
আমি পার হইতে চাই তাই
ঘাটেতে কাঁন্দি যে দাঁড়াইয়া।
ও বন্ধুরে, কত জনায় নিলে তুমি
উজানে বাইয়া,
আমি ভাটির বাঁকে পারের ঘাটে
কান্দি রইয়া রইয়া ॥
ও বন্ধুরে, আমি ভাবি যা'কে
পার হইতে ঘাটে দেখি যাইয়া,
কত প্রেমিক জনা পার হইয়া যায়
যার নামের সারি পাইয়া ॥
ও বন্ধুরে, কাম নদীর তরঙ্গ ভারী
কেমনে যাবে বাইয়া
অধম নারী কুমুদিনী রইল
তোমার নাম চাইয়া ॥

পাঠকগণ একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন এই সব বৈষ্ণবীদের গানে নিছক ব্যঙ্গ-কৌতুকই একমাত্র বস্তু নয়। বরং এদের প্রত্যেক গানই একটু দেহতত্ত্বের ধার ঘেঁষা। নমুনা স্বরূপ আর একখানা ধরা যাক :—

আমার মনের দুঃখ কইবার আগে
আঁখি যায় ঝরে।

কইতাম প্রাণ কথা খুলে

সম ব্যথার ব্যথী পেলে

শুনলে পাষাণ বিদরে।

শুনে কালাচাঁদের বাঁশী

প্রাণেতে বাসি উদাসিনী

কি হইল মোরে।

আমার মন লাগেনা গৃহ কাজে

সইরে বুঝালে না বোঝে।

একদিন যমুনারই কুলে

কদম্বেরই মুলে,

আড়ালে হেরিলাম তারে

ও সে হানিয়ে নয়ন বাণ

কেড়ে নিল মন প্রাণ

কি যেন কি কইল মোরে॥

দেখলাম নিশির শেষে

স্বপন বেশে কালী,

আমার হিয়ার মাঝে

অধম কুমুদিনীর বাণী

রাধে শুন বিনোদিনী

এ সব হয় প্রেমের বিকারে॥

বাউল ও বৈষ্ণবের কথা ইতিপূর্বে অনেক বলেছি। কিন্তু এদের ছাড়াও আর এক প্রকার লোক আছে যা'রা বিশেষ কোন শ্রেণীভুক্ত নয়। এরা না শাক্ত না বৈষ্ণব। উভয় সম্প্রদায়ের বাড়িতেই এদের নিমন্ত্রণ জোটে। জীবন ধারণের জন্য এরা স্বাভাবিক কাজ কর্মও করে। গান গেয়ে পয়সা রোজগারই তাদের প্রধান উপজীবিকা নয়। এদের এক কথায় গৃহী বৈষ্ণব বললে বোধ হয় অন্যায় হয় না। এদের গানের অধিকাংশই বাউলের দেহতত্ত্বের ধার ঘেঁষা। এদের অধিকাংশ গানগুলিই তাই বৈরাগীদের মুখে মুখে শোনা যায়। নমুনা স্বরূপ বলা চলে :—

ভেবে দেখ মন এ দেশ ছাড়ি
(ও তোর) কোথায় যাবে এ সুখ শয্যা
কোথায় যাবে ঘর বাড়ি ॥
পরের বাড়ি পরের ঘরে মন কয়দিন রবি
তোরে নিয়ে যমরাজা দিবেরে সাজা
আসছে যে শমন চাপরাসী।
শেষকালেতে ঘটবে পালা
তোরে হাতে বেঁধে নিয়ে যাবে শমনের বাড়ি।
দ্বিজ রসিক বলে, ছায়ার জন্য মরা কান্না
আর কাঁদবি কতকাল ?
তারে দেখলে মায়া, না দেখলে ছায়া
বদন ভরে বলরে হরি হরি।

এবং :— আর বেশী নাইরে দেরী
আজ না হয় কাল যেতেই হবে
ঐ বাজে বুঝি শমনের ভেরি।
গায়ে দিয়ে ধুতি আলোয়ান
করেছে পাকা দালান
যখন হবে চালান তখন,
বাইরবে রে তোর বাড়ি ॥
ও তোর ঘর ভরা চোর হইয়াছে রে
মূলধনের কারবার,
ও তারা আপন বুঝে বুঝে
দিয়ে যাবে মাথায় বারি।
আছে যা'র ইষ্টি গুষ্ঠি, একমাত্র করে দৃষ্টি
মানে না সে শীলা বৃষ্টি
নিয়ে যাবে ধরি কেহ
করবে কান্না কাটি।
কেহ বলবে হরি,
কেহ লবে লাকড়ি খড়ি

আছে যাবা কন্যা পুত্র
সঙ্গে যায় শ্মশান ক্ষেত্র
চাবি দণ্ড থাকে মাত্র গৃহ কর্ম ছাড়ি।
তাব পবে সব চলে যাবে
যে যাব আপন বাড়ি।
কেবল থাকবে শ্মশান ঘাটে
ভূত পিশাচীব মূর্তি ধরি।
হবি বল, হবি বল, হবি নাম পথেব সম্বল
আব যত দেখ সকল হবি চাঁদেব পুরী।
স্বপ্নে কেহ বাজা হয়ে, কবে জমিদাবী
কেহ দিনেব বেলা ভিগ মেগে খায়
কেহ বাত্রে করে ব্যবসা চুবি॥

এই গৃহী বৈষ্ণবদেব গানেব ভিতব একাধাবে যেমন দেহতত্ত্ব বিষয়ক পদ পাওয়া যায় তেমনি ওদেব ভজন গানেরও। কিন্তু সেই 'ধান ভানতে শিবেব গীত'। এব ভিতবও একটু দেহতত্ত্বেব ছোঁয়াচ আছে :—

গুরুগো তোমাব শ্রীচবণে
বড দুঃখেব নালিশ আমাব।
আমি চিব দুঃখী, মহা অপরাধী
উকিল, মোক্তাব কেউ নেই আমাব,
গুরুগো ডাকাইতেব দল ঘবে ঢুক্যা
বন্দুক পিস্তল হাতে নিয়া
নানা ভাবে করে অত্যাচার।
আমাব সিন্ধুক ভরা মোহর ছিল
(তাবা) লুটে পুটে কবল ছারখার।
(গুরুগো) বসত বাড়ির চাবি ধাবে
ডাকাইতের দল বসত করে।
(আর) মনা ডাকাইত ঐ দলের সর্দার
আছে পাহারাদার ঐ দশ জনা
তারা দশে মিলে হয় অংশীদার।

(গুরুগো) অসৎসঙ্গ বাড়ি-খানা
জমিদারের খাজনা দেনা
(এখন) দেনা শোধের কি করি উপায় ?
আমায় কখন যেন উচ্ছেদ করে
আসে বুঝি ইজারাদার।
(গুরু) নালিশ করলাম শ্রীচরণে
তলব দেও আসামীগণে।
দয়া করে সুবিচারে
গৌরাঙ্গ কয় চরণ ধরে।

আমাদের পাঠকগণ সখী সংবাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই পরিচিত আছেন। এইবার শুনুন, শ্রীকৃষ্ণ বিরহে রাধার অবস্থাটা কি :—

লম্পটের প্রেম বড় কঠিন
রাধে রাখা বিষম দায়।
প্রথম পীরিতির কালে
কত মধুর কথা বলে
দেহ মন চরণে বিলায়।
তোরে নিষেধ করি বারে বারে
প্রেম করিসনা শঠের সনে
শিকল কাটা পাখীর মত ধায়॥
যখন ফুলে মধু থাকে
ভ্রমর আসে ঝাঁকে ঝাঁকে
চুপে চাপে ফুলের মধু খায়।
ফুলের মধু শুকাইলে
ভ্রমরা যায় গো চলে
আর নাহি ফুলের পানে চায়॥

কিন্তু এতে কি আর রাধিকা প্রবোধ মানতে চায়, তাই সে উত্তর দিচ্ছে :—

আর কত কাল রবরে কালা
তোমার আশা পথ চাইয়া।

আমার চাইতে চাইতে জনম গেল
সময় গেল বইয়া রে কালা
তোমার আশা পথ চাইয়া।
কত নিশি জল পান বিনে
কান্দি রইয়া রইয়া,
আসি বলে আশা দিয়ে
শ্যাম গেল চলিয়া॥
আমি একাকিনী সই কেমনে রব
অচিন পথের পানে চাইয়া॥
জলধরের কালো মেঘে
আকাশ গেল ছাইয়া।
আমার হৃদয় মাতানী মালা
গেল বাসি হইয়ারে কালা
তোমাব আশা পথ চাইয়া॥

এইখানেই বাধিকার বিলাপেব শেষ নয়। এব পবও বৃন্দা দূতীকে বলতে শুনি:—

এমন রসের নদীতে সই গো
ডুব দিলেম না।
নদীর কূলে কূলে ঘুরে বেড়াই
সই পাইনা ত' ঘাটের ঠিকানা।
নিত্য ঘাটে স্নান করিতাম
জলের ছায়ায় ঐ রূপ দেখিতাম (লো)
জলে নামিলাম আশা করি
সই মরণের ভয়ে নামলাম না।
জলে পদ্ম, স্থলে পদ্ম,
পদ্মে কত মধু আছে লো,
কালো ভ্রমর জানে মধুর মর্মর
সইগো গোবরা পোকা জানে না।

চণ্ডীদাস আর রজকিনী
তারা প্রেমের শিরোমণি (গো)
তারা এক প্রেমেতে দুই জন মরে
এমন মরণ মরে কয় জনা।
(আবার) বিল্বমঙ্গল চিন্তামণী
দুগ্ধ টেনে উঠায় ননী (গো),
সাপের লেজ ধরে ঘরে গেল
সইগো তবু সাপে দংশেনা।

এই প্রসঙ্গে যোগ করা যায় :—

প্রেম বাজারে কামাররে ঠকাইলাম
ভাঙ্গা চুরা লোহা দিয়া দাও গডাইলাম,
কামাররে ঠকাইয়া কোমরে রাখিলাম টাকা
তামার পয়সা হাতে দিয়া বাডি আইলাম চইলা।
যদি কামার ভাল হ'ত
মনের মত দাও গডাইত
পূর্বের শত্রু কাটা যেত
বাপ দাদার গোলাম।
হরি কোমল বলে কামার
কি দাও বানাইলা আমার
শুধু শুধু গোপাল আমার
হাতি নাই তাওয়াই লা।

এই সব মোঠোগান রচনায় যে হিন্দু কৃষাণরাই ওস্তাদ তা' নয়। চাষী অর্থে হিন্দু, মুসলমান, দেশী খ্রীষ্টান সকলকেই বুঝতে হবে। আমরা এই মেঠো গানের ভিতর এখন দু'একখানা মুসলমান চাষীর রচা গানও উপহার দিচ্ছি। রসিক সমাজই বিচার করবেন বাংলা যাদের মাতৃভাষা তা'রা যে ধর্মাবলম্বীই হ'ক না কেন, তাদের সকলেরই গানের মূল সুর প্রেমের বীণাতে বাজবেই। মনে করা যাক, (যেন কোন যাত্রার আসর) শ্রীরাধিকা যেন বিরলে বসে ভাবছে শ্রীকৃষ্ণের কথা। এমন সময় বিবেক (বিবেকের বিষয় এর আগে 'কৃষ্ণলীলায়'

যথেষ্ট বলা হয়েছে) এসে রাধার মনের কথার উত্তর দিচ্ছে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে :—

ওরে আমার মন
কি দেখে ঝাঁপ দিলি।
প্রেম সায়রের জলে
স্নান করবি বলে,
কর্ম্মসূত্র ঠেলে কাম সাগরে ডুবলি।
টি টি পক্ষীব আশা যেমন
সমুদ্র বান্ধিতে পাথার করে,
আনে বালু ফেলে সমুদ্রেতে
তেমনি আশা ওব নিশা খোর।
তুই বিড়াল হ'য়ে সিংহের সনে উপমা সাধাইলি।
এক নদীতে তিনটি ধারা বহে বীতিমতে
জীবেব কিবে সাধ্য আছে,
সে সন্ধান জানিত চণ্ডীদাস বাঁচিতে।
ও তুই আলসে আলসে সকলি হারালি ॥
মায়ের স্তনে দুগ্ধ থাকে, চুষে খায়না লোকে
সে দুগ্ধের বোঁটা যদি ধরে চিনা জোঁকে।
(ও) সে রক্ত চুষে খায়, দুগ্ধ নাহি পায়
ঈশান বলে প্রেম সাগরের এই মত প্রণালী।
সে নদীতে বহে সদাই বারি,
হের বসতি দিলে যথা তথা,
ব্যথা যায় না তার রীতি
বলি তাহার কাহিনী সংক্ষেপে,
সে ভবানী কুল কুণ্ডলিনী মহামায়া কালী।

পরিচ্ছেদের গোড়াতেই বলে নিয়েছি, মেঠো গানের ভিতব সব রকম গানেরই সমাবেশ দেখা যায়। এরা যে শুধু ধর্ম-তত্ত্ব, দেহ-তত্ত্ব নিয়েই থাকে তা' নয়। শ্লেষ, ব্যঙ্গ, বিদ্রুপও এদের গানের অন্যতম প্রধান বিষয় বস্তু। এই ব্যঙ্গ গীতি রচনায় হিন্দু চাষী অপেক্ষা মুসলমান চাষীরাই সমধিক ওস্তাদ।

আমরা এখানে কোন এক প্রৌঢ় মুসলমান চাষীর মুখে যে গান শুনেছি সেইটেই আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি :—

কলির লীলা আজব খেলা বুঝা ভার, কথায় কথায় মিথ্যা কথা
সত্য কথার নাই বিচার।
লোকের নাই সে ধর্মে মতি, নাই সে পূবের রীতি নীতি
শূদ্র, বিপ্র, বশ্য, ক্ষাত্র সব হইয়াছে একাচার ॥
রাজার নাই সে ধর্মে মতি পূজায় তাই ঘটেছে দুর্গতি
দুই চার টাকা দিলে ক্ষতি, সকল মিথ্যা হয় আচার।
নব্য বাবুগণ যারা চাপ দাড়ীব প্রণাম ছাড়া
মানেনা পিতা মাতার শ্রাদ্ধ, ধরে মাছ, মাংস ভক্ষণ করে।
সন্ধ্যা করে বারের ঘরে জাতি কুলের নাই বিচার ॥
ব্রাহ্মণের নাইসে পূর্বের লক্ষণ, ফোঁটা দিয়ে হয় বিলক্ষণ
আর মাত্র চণ্ডী পড়ে, তন্ত্রের নাই বিচার।
কেবল বলে দাও দক্ষিণা, চাইয়া বসে দেরাদুনা
একটি পয়সা কম নিবনা, তর্ক করে বারে বারে ॥
নব্য নারীগণ সকলে, শাশুড়ীর কথায় নাহি চলে
তেরা সিঁথায় পরে চুলের বেড়, খেলাপ করল সার।
স্বামী মন্দ বললে পরে, কথা কয়না লাজ ভরে
হাত পাও নাড়ে বারে বারে, মুখখানা কালা চমৎকার ॥
নব্য-কাল চান্দি মতে, বউ ঝি গেল শিক্ষার পথে
ফুলের মালা চন্দন হাতে, সাধু সেবা করলেন সার।
তারা লজ্জা সরম ত্যাজ্য করে এল সাধুবাজারে
কেহ কেহ কয়দিন পরে সাধু নিয়ে দেয় সাঁতাব ॥

দাঁড়ী-মাঝিদের গান আমরা 'বারমেসে' গানের ভিতর বিলক্ষণ আলোচনা করেছি, এই বার আমরা পূর্ববঙ্গের জেলে-জিয়ানীদের গানের কথা কিছু বলব। কাজ তাদের মাছ ধরা। কিন্তু তাই বলে যে তারা গান গাইতে পারবেনা এমনত' কোন আইন নেই! তাই দেখা যায় সন্ধ্যা থেকে শেষ রাত পর্যন্ত বড় খালের মুখে বা ছোট নদীতে এইসব জেলেরা ভেসাল বেঁধে বসে থাকে মাছের আশায়। এই অবসর এবং প্রতিক্ষমান সময়ে দেখা যায় তাদের গান গেয়ে

সময় কাটাতে। এই গান যে শুধু তাদের মাছ ধরার গানই হবে এমন নয়। অনেক সময় বহু ভাল ভাল রসাত্মক গানেরও সন্ধান মেলে এদের ভিতর থেকে :—

দুঃখিনীরে অকুলে ভাসাইয়া
কোথা যাও হে প্রাণবন্ধু কালিয়া।
ও বন্ধুরে আর কি বলিব তোরে
সকলি আমার কপালে করে
এখন কেন যাইবারে ছাড়িয়া ॥
তুমি তিলেক দাঁড়াও
ফিরিয়া চাও, না দিব ছাড়িয়া ॥
অ' বন্ধুরে, এত যদি ছিল মনে
পীরিতি শিকল কেন
এখন কেন যাইবারে ছাড়িয়া ॥
আমি মরিলে যেন তোমাকে পাই
পুনঃ জনম লইয়া।
বন্ধুরে তুমি যদি ছাড় মোবে
আমি না ছাড়িব তোমারে
তবে কেন যাইবারে ছাড়িয়া॥
ও দীন মহেন্দ্র কয়,
প্রেমের আলসে দীপ দিল জ্বালিয়া॥

কিংবা :—

ভরা নদী বলছে কানে কানে
আয়না লো সই, ডুব দিয়ে যাই।
একটি প্রাণে হবে না লো সই
আয়না লো সই ডুব দিয়ে যাই ॥
নতুনের যৌবন বাহার যেদিন উঠিল
ফুলে ফুলে মধু বায়
আয়না লো সই ডুব দিয়ে যাই।

দূর থেকে মনে হয় পল্লীর শান্ত, সমাহিত ভাবধারায় জীবন চলে আপনার গতিতে। ক্ষণে ক্ষণে এর নূতন রূপ, নব নব এর ভাবের মূর্ছনা। কিন্তু একটু

তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে এখানে প্রাকৃতিক বৈচিত্র ছাড়া মানুষের জীবন যাত্রা চলে ঠিক একই ভাবে। শহরের ঘড়ি বাঁধা কাজের চাইতেও যেন এক ঘেয়ে।

কিন্তু এক ঘেয়ে জীবন যাপন মানুষেব প্রকৃতি বিরুদ্ধ কাজ। কি শহরে কি পল্লীতে এই এক ঘেয়েমীকে দূর করবার জন্যই মানুষকে মাঝে মাঝে সময় কাটাবার উপায় খুঁজে বার করতে হয়।

পল্লী গৃহস্থের সময় কাটাবার উপায় 'বারমেসে' গানের মাধ্যমে বোঝাবাব চেষ্টা পেয়েছি। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ ছাড়াও যারা রয়েছে তাদের কি উপায়? পল্লী অঞ্চলেও হাট বাজার আছে, সেখানে আছে দোকান, আডত। দোকান এবং তাদের ব্যবসা খুলে রাখতে হয় এখানেও রাত বারটা পর্যন্ত। কিন্তু সন্ধ্যের পরই দোকানগুলি সাধারণতঃ থাকে ফাঁকা, কচিৎ কদাচিৎ হয়ত বা দু'একটা খদ্দের আসে। তারই প্রতীক্ষায় তাদের আলো জেলে বসে থাকতে হয়, কিন্তু এইভাবে সন্ধ্যের অন্ধকার থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত চুপটি কবে বসে থাকার চাইতে আর শাস্তি কী আছে?

মানুষ নিত্য নূতন আবিষ্কারের পথ খোঁজে, সময় কাটাবার জন্য। কেউ পড়ে উপন্যাস, কেউ খেলে তাশ-পাশা, কেউ যায় সিনেমা, থিয়েটারে। কিন্তু পল্লীর এই শান্ত, ধ্যানমগ্ন সমাধিতে বসে এখানে ত' এসব কিছুই হবার নয়, বিশেষতঃ এই সব দোকানদারদের পক্ষে। তখন তারা পাঁচ সাতজন দোকানের কর্মচারী মিলে খোল করতাল সহযোগে শুরু করে দেয় একপ্রকার মেঠো কীর্তন। একে না বলা চলে কীর্তন না হয় ভজন। তবু এদের ভাষায় 'ভজন'ই—এরা গাইতে থাকে :—

তুমি এসো হৃষিকেশ এসো তুমি হৃষীকেশ
তুমি না করিলে দয়া তোমারই মহিমা গান
কেমনে গাহিব মোরা॥
এমনি গাহিব মোরা ভক্তি প্রাণে ভরি
এসো মানুষ মনোরমা রঙ, এমন রসিক রস ভৃঙ্গ
ভাব অতি ভঙ্গে এসহে ত্রিযুগল পরাণ॥

গাজীর গানের গায়করা সাধারণতঃ মুসলমান। তারা হিন্দুর দেব দেবী নিয়ে গান রচনা করে অনেকটা জারী গানের মতই। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের

ভিতরই ঐ গাজী গায়কদের মত একটা সম্প্রদায়ের দেখা পাওয়া যায় তাদের বলে উদাসী—এদের গানের বিষয় এর আগে বলে নিয়েছি। সাধারণতঃ এরা বাউল বৈষ্ণবদের মতই গান করে। তবে শ্লেষাত্মক বা বিদ্রূপাত্মক গান রচনায়ও এরা সিদ্ধহস্ত। এদের এই সব গান নিছক সময় কাটাবার হলেও এর ভিতর অনেক সময় ছোটখাট ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান মেলে। যদিও এগুলি মেঠো গান, কিন্তু এরা অনেকটা লালন সাঁই গানের মত :—

ভেক লয়ে কি ঠেকলাম বিষম দায়
হায় গো হায়।
আমার বোষ্টমী চায় চিহ্ন কাপড় রে
(ও) কাপড় কোথা গেলে পাওয়া যায় (রে)
হায় রে হায় ॥
অকালে গেলাম ঢাহার বাড়ি, হায়রে সঙ্গে কড়ি নাই।
এখন চাকরী হবে কী কী উপায়।
আমি মনে ভাবি যুদ্ধে যাব কিন্তু কখন যেন প্রাণ যায়
হায় রে হায়।
যখন আড়াই পো চাউল টাহায় ছিল তখন ভিক্ষা যাওয়া যে বন্ধ ছিল
এখন না দেখি উপায় ॥

কিন্তু এদের বেশীর ভাগ গানই নির্জলা হাসির খোরাক :—

ওগো মালিনী পায় ধরি তোরে উলনতায়
পিপাসা ছোটে, তোর মাথায় ওঠে ঝুল কালি,
ওগো মালিনী পায় ধরি তোর উলনতায়।
যখন মুখখানা করলি ভার, তখন কলকি অবতার
পেঁচা নাহে হ্যাণ্ডেল পরে দেখতে কী বাহার।
একটু দুধ নিয়ে গোপন করে খাই আমি,
ক্ষুদার জ্বালায় প্রাণ বাঁচেনা সইব কেমনে
মালিনী পায় ধরি তোর উলনতায়।

কিংবা :— কোথায় যাও আমারে ফেলায়ে, ঠাকুর হে—
ও ঠাকুরহে, বিয়া হ'য়েছিল নয়া-বাড়ি
শিশু কালে হইয়াছি রাঢ়ি গো,

আর তোমারে আনিলাম কত কিল গুতা খাইয়া।
ঠাকুর হে, কোথা যাও আমারে ফেলাইয়া ॥
ও ঠাইরান গো, বিয়া হইছিল কুমডা খালি গাঁ'এ
তোমারে পরাইলাম শঙ্খ শাড়ি,
ও ঠাইরান গো, কোথা যাও আমারে ফেলাইয়া ॥
আর তোমার রূপ দেইখা আমি হইলাম পাগল গো
ও ঠাইরান গো, তোমারে আনিলাম কত কিল গুতা খাইয়া ॥

অথবা :—

ও আমি সাধে করলাম দুই বিয়া
ও আমি সুখে কাটাই সংসারী লইয়া।
আমার এই গিন্নীতে কাজ করে না
আর এই গিন্নীত' থাকে শুইয়া (গো)
আমি সুখে কাটাই সংসারী লইয়া ॥
আমার এক গিন্নী হলেন রাণী ভবানী
আর এক গিন্নী হলেন কাঁচা তৈল
আর আমি হইলাম হেচরা গাছের ডাল ॥
কর্তা আগে যদি জানতাম আমি ডাইলের এত মজা
তবে বিয়া করত কোন্ শালা।

কখনও কখনও মুসলমান গাজী গাইয়েদের মুখেও শোনা যায় :—

মরি হায়, হায় রে মোল্লা হায়, এখন কী করি উপায় ?
ঐ মুরগীর গর্জনে আমার পরাণ উইড্যা যায়।
উস্তা বেচতে গেলাম চাচা খালিফার বাজারে
(আর) ময়দান পাথারে পাইয়া কিলাইলাম চাচাবে।
এক পয়সার মিঠাই কিনিয়া পথে খাইলাম খাইয়া
বাড়ি আইলাম পরে বউয়া কিলায় গায়ের গন্ধ পাইয়া।

আমাদের ছোট সময় দেখতাম পটুয়াদের গাঁএ গাঁএ ঘুরে পট খেলা দেখাতে। সভ্যতার আলোক রশ্মিতে আমরা জানবার ও বুঝবার জন্য উৎসুক সর্ব সময়ই। এজন্যে আছে সংবাদ পত্র, সিনেমা আরও কত কি। কিন্তু পূর্ববঙ্গের এমন পল্লী এখনও আছে যেখানে এখনও সপ্তাহে মাত্র একবার ডাক বিলি হয়। থানা,

ডাকঘর, স্কুল এমন কি হাট বাজার পর্যন্ত নেই। শহর বলতে তাদের কাছে পার্শ্ববর্তী বর্ধিষ্ণু গ্রামের বাজার, মহানগরী অর্থে মহাকুমার ক্ষুদ্র মফস্বল শহর। চাষ করা, আর জীবন ধারণ করাই হ'ল তাদের একমাত্র কাজ। এই সমস্ত পল্লীতে এখনও এই পটুয়াদের সমাদর আছে। পটুয়ারা এইসব জায়গায় এখনও আগেকার মতই এদেব গান শোনায়। তাদের পটে আঁকা থাকে বাধাকৃষ্ণের বিবহ-মিলন কাহিনী, হর পার্বতীর কথা, মনসা, চণ্ডী সব দেবতা থেকে গান্ধী, সুভাষ চন্দ্র এমন কি যুদ্ধ পর্যন্ত। অনেক সময় গ্রামের সামান্যতম কাহিনীকে, এরা এদের ছবিতে রূপ দিতে চেষ্টা করে। এই পটুয়াদের পট খেলা দেখাবার সময় গান গাইতে শোনা যায়ঃ—

মাঝি বেহুশ হইও না।
ও তুমি চোবের সঙ্গে নৌকা বাইও না।
চোরের সঙ্গে নৌকা বাইলে
মাঝি, নৌকা ডোবে ছাড়া ভাসে না।
ওবে মহাজনেব মালভরা হলে
পদ্মা পাড়ি দিও না।
পদ্মা পাড়ি দিলে পরে
বিনাশ ঘটিতে পারে
তাইতে, মাঝি করি তোরে মানা।

হিন্দু সমাজে যেমন তাঁতী আছে—কাপড বোনে, মুসলমান সমাজে তেমনি আছে জোলা। কাজ তাদেরও তাঁত বোনা। এই তাঁত তাদেব মেয়ে পুরুষ উভয়ে এক যোগেই বোনে এরা নামে মাত্র মুসলমান। কিন্তু এদের আচার ব্যবহারেব বেশীটাই হিন্দু ঘেঁষা। সারাদিনই দেখা যায় এদের তাঁত চালাতে। এই তাঁত চালাতে চালাতে তাদের গান গাইতে শোনা যায়। গাজী, খেউড় ও জারী গায়কদের অনেকেই এই জোলা শ্রেণীর। তাই তাদের গানগুলিতে জারী ও গাজীর সুরই পুরোমাত্রায় পাওয়া যায়।

এই তাঁত চালাবার সময় তারা গায় নানা রকমের গান। এক ঘেঁয়েমী দূর করবার জন্য তাদের মাঝে মাঝে তরল হাসির খোরাক স্বরূপ একটু আধটু ব্যঙ্গ গীতিও গাইতে শোনা যায়ঃ—

মরি হায়রে আল্লা হায়,
আমি কী করিব কোথা যাব না দেখি উপায়,
কলিকাতা আইসা আমি ঠেকলাম বিষম দায়।
আমি পেরথমে বন্দুনা করি, শিক্ষা গুরুর পায়
(ঐ) যে গুরুতে হাতে ধরে শিখায় ডাইনে বায়।
দেখেন অন্য দফায় যেমন তেমন, এই দফায় যোম
ঠেইলা নিব এই ভাবে, শনি, রবি, সোম।
(হারে) তালিমে বলে ত' মুন্সী চল হাটে যাই।
সোলার নৌকার পাখায় উইঠা পরীক্ষা চালাই।
সেবিচ আগুনে না যায় পোড়া গাইতে না যায় তাল
এমন চীজ দিয়াছে আমায় মুন্সী জোড়া তাল।
এই সোম বারের মধ্যে বাহাত্তর হাজার
নুড়ী বন্দী করলাম এবাব তিন শত আট জোড়া।
হয় অযুতের মাঝারে মারি হাস্তরে হায়
আছে মা'র চাইর, বাপের তিন, গুরুব দ্বাদশ
এই আঠার মোকামের খবর, যে জানে মানুষ
মানিবে কোন্ দেবতা মাঝে
(মবি হায়রে আল্লা হায়)

আছে সুদ খোর, হারাম খোর, খুনিয়ার জোদ্দার
এই চার মা দিয়া দিবেন দোকানের খুটা।
মুসলমান হইয়া যেবা কেতাব নিন্দা করে,
রাত্তি হইলে শিয়াল হইয়া হুক্কা, হুক্কা কবে।
আবার আল্লা বান্দা, বাড়ির বান্দা, যে যেখানে থাক,
এমন দিন গেল বিরথা কামে, আল্লা আল্লা বল।

কখনও কখনও এরূপও শোনা যায়ঃ—

বলি এই সভাতে মন মইজাছে বাইদার পীরিতে
(ও) আমার কি ক্ষেণে দেখা হইল বাইদার সাথে
(ও) আমার প্রথম দেখা অষ্টমীর ছিনানে
(ও) আমায় কথাতে হরিল পরাণ গো।

(ও) আমায় বাহির কইরা আনল, ওসে শেষ নিশাতে।
(ও) আমি কুলের ছিলাম কুলবধূ গো
কি জানি কি করল যাদু গো
(ও) আমার ইচ্ছা হয় যেন যাইগো বাইদার সাথে।
বাবু বাইদা বোলে গাউয়াল করে না
বিলাতী মাল পাওয়া যায়না
নাই মালের আমদানী।
এবার আল্লায় যদি হরে গো দয়
সবম করতাম মাটী,
বাঁচতাম আমরা বাইদা বাইদানা।
(ও) বাবু, বয়সত' আমার বেশী নয়
বাইদা মোরে বুড়া কয়, বয়স, বছব পঞ্চাশ হয়।
(ও) এবাব চৌদ্দ নিহাব পবে পাইলাম
পাগলা সোয়ামী
(ও) আমি পূর্বে ছিলাম সন্ন্যাসী।
(ও) আমার আহ্লাইদা সোয়ামী
বাপের বাড়ি নাইওর যাইব
নাইওব যাইতে দিবা নি।
(ও) আমি আইজকে যাব, কাইল আসিব
কাইন্দনা গো তুমি,
(ও) আমার মাউগা চাটা সোয়ামী
(ও) বাবু নাইওরের কথা শোনলে পবে
আঁচল ধইরা কান্না করে
(ও) আমার মাউগ চাটা সোয়ামী।
(ও রে) আমি কি তোর টাকা পয়সা, শিকি দোয়ানী
যে বাক্‌সে রাখবা তুমি।
(ও) আমার মাউগ চাটা সোয়ামী॥
(ও বাবু) এমনি ভাবে গেলে পরে
আসব আবার দুই চার বছর পরে
থাকব আমি বাপ ভাইয়ের ঘরে।

(ও রে) আমি কি তোর ভাঙ্গা তালার চাবী
যে মাজায় রাখবা তুমি ॥

এ সব গানই কাল্পনিক। গানের ধরণ ধারণে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে উপরের গান হয়ত কোন বেদেনীরই রচনা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা' নয়। বেদে-বেদেনীর বিষয় 'বার-মেসে' গানের ভিতব বিশদ ভাবে বলেছি। এগুলি ওদের অনুকরণেই রচিত।

ছাত পিটনোর গান শুনেছেন নিশ্চয়ই। শুনুন তা' হলে আব একবার :—

একখানা বোন্দাল বাড়ি যাইতাম ঘুরি
হারালাম না আর মুই এইখানে।
হারে কাজে খাইলে কিয়া, হারাতাম ছাই,
কত হাতে ধরি, হ্যান্ত করি,
বইচা মাছ দিয়া ভাত খাওয়াই,
এখনে কী করমু, কোথায় যাইমু, চিতাল মিঠাই নাই।
আরে বন্ধু, গুন্ গুন্ স্বরে গীত গাইয়া যাও,
তখন মুই ঘরের কোনে বইয়ম, বইয়ম,
পরাণ পোরে ছাই, ছাই।
এখন কী করমু, কোথায় যাইমু
ঘরে চিতাল মিঠাই নাই।

বহুরূপী গানের বিষয়ে আমরা এর আগে কিছু কিছু আলোচনা করেছি। কিন্তু পূর্ববঙ্গে মেয়ে-বহুরূপীও যে দেখতে পাওয়া যায় এ খবর নিশ্চয়ই অনেকেই জানেন না। মেলায় বসে দোকান পাঠ। আসে রঙ, তামাসা, সঙ ও বহুরূপী। গানে যে মেয়ে-বহুরূপীরা বেশী ওস্তাদ তা' নয়। তবে যেহেতু মেয়ে— সেই হেতুই তাদের একটা নাম আছে। তবে, মাঝে মাঝে মেয়ে পুরুষ একত্রেও দেখা যায়। এই বহুরূপী গায়কদের গান অধিকাংশই ব্যঙ্গ রচনা এবং সাম্প্রতিক খবরাখবরের উপরই ভিত্তি করে রচা :—

কলিকাতার কেতা চমৎকার
কি ছার মানব দেহ,
আছে দুই ধারে দুই গ্যাসের আলো
সোনার সংসার দীপ্ত করে সেটা।

শুনেছি লাল দীঘির পানী
সেটা মিষ্টতা শুনি,
কেহ বলে ভাই লোনতা লাগে
ধর্মের কাজ হাঁসিল।
সে যে ধর্মতলার টেরাম গাড়ি
আসা যাওয়া বারংবার।
যদি গো বৌবাজারে যাও
তবে সাচ্চা কাম বাজাও,
ছুটি হরি নামের মণ্ডা কিনে
ঠাণ্ডা হয়ে যাও।
শুনেছি হাড কাটা গলি
সেটা বর্তমান কলি,
হাড় কেটে হাড মুচড়ে ভাঙ্গে
দেয় নর বলি।
তারা মায়াকালী, মায়া করে
এক কোপেতে করে সংহার।

এবং :—

কেরে ডাকিলি আমায়
রতন মালা বলে।
(ও যে) খাটো খুটো মোটা গোটা
বৈরাগী গেছে ছেড়ে।
করিয়া পীরিতির ছন্দ,
বন্ধু গেছে লাঙল-বন্ধ (রে)
খাটো খুটো মোটা সোটা
বৈরাগীরে তোমরানি দেখছ যাইতে।
(ও) আমার শিশুকালে শিশু মতি,
বয়সের কালে মইল পতি (রে)।
(ও) আমার যৌবন কালে
না পাইলাম তারে।

স্থথ বসন্ত স্থখের কাল
(ও) প্রাণ কাঁদে কালা চাঁদ বলে (রে)।

পূর্ববঙ্গে নাগাচর্চী বলে এক সম্প্রদায়ের লোক আছে। তা'রা না হিন্দু, না মুসলমান। তাদের আচার ব্যবহার সবটাই হিন্দু ঘেঁষা, তবে খানিকটা মুসলমানী লক্ষণও দেখা যায়। এরা কালী, দুর্গা, হরি, শিবকে প্রণাম জানায় আবার মুসলমান বাড়িতেও খেতে আপত্তি করে না।

এদের জাত ব্যবসা, লেপ-তোশক তৈরী করা ; আর অবসর সময় ঢাক, ঢোল ও সাঁনাই বাজান। এরা হিন্দুর মত কাপড় পরে, নাম রাখে হিন্দুদেব মতই। মোটামুটি ভাবে হিন্দুর সব কিছু পালন কবেও এরা হিন্দু নয়। এদের সমাজে যে গীতি ও গাথার প্রচলন আছে সেগুলির দিকে নজব দিলেই দেখা যাবে এদেব গান পুরোমাত্রায় হিন্দু ঘেঁষা :

হারে আমার সোনার চাঁদ পাখী,
হারে আমার ময়না বনের পাখী।
ও তুমি আমারে ভুলিয়াছ বন্ধুরে
ও তুমি ঘুমাইছ নাকিরে,
হারে ঘুম যেওনা বন্ধু, না যাইওগো নিদ্রে।
আরে কোন্ সময় কোন্ চোব এসেরে
ও তোমার ঘরে দিবে সিঙ।
ওরে চোরের বাড়ি, চোরের ঘর, চোরে চোরে মেলা,
যেদিন আট কুঠীরে লুঠে নিবেরে
ভেঙ্গে নিবে তোর তালারে, ও তোর কুলুপ তালা রে।
এসে পিঞ্জিরায় থাকিতে ময়না,
আমার কথা রাখ,
তোর দিন গেল ভাই বৃথা কাজেবে
এখন রাধা কৃষ্ণ বলে ডাকো।
এসে পিঞ্জিরা ছাড়িয়ে যেদিন
পড়বেন কৃষ্ণ ডালে,
তোমার দিন গেল ভাই বৃথা চিন্তায় রে
ও ময়না সঙ্গে আয়না লো আমার।

দশ জনকে নিয়েই দেশ। দেশ বলতে আমরা খানিকটা জায়গাকে বুঝি না, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেই দেশের বিত্তশালী থেকে দীনতম ভিক্ষুককে পর্যন্ত বুঝে থাকি। দেশের কথা বলতে বসলে এই ভিক্ষুক সম্প্রদায়ের কথাও না বলে পারা যায় না।

এরা না হিন্দু না মুসলমান—এরা সকলেরই। সকলেব দয়াতেই এদের যখন দিন কাটে তখন সকলের গানই ত' এদের কাছে পাওয়া সম্ভব। যদিও এরা খাজনা দেয় না কোন জমিদারকে, টেক্স দেয় না কোন কোন বোর্ড পঞ্চায়েতকে, তবু এরা পাঁচ জনের দয়াতেই বেঁচে আছে। থাকে, খায় অপরের দয়ায়, ইচ্ছে হ'লে তাবা মুক্ত পাখীব মতই এক দেশ থেকে আরেক দেশে ঘুবে বেডায়।

এই ঘুরে বেডাবার সময়, অর্থাৎ ভিক্ষা করবার সময় কেউ কেউ শুধু মুখে 'ভিক্ষা দাও—' বলেই ভিক্ষা চায়। কোন কোন ভিখারীকে শোনা যায় গান গেয়ে ভিক্ষা করতে। এদের অধিকাংশেরই না আছে কোন বাদ্য যন্ত্র, না থাকে বিশেষ ধরনের কোন গীত।

তবে অনেকে এরকম প্রশ্ন করতে পারেন, এরাকি এ গানগুলি নিজেরাই বাঁধে না অন্য কারু দ্বারা? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া খুবই অসম্ভব। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদেব গান এরা নিজেরাই রচনা করে। অনেক সময় এদেব এইসব গানেব ভিতরও অনেক তত্ত্ব কথা শুনতে পাওয়া যায় :—

প্রবোধ মানবে কেনে
বলি সে দুঃখ পেয়েছে প্রাণে
প্রবোধ মানবে কেনে?
বলি, নিমাই একবাব চাও
ওরে জন্মের মত গেল চলে
নিমাই একবার চাওনা ফিরে।
ও তুই ফাঁকি দিয়ে গেলি চলে
নিমাই একবার চাওনা ফিরে।
ওবে এ খবর কেউ জানে না;
জানে জানে আর সেই সে জানে,
বলি আমার মা যে হয়েছে, সেই জানে।

বহু আবাধনা কবে নিমাই
আমি তোমায় পেয়েছিবে।
ও কি দোষেতে আমায় গেলি ছেড়ে
আমার এই কি ছিল কর্মফলে
বাপ্ দিয়ে দুখিনীবে দাগা।
ওবে তুই আমাব বাছাব বাছা
দেখা দিয়ে প্রাণ বাঁচা,
আমাব এই কি ছিল কর্মফলে
বাপ দেখা দিয়ে প্রাণ বাঁচা।
ও তুই দেখে যা তোব মাতা,
ও যে পুত্র শোকে যে যাতনা
আমাব দুঃখ কেউ বোঝেনা
দেখা দিযে আমাব প্রাণ বাঁচা।

কখনও কখনও :—

জাগো জাগো জাগো মা, জাগো আব ঘুমাইও না
একবাব জেগে দেখ জন্মেব মতন, আব ত' দেখা পাবে না।
আদব কবে এনে ছিলে মা, পোষা পাখীটি,
মা আজ উড়িয়ে দিলে,
এখন শুধু খাঁচা বইল পড়ে, মা মা বলে আব সুধা'বনা।
যখন নিমাই নিমাই বলবে শুধু, নাই নাইবে আব শুনবেনা।
ঘবে বইল বিষ্ণুপ্রিয়া, বেখো তাবে প্রবোধ দিয়া
আমাব ঘবে বইল বিষ্ণুপ্রিয়া, গেলাম তারে ফাঁকি দিয়া
ক'বনা ভৎর্সনা।
কেঁদে কেঁদে হবি সাবা, পাবি না মা নিমাইব সাড়া
দু'নয়নে বইবে ধারা, কাঁদিয়া কূল পাবি না।
বেশ ভূষা সব পড়ে রইল,
প্রাণের নিমাই বিদায় হইল,
যতই বলবি নিমাই নিমাই
নাই—নাই, ডাক আব শুনবি না।

নদের চাঁদ মা আজ অস্ত গেল
তাকি তুমি দেখ্‌লে না,
যতই বলবে নিমাই নিমাই
নাই—নাই ধ্বনি আর শুনবে না।

পূর্ববঙ্গে বিবাহের পরদিনকে বলে বাসী বিয়ে—একথা প্রসঙ্গতঃ বলা হয়েছে। সাধারণতঃ বরের বাড়ি যদি কাছাকাছি হয় তা' হ'লে বরযাত্রীগণ বাসীবিয়ের নিমন্ত্রণের পরই যে যার বাড়ির পথ ধরে। কিন্তু বরের বাড়ি দূরে হ'লে সেদিন সেখানে থেকে পরদিন বর বউ নিয়ে তা'রা একত্রই দেশে ফিরে যায়।

এই বাসী বিয়ের দিনটি পূর্ববঙ্গের পক্ষে একটু বিশেষতঃ আছে। এই দিন সূর্যাস্তের পর থেকে সারারাত আর বর কনেতে দেখা সাক্ষাত হয় না। বাড়ি ভর্তি লোক। বিকেলের দিকে সন্ধ্যার কিছু আগে বর ও কনে যাত্রীরা সব বসে এক জায়গায়। এমন সময় কনের বাড়ির বাদ্যকারগণ (পূর্ববঙ্গের প্রথানুসারে যত গরীবই হ'ক সাধ্যমত বাজনা, বিবাহাদিতে আনতেই হয়) ঢোল সাঁনাই এবং যদি অন্য কোন যন্ত্র থাকে তা' নিয়ে শুরু করে মলা বাজাতে। এই মলা বাজনা অদ্ভুত কিছু নয়। ঢুলি তার ঢোল বাজিয়ে তার উপর বোল তুলে তা'র কসরৎ দেখায়, নয়ত ঢোল সাঁনাই একত্রেই বাজে, তান ধরে কাঁশী। কোন কোন সময় এই ঢুলিরা বাজাতে বাজাতে গানও ধরে। কখনও বা একজন গায়, ঢুলি তার সঙ্গে বাজায়। বাজিয়ে সবাইকে দেয় আমোদ, পায় পুরস্কার উভয় পক্ষ থেকেই।

সন্ধ্যের কাছাকাছি, পুরুষেরা সবাই বা'র বাড়িতে জমে গেছে, ভেতর বাড়ির মেয়েরাও চিক্ ফেলে (আজকাল চিকের প্রথা প্রায় উঠেই গেছে) শুনতে থাকে মলা-বাজনা, আর তার সঙ্গে তাদের গান :—

কত লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে, উড়ে যায় পাখী।
দেখলাম হরি গোজা, হরি কাগা
কাগাতুয়া, কাকালা কোকিল
আর দোয়েল কাল পেঁচা।
ডাকে শ্যামা চন্দ্রনাম, ডাকে ময়ুরা ময়ুরী
ডাকে পিটু-পিটু-পিই-ই—
কত লাখে লাখে, ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যায় পাখী।

ত্বরা করে বল বুড়ি নীল নদে যা
ওরে বেটা মাথা নেড়ে, যাস কোথা উড়ে
দাদারে-খা, ছাতু-খা— ।

এবং :—

তিড়িং ফড়িং চাচা, তেলা কুচা খা
অ-কেড়া তুযানী—অ-কেড়া তুযানী
ধেড়া নাতু—পেপুনা,
দশন জনা—পাঁচ গণ্ডা
দশে কসে দশ্ ।
নাকেত' নাকুড় উড়ুম দে, চিনি দহ
মাখি ঝুকি, ধান খেতে খুটি খুটি মেঞা ভাই
তেল নাই, নুন নাই, ধান ক্ষেতে গরু গেলে
খেদা-খেদা খেদা— ।

কখনও বা :—

ভাইরে রসিক বলে কে ডাকিল মোরে
আমার বয়স হইযাছে বছর কুড়ি ভাই,
কলুই মুগুরীর মত দাশাইয্যা গেছি বিযা করি নাই ।
আমার মায় কান্দে বিযার জন্য রে
ওরে আমার মন রসনা
আমার বাবায় গঙ্গা পেযেছে
তবু কিন্তু বিযার কথা ভুলি নাই রে ।
যদি জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্বশুর বাড়ি যাই
শালা সম্বন্ধীতে দেখে বলে, বাবায আইছে ভাই ।
(আবার) আমার তিনি বলেন—ঠাকুর পিশারে
ও সে বড়ই আহ্লাদ করে ।
(ও) আবার শ্বশুরে বলে ভায়রা ভাই
আমার আনন্দের আর সীমা নাই ।

অগ্রহায়ণ থেকে পৌষ মাঘ পর্যন্ত শীতের অত্যাচার থাকে এখানে নিতান্তই বেশী মাত্রায । এই সময় দেখা যায় মুসলমান গাছী (যারা খেজুর গাছ কেটে

রস বের ক'রে, তা' জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরী করে তাদের চলতি ভাষায় বলে গাছী) দের যাদের অনেক খেজুর গাছ আছে তা'দের গাছগুলিকে ইজারা নিয়ে (লিখিত ভাবে নয়) গাছ কেটে রস তৈরী করতে।

এই গাছীরা এক স্বতন্ত্র ধরনের মানুষ। সারা বছর করে ঘরের যাবতীয় কাজ। কোন সময় এরা নৌকা বেয়েও পয়সা রোজগার করে। তবে সব চাইতে বড় ব্যবসা হ'ল গুড়ের। শীতের সময় খেজুর এবং গরমের সময় তালের গুড় তৈরীই হ'ল এদের প্রধান ব্যবসা। এরা শীত পড়তে না পড়তে খেজুর গাছওয়ালা পুষ্করণীর পাড়ে অথবা উন্মুক্ত খোলা মাঠের মাঝে এসে এদের তাঁবু ফেলে (চলতি কথায় বলে 'ঘোপা)। এই তাঁবু তৈরী হয় অনেকটা এস্কিমোদের ঘর বাড়ির মত করে। মাঠের শুক্‌নো জংলা ঘাস দিয়েই দেয় এদের তাঁবুর চাল, বেড়া সব কিছু। একটা মাত্র দরজা, তাও অতি ছোট। বন্ধ করা হয় ঝাঁপের সাহায্যে। দিনের খাটুনীর পর সন্ধ্যাবেলা খাওয়া দাওয়া সেরে, ভিতর থেকে ঝাঁপ বন্ধ করে তা'রা শুরু করে গান :—

আমার গোঁসাইরে নি খাজুর খাতি দেখছ নি গাছ তলায়,
আমার গোঁসাই ল্যাজ লাড়ে আর খাজুর খায়,
আমার গোঁসাই যদি শিষ্য বাড়ি যায়
পাছ-দুয়ারে খেয়ে গোঁসাই টালু মালু চায়।
আমার গোঁসাই সীমানন্দ প্রাণ গোবিন্দরে,
গোঁসাইর নলি আছে,
সে যে দয়া করে হেঁচরায় না।
হেঁচরাইল হেঁচরাইতে পারে, দয়া কইরে হেঁচরায় না।
মনরে আমার হরি বল—হরি বলরে—
গোঁসাই বেড়া ভাইঙ্গা ঘরে যাইয়ারে
ও গোঁসাই শিকা কাইটা ভাত লামায়।

অথবা :—

আমার নাম ভৈরব ঠাকুর রামনারায়ণ পাল, রাজ কিশোর মোল্লা
আমার ল্যাখা পড়া ত্যালের দোকান, বাগের হাট খোলা।
আমি সন্ধ্যা বেলা মালা জপ করি,
আমার জপের মালা ছোড় দিদির ঠেন, আমাদের বাড়ি।

(ও) মালা আনতে গেলে লাথি মারে রে,
আবার কেউ দেয় শুধু কান-মলা
কেউ দেয় শুধু নাক মলা (রে)।

গীতি বহুল পূর্ববাংলাব সাময়িক গীতি গানের মোটামুটি ইতিবৃত্ত এইখানেই শেষ করলুম। এইবাব আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হব অকস্মাৎ গীত সম্বন্ধে।

তৃতীয় খণ্ড

অকস্মাৎ

প্রথম পরিচ্ছেদ

"বান এসেছে মরা গাঙ্গে খুলতে হবে নাও।
তোমরা এখনও ঘুমাও ॥
কত যুগ গেছে কেটে, দেখছ কত স্বপন
বদর বলে ধর বৈঠা, জীবন মরণ পণ ॥"

—মুকুন্দ দাস।

পূর্ববঙ্গের পল্লী অঞ্চলে 'বার মেসে' ও 'সাময়িকী' গীতি ছাড়াও অন্য যে সব গানের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায় আমরা এই গ্রন্থে তাদের 'অকস্মাৎ' গীতি বলেই বর্ণনা করব।

এ গানের জন্ম হঠাৎ কোন ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে। এর ভিতর সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক এমন কি অনেক সময় বহু ঐতিহাসিক তথ্যেরও সন্ধান পাওয়া যায়। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই সব গানের রচয়িতাগণ অধিকাংশই নিরক্ষর ও অর্ধ শিক্ষিত চাষাভূষার দল।

আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য এই খণ্ডের যাবতীয় গানগুলিকে জাতীয়তা বাদী, সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে লেখা, এবং জাপানী আক্রমণ থেকে 'ফুড কণ্ট্রোল' ও বঙ্গ বিভাগ পর্যন্ত—এই তিন অংশে ভাগ করে দেখাব।

১৯০৫ সালে শুরু হ'ল বাংলা তথা ভারতের নব জাগরণ। 'বঙ্গ-ভঙ্গের' ধুঁয়া ধরে বাঙ্গালী শুরু করল তার জাতীয় সংগ্রাম। ফলে বাংলাকে দু'ভাগে ভাগ করে বাঙ্গালীর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেবার জন্য তখন যারা চেষ্টা করে ছিল তা'দের সে চেষ্টা তখনকার মত স্থগিত রইল। কিন্তু সেই থেকে শুরু হ'ল বাংলার নব জাগরণ। এদের পথ প্রদর্শক রূপে প্রথমেই এগিয়ে এলেন সুরেন বাড়ুজ্যে। তারপর একে একে কি রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে শুরু হ'ল বিপ্লব। তখন বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম্'ই ছিল একমাত্র মূলমন্ত্র।

তাঁর সাধনা অধিকতর ফলপ্রসূ করতে সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র, রজনী সেন, ঈশ্বর গুপ্ত শোনালেন আশার নূতন বাণী। আর তাঁদের আশা আকাঙ্খাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য বাংলার বুকে দেখা দিল মৃত্যুঞ্জয়ী ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, ঋষি অরবিন্দ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বীরেন শাশমল. যতীন দাশ, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন এবং সর্বশেষে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র।

জাতীয় সংগ্রামের পুরোহিতগণ শুধু বক্তৃতা এবং কবিতা লিখেই ক্ষান্ত হ'ন নি। এই সময় সহজ সরল ভাষায়, বাংলার আপামর জন সাধারণের বোধগম্য করে বাংলার বীর সন্তান চারণ কবি মুকুন্দ দাস খুললেন এক স্বদেশী যাত্রার দল। ত'ার প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল যাত্রা-গানের মাধ্যমে স্বাধীনতার বাণী প্রচার।

মুকুন্দ দাসের স্বদেশী গানের খবর রাখেন না এমন লোক বাংলায় কেউ আছেন বলে মনে হয় না। মনে পড়ে মুকুন্দ দাস যখন আসরে এসে গান ধরতেন, "খুলে ফেল কাঁচের চুড়ি বঙ্গনারী'—আর পোরোনা"

তখন আসবেব মহিলা অংশ থেকে শুরু হ'ত তাদের রেশমী চুড়ি ভাঙ্গার মট্ মটাস্ শব্দ। গান ভেঙ্গে গেলে শূন্য আসরের মাঝে স্তূপীকৃত হত ভাঙ্গা কাঁচের টুকুরো।

মুকুন্দ দাস আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তা'র অনুকরণে বাংলার বহু জেলায়ই তখন গড়ে উঠেছিল স্বদেশী যাত্রার দল। তারা মুকুন্দ দাসের গানের অনুকরণেই নিজেদের ভাষায় গান রচনা করে গাইত। এমনকি গত '৪৩ (বাং '৫০)-র দুর্ভিক্ষের সময়ও এই সব চারণের দল গান বেঁধে ছিল :—

মোদের ধন্য দেশের চাষা
এদের চরণ ধূলি পড়লে মাথায় প্রাণ হয়ে যায় খাশা।
তবু তারা আছে ভালো অন্নের জ্বালায় রাইদি মইল
বলব কি আব সে সব কথা একতা হইতে করে নাশা।
সোনা রূপা যত ছিল বৃটিশ গভরমেণ্ট সব হরে নিল
শেষে কাগজ এসে উদয় হ'ল নিল তামা কাঁসা।
মোদের ধন্য দেশের চাষা॥
এক মায়ের সন্তান হ'য়ে জাতের গৌরব ছেড়ে দিয়ে
নচেৎ গেল সময় বয়ে পরে দেখবে কুয়াশা।

যাদের ঘরে ধানের মোড়া তারা আছে দেশের সেরা
আর দেখেন সব ন্যাড়ামুড়া তারা জাতির নিন্দায় বড়ই খাশা।
তেত্রিশ কোটী ভারতবাসী চিন্তা করেন কেন বসি
এবার করুন মিশা মিশি নিশ্চয় ভারত হইবে আশা।
আমরা হইলাম এমন নিষ্ঠ ভাত কাপড়ে পাইলাম কষ্ট,
এমনি মোদের দুরাদৃষ্ট সোনা নিয়ে দিল সীসা,
ধন্য মোদের চাষা।
ভারত বাসীর যত সুখ প্রাণে বড়ই লাগে দুঃখ,
বজরা খেয়ে হ'ল অসুখ, তারা নদীর জলে ভাসা
মোদের ধন্য দেশের চাষা ॥
অধম যতীন বলে বিনয় করি, ভারত মাতার চরণ ধরি
তুমি মাগো হ'য়ে কাণ্ডারী পার করে দাও এই ভরসা ॥
কিংবা :—ওগো কোথায় গো মা তারা, রক্ষা কর একবার এসে
তোমার ভারতবাসী যাচ্ছে মারা ॥
এ কি হ'ল মায়ের নীতি সন্তানের না দেখলে গতি
আঁধার ঘরে জালাও বাতি তবে জানব পরাৎপরা ॥
তোমার কন্যা, তোমার পুত্র, তাদের নাইমা কোন সূত্র
একবার খুলে-দেখ নেত্র, তাদের নাই মা কূল কিনারা।
অজ্ঞান মা ভারতবাসী, একবার দেখা দেওগো আসি
নচেৎ ঐ চরণে দেব ফাঁশী—শেষে হবি যে প্রাণ-হারা ॥
কু-পুত্র অনেকেই মাগো, কু-মাতা নয় কখনও গো
বেদ পুরাণে দেখা যায় গো, তুমি কেমনে দেখ নেত্র ধারা।
আমরা যদি মরে যাই, তাতে কোন দুঃখ নাই
তোমার নামটি কোন ঠাঁই, রইবে না আর জগৎ জোড়া।
অধম যতীন বলে বিনয় করে, এই ভারতের ঘরে ঘরে
ডাকুন মাকে উচ্চৈস্বরে নিশ্চয় তিনি দেবেন দেখা ॥

কখনও কখনও :—

ভয় কী তোর এ তুফানে, ডুব্‌বে না তরী
ও তোর হাল ধরে বসে আছেন দীনবন্ধু কাণ্ডারী।

গুরুর অনুরাগ মুগুল খণ্ড বাদাম দে ভাই তুলে,
ও ভাই তরীখানা দে ভাই খুলে, গেয়ে আনন্দের সারি ॥
ভাবে মহানন্দ গুণধরি তোর কুমুদ কান্ত,
এবার শক্ত করে দিও, ও রাম-কৃষ্ণ নাম জুড়ি।
বসে থাক্ তরীর মাঝখানেতে, চলুক তরী নিশি দিনে
তোর দ্বার টাম্বুক দাঁড়ী ছয় জনে, মুখে বল শ্রীহরি ॥

মহাত্মাজীর ডাণ্ডীযাত্রা, ঐতিহাসিক লবণ আন্দোলনের কথা মনে পড়ে নিশ্চয়ই। সারা ভারত জুড়ে জেগে উঠেছিল যে অভূতপূর্ব গণজাগরণ পূর্ব বাংলার নিভৃত কন্দরে গিয়েও সে আন্দোলনের ঢেউ পৌঁছল। পূর্ব বাংলার চাষী মজুরের দলও তখন গান বাঁধল :—

এবার বন্দেমাতরং বল সর্বজন
শুনহে ভারতবাসীগণ,
এবার মহাউৎসবে সবে ডাক মাকে ভক্তি ভাবে
তবে শুধিবে জীবে এত কার্য সাধান ॥
ত্যাজ বিলাতী বসন, বিলাতী ভূষণ, বিলাতী চিনি ও লবণ
কেহ আর কোরনা গ্রহণ।
এ যে সকল জাতীর ধর্ম নষ্ঠ, হতেছে এ কু-ভোজনে।
এ সকল অজ্ঞাত পাপ, ধর্ম বই আর কেউ না জানে
ভাই, এখনে সবে জেনে শুনে ঘৃণা উছলিল মনে,
যে কতদিন আর প্রাণ বাঁচে কোরনা গ্রহণ
একবার বন্দেমাতরং বল সর্বজন।
আছ যত হিন্দু মুসলমান—সবে হলে ভাই বুদ্ধিমান
রক্ষা করতে চাও যদি ভাই স-ধর্ম সম্মান।
এ কাজে যে হয়েছে ব্রতী, ব্রতী হয়ে তার প্রতি
ঘুচাও ভারতের দুর্গতি।
সম্প্রতি হয়ে এ সম্পত্তি জনেতে কোরনা হেলা
দূরে যাবে সকল জ্বালা।
দিওনা প্রাচীন হেলায় সেই পাপ সাগরে বিসর্জন
এবার মন্দেমাতরং বল সর্বজন।

আছ যত জ্ঞানী গুণী, এবার দেখ মুনিগুণী
আহা মরি, আহা মরি, কী আশ্চর্য মহীয়সী
যে বেটা আনল কাঁচের চুড়ি, বলে দিল্লীর দরবার
কী বাহার, বাহার মেরে নিল তুলে স্বর্ণ রূপা মণি মুক্তাহার।
মনোরঞ্জন বলে ভাই, এসব নেহাৎ একেবারেই কর পরিহার ॥
মিছরী ও লবণ চিনি, সবই দেও বিসর্জন
এবার বদন ভরে বলরে সবাই বন্দেমাতরং ॥

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরও যখন বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটলনা দেশের অভ্যন্তরীন অবস্থার , অন্ন বস্ত্রের অভাব তখনও পুরোমাত্রায় বিদ্যমান, সবে মাত্র মুক্তি পেয়েছে ভারতের মুক্তি তাপসগণ, তখন দেশের সেই সময়কার অবস্থা নিয়ে অখণ্ড বাংলার পল্লীকবিরা শেষবারের মত রচনা করল তাদের গান :—

মাগো। বিশ্ব প্রসবিনী তারা, ঘুরিস বিশ্বময়
সঙ সাজিয়ে রঙ দেখিস মা, কলির জেল খানায়।
আমি ভাবি তাই মনে মনে, দিনে দিনে, দেখে কলির কাল
মেয়ে লোকের তামুক খাওয়া এই আর এক জঞ্জাল।
মাগো মা সত্য, ত্রেতা. দ্বাপর শ্রেষ্ঠ, কলি কিসে হীন ?
অন্ন বস্ত্রের অভাব মাগো বাড়ে দিনে দিন।
পুত্র না মানে শাসন, পিতার বচন, ও সে স্বাধীন ভাবে রয়
কত কুলনারী, ছেড়ে পতি, মা সতীত্ব বাড়ায়।
যে যুগে রবি ঠাকুর, প্রফুল্ল রায়, দেশবন্ধু আর সুভাষচন্দ্র বোস
শ্যামাকান্ত, গোবর গণেশ আর জগদীশ বোস।
স্বামী প্রণবানন্দ, কপাল মন্দ, গিয়াছেন ছাড়িয়া
সেই হ'তে ভারতে এলো মাগো দুর্ভিক্ষের ছায়া।
গরীবের পোড়া কপাল, কেরাশিন তেল পাওয়া না যায়,
কেহ সারা রাত্রি হ্যাজাগ জ্বালায়, কেহ আঁধারেতে ভাত খায়।
মাগো মা, চেতাবনীর বাণী পেয়েও বাঁচলাম পঞ্চাশ সাল,
বজরা খেয়ে পাঁজরা শুকায় হায় পোড়া কপাল।
মাগো মা একান্ন সালে এলো মাগো ফুড কমিটির দল
তাহা দেখে ভরসা হ'ল ঘটল তাই কু-ফল।

মাগো উপর থেকে রেশন পাঠায় সরকারে
পথে পেয়ে একচাটা দেয় শৃগাল কুকুরে ॥
মাগো মা আর কত কাল কাঁদাবি ইন্দ্রজিৎ রাবণ নন্দন,
ইন্দ্রজিৎ করিত মাগো রণ মেঘের আড়ালে
এখন কত শত ইন্দ্রজিৎ আকাশেতে চড়ে।

চরকা আন্দোলন আমাদের মনে আছে, দেশে শুরু হ'ল বিলাতী কাপড় বর্জন, দেখা দিল দেশী কাপড়ের কল। পথে ঘাটে সকলের হাতে তখন তকলী, বাড়িতে চরকা ঘোরে, আর আপামর জন সাধারণের মুখে তখন গান্ধীরাজের কথা। মহাত্মাজীর সেই ঐতিহাসিক ডাকে নিরক্ষর চাষাভূষারাও কী ভাবে সাড়া দিয়েছিল তা' জানা যায় তাদের গানে :—

ও ভাই ভাবনা কি আর আছে গান্ধী রাজা আনবে স্বরাজ দুঃখ যাবে ঘুঁচে।
(আর) তাঁতী যা'রা আছরে ভাই সব, তাতের কাপড় বুনাও বইস্যা।
বাবুরা সব খদ্দর পরবেন ঠাইরেনরাও পরবেন খাশা।
আবার নূতান মন্তর দিছেরে কানে, চরকা তকলী হাতে নিয়ে
(ও) ভাই রাস্তা ঘাটে চলতে ফেরতে তকলীর নেশা দেখ গিয়ে।
এবার ভদ্দর কায়েত বেরাম্ভণ, গত আছেন বৈদ্যজন
সবাই এবার তাঁতের কাপড় বায়না দিছে, ভাই সাহেবের দুঃখু গেছে
এবার বুঝি সুদিন আইল, স্বরাজ ঘরে আইসা গেল
এবার একই সঙ্গে গাও দেহি ভাই গান্ধী রাজের জয় ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"কি হ'ল রে জান—
পলাশীর ময়দানে নবাব হারাল পরাণ।
*　　*　　*
দুধে ধোয়া কোম্পানীর উড়িল নিশান।
মীরজাফরেব দাগাবাজীতে গেল নবাবের প্রাণ॥"

"লালন সাঁই" গীত।

বাংলার ১৩২৬ সনে পূর্ব বাংলায় বিশেষ করে, ফরিদপুর, ঢাকা, বরিশাল, মৈমনসিংহ ও খুলনাব কিছু অংশ জুড়ে শুরু হয়েছিল যে ভীষণ ঝড চলতি কথায় তাকেই বলে 'ছাব্বিশ সনেব ঝড' বা বন্যা। এই বন্যা দেশ ও সমাজ জী·নের উপর যে কতটা আঘাত হেনেছিল তা' পূর্ববঙ্গবাসী মাত্রেরই স্মরণ আছে। কত বিধবা যে হারিয়েছে তার একমাত্র স্নেহের দুলালকে, স্ত্রী হারিয়েছে স্বামীকে, স্বামী হারিয়েছে স্ত্রী-পুত্রকে, কত শিশু যে অনাথ হয়েছে তাব সঠিক বিবরণ আজও প্রকাশ পায়নি।

পূর্ব বাংলার এই দারুণ দুর্দিনে, দেশের এই সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায়, পল্লী-গ্রামের নিরক্ষর চাষাভূষারাও গান বেঁধে ছিল। তারা গান গাইত বাড়ি বাড়ি ঘুরে। তাদের কণ্ঠে বেজে উঠত সমগ্র পূর্ববঙ্গবাসীর ব্যথা :—

তেরশ ছাব্বিশ সালে সাতৈ আশ্বিন বৈহালে
চিরস্মরণীয় তুফান ভুলিবে না কেহ ভুলে।
　　বাজারে দুর্মূল্য তাঁতী, কারও নাহি ঘর দরজা।
　　খাজনা আনা দায় হ'ল, অন্নাভাবে মরে প্রজা॥
তাদের কথা যেমন তেমন, নিশ্চয়ই এবার মোদের মরণ,
এই বারের এই অভাব পূরণ হবে কি কোন কালে॥
　　প্রতিমা নাই মণ্ডপ ঘরে, ঘর গিয়াছে বিষম ঝড়ে
　　কত লোক দেশান্তরে, গিয়েছিল বাণিজ্যের তরে
　　মহাজনের নৌকা সহ ডুবি হ'ল অতল জলে॥

তাদের পিতা-মাতার রোদন ধ্বনি, সদাই চতুর্দিকে শুনি
আসবে কি আর যাদুমণি, অভাগিণী মায়ের কোলে ॥

শুধু যে নিরক্ষর চাষাভূষারাই এ গান লিখে ক্ষান্ত হয়েছিল তা' নয়। বহু কবিয়ালরাও তখন তৈরী করে ছিল নূতন পদ :—

মা তোর দুর্গা নামের কলঙ্ক হইল
ছাব্বিশ সালের আশ্বিন মাসে,
ভীষণ বন্যা হইল ত্যাশে
মানুষ গরু ঝড়ে বাতাসে সকলই উড়াইল।
ছিল তাল তেঁতুলে বড় বড়াই,
বুঝি তারাই এবাব ধবায় পইল
(আর) সকাল হ'তে বাতাস ছাড়ে
বিকাল হ'তে আড়ি করে
বাত্রে ও দুপুর কালে সকলই উড়াইল ॥
কত দালান কোঠা ঘব দরজা,
বুঝি ভীষণ মজায় দিচ্ছে সাড়া
অকালেতে বৃষ্টি হ'য়ে হলদে কৃষ্ণি গেল মরে
মানুষ গরু ঝড়ে মরে, বাড়িতে সব হা-হা-করে,
যে না পাবে মা আহার যোগাতে
কেন সন্তানেরে সে গর্ভে ধরে।
(আর) কত দুঃখ দিবি দুঃখ হরা কলির জীবরে ॥
মুখে হরি বল, হরি বল, ছাড়রে মন অন্য সম্বল
যদি ভব পারে যেতে চাস।
(আর) দুর্গা শঙ্কর রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম
অবিরামে রাম গুণাগুণ গাও।
আমি মনোরঞ্জন রায় সত্য বলে
যাব চলে ভবপারে সাধুর বাতাস লাগলে গায় ॥

১৩৩০ সাল (বাং) গোপালগঞ্জ মহকুমার (ফরিদপুর জেলা) গেরী মোল্লা নামে এক সৎ ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান কী ভাবে তা'র খুড়তুতো ভাইয়ের হাতে প্রাণ

হারায় সেই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে পল্লী-কবিরা যে গান বাঁধে তা আজও (পাকিস্থানের পরও) সেই সব অঞ্চলে প্রচলিত দেখতে পাওয়া যায় :—

সন তেরশ তিরিশ সালে, গেরী মোল্লা রাস্তায় চলে
দুষ্টেরা সব দাঁড়িয়ে দেখতে পায়।
ওরা সব দুষ্টু একসাথ হইয়ে, পরামর্শ করে এক জায়গায়
চটী জুতা, ছাতী হাতে মোল্লাজী গোপালগঞ্জ যায়॥
রাত্র যখন হ'ল ভোর, কাক কোকিলায় করে সোর
কাছারির হইল সময়।
ওরা দাও কাটারী হাতে লইয়া, গুপ্ত বেসে হেটে যায়
লুকাইয়া রইল গিয়া পাঁচুরিয়ার ঠোটায় (বাঁক)॥
বেলা যখন রইল পাটে, গেরী মোল্লা রাস্তায় হাটে
প্রিয় বাবু ডাক দিয়া কয়।
মোল্লা তোমার পাছে রিপু আছে, পথে যেন রাত না হয়
ও প্রাণে চেয়ে আছে তোমার সেই দুখিনী মায়॥
গেরী মোল্লা বলে ভাই, আমার পাছে রিপু নাই
রাস্তা দিয়ে হাটতে সন্দ কী।
আমার আগে পাছে লোক আছে, এখন আমি হেটে যাই
আগে পাছে লোক থাকতে দুষ্টেরা দেখে করবে কী॥
হায়রে হাটিতে হাটিতে গেল, দুষ্টেরা যেখানে ছিল
সে স্থানে হ'ল উপস্থিত।
ওরে পাছের থিকা জোনাবালী, ফাঁশ দিয়া ফ্যালে গামছাখানি
আজ তোমার যম এসেছে টান দিয়া জমিনে ফেলায়।
গেরী মোল্লা বলে ভাই, ধরি তোমার হাতে পায়
জীবনেতে না কর বধি।
আমার চাচাত ভাই হইয়া, কেমনে গলায় দেও ছুরি
আহারে দারুণ বিধি কেমনে ভাই হলো জীবনে বধি॥
হায়রে আমি চল্লাম নিজ দেশে, মা বেড়াবে পাগল বেসে
জন্মের মত দুনিয়া ছাড়িয়া যাই।

ওরে আমার শোকে পাগল হবে, আমার দুইটা জোরের ভাই
ঘরে আছে পরের মেয়ে দুনিয়ায় তার কোন লক্ষ্য নাই ॥
হায়রে আমি চল্লাম নিজ দেশে, মা বেড়াবে পাগল বেশে
জন্মের মত দুনিয়া ছাড়িয়া যাই।
হায়রে মেঞার ছিল শত গুণ, মঙ্গলবারে হইল খুন
খবর গেল শোনাকুলী গাঁয়ে ॥
ওরে ভাই বেরাদার প্রিতিবাসী, সবে কান্দে হায়রে হায়
ওর মা কান্দে বাবা তুই উঠে কোলে আয়।
খবর গেল থানার উপর, ডিপুটী কান্দে বারে বারে
আর কান্দে সব আমলা মুহুরী ॥
থানার দারোগা-বাবু এল চলি, ডিপুটী ছাড়ে কাছারি
ভদ্রলোকের মেয়ে ছেলে রাস্তায় যায় হাত ধরে।
আরে হিন্দু আর মোসলমান, সবে দেখে অজ্ঞান
একিবে হায় দারুণ ডাকাতী ॥
ও যার দেহের মধ্যে বাইশটা কোপ, দেখে ফাটিয়া যায় ছাতী
আউরৎ, মাউরৎ, রোজেক, দৌলাৎ চার চিজের মালিক আল্লায়।
যেমন লঙ্কাতে রাবণের পুরী, তেমনি দেখতে মিঞার বাড়ি
আহারে কি দেখতে চমৎকার ॥
মেঞার ঘর দরজার অতি ঠমক, বাইর বাড়িত গোলাঘর
সোনার পুরী হইল আঁধার।
ভাই বন্ধু সব কেঁদে জড় জড়, কাঁদে মেঞার পরিবার
মেরেছিস দেবের বাহার, একিরে হায় দারুণ ডাকাতী ॥
যেমন রোশ নোলাতে হাচেন মইল, ছাকীন না হইলো রাতী
সেই রকম এ দারুণ বিধি, হরে নাও আমার প্রাণ প্রতীক।
মেঞার আঁখি নয়ন যায় দেখা, কিবা রূপের বাহার
আর মুখের ঠোঁট পুষ্পেরই মতন ॥
উহার দন্তগুলি আনা দানা, নাসিকা নদীর মোহনা
পতির মুখের মিষ্ট কথা শুনিলে ঠাণ্ডা হয় জীবন ॥

হায়রে মনোরঞ্জন ভেবে কয়, খুন করলে কী খুন এড়ান যায়
দুই বাপ বেটার দিল দীপান্তর ॥
ওরে রতন মানিক, আর পবন ফকির
এই দুই জন কেঁদে মর মর।
হায়রে কান্দেরে রতনের মায়, এ কলঙ্ক মিটবে নয়
তুইরে রতন অমলের নিধি।
ওরে খুন করতে গেলি বাবা, আর ত' ফিরে এলি না
জাহাজ ভরে নিয়ে গেল তোরে আর চক্ষে দেখলাম না ॥

বাংলা হিন্দু মুসলমান উভয়েরই দেশ, তাই এর সংস্কৃতিও গড়ে উঠেছিল উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। উপরোক্ত গীতিটি ঐ অঞ্চলের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভিতরই সমানভাবে প্রচলিত।

বাংলা ৩৩০ সালে পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার অন্তর্গত 'গাভা' নামক গ্রামে একবার এক কুমীরের আবির্ভাব ঘটে। এই কুমীর কী ভাবে এন্তাজদ্দি নামে এক মুসলমান চাষীকে মেরে ফেলে এবং পরিশেষে গাঁএর লোকের সাহায্যে সেই কুমীর কী ভাবে নিহত হয় সে বিষয়ে স্থানীয় নিরক্ষর মুসলমানেরা এক চমৎকার গান রচনা করে :—

তেরশ তিরিশ সালে, গাভার ঐ খালের পারে
কুম্ভীর দেখা যায়।
(আবার) কুম্ভীর দেখে যজ্ঞেশ্বর কুণ্ড, (ও) সে কুম্ভীর অতি প্রকাণ্ড
মূর্ছা খাইয়া থাকে ছয় দণ্ড ॥
যত অ্যাংডা ব্যাংরা, চ্যাংরা ছোড়া, চ্যাঁচাইয়া মারে ব্রহ্মাণ্ড
(আবার) চেঁচায় যেন চেঁচাঙ্গের মত ॥
(তায়) এন্তাজদ্দি আন্দাজ পায়না, ফয়জোরে যায় গোছলে
দরজার মাথায় বড় খাল খুলে ॥
কুম্ভীর ল্যাজ দিয়া বারি মারে, এন্তাজেরে ফেলাইল জলে।
তখন সতীশ বাবু খবর পায়, বন্দুক নিয়া ধাইয়া যায়
গুলি করে কুম্ভীরের ললাট দৃষ্টে।
(আবার) মরণ কালে সদ্ বুদ্ধির উদয়, কুম্ভীর মনে ভাবে
কাইল মেরেছি এন্তাজেরে আইজ মারুক আমায় সবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"All the World's a Stage,
And all men and women mearly players,
They have their exits and thir entrances"

—Shakespeare

গাঁএ এবং দেশে নূতন আইন কানুন এবং সমাজের পরিবর্তন কালে সব সময়েই দেখা যায় এক শ্রেণীর লোক থাকে, যা'রা প্রগতিকে কোন দিনই বরদাস্ত করতে পারেন না।

এই ধরনের প্রতিক্রিয়া শুধু যে চাষাভূষার ভিতরই সীমাবদ্ধ তা' নয়। বিদ্যাসাগর মশাই যখন 'বিধবা বিবাহ' আইন পাশ করালেন তখন ঘরে এবং পরে, এমন কি তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত এই আইনের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগলেন। তিনি তার 'সংবাদ প্রভাকরে' ব্যঙ্গ করেই বলে বসলেন :—

"সকলে এইরূপ বলাবলি করে
ছুরীর কল্যাণে যেন বুড়ি নাহি তরে।
শরীর পড়েছে ঝুলি চুলগুলি পাকা
কে ধরাবে মাছ তারে কে পরাবে শাঁখা।"

তবেই বুঝুন, বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার সূর্য যেখানে দেদীপ্যমান সেখানেই যদি এই ব্যাপার হ'য় তা' হলে নিরক্ষর চাষাভূষারাই বা বলবে না কেন :—

মহাকলি গত হইল, ঘোর কলিকাল আইস্যা পইল
হিন্দু ধর্ম যায় যে রসাতল।
নিকার আইন করল জারী, বিয়া দিবে যতেক রাঢী
জুটল এসে যত গৃহ শূন্যের দল॥
আছেন বর্ণ হিন্দু যা'রা যা'রা, সমাজে চল আছেন তারা
মুসলমানের নাপ্তে করে খেউরী॥

ছুইলে মরে হুক্কার জল, এ সবগুলি জাতীর কৌশল
সমাজে চল লিখে দুধের হাঁড়ি ॥
দুটি একটি ছাওয়াল থুইয়া, যার পরিবার যায় মরিয়া
কৌশলে কাম সারে।
মা শুদ্ধা এক মাইয়া আইন্যা, ছাওয়ালরে করাইয়া বিয়া
অল্প টাকায় দুই সম্বন্ধ করে ॥
ছেলেরে মাইয়া দিয়া, মাইয়্যার মায়রে পিতায় নিয়া
ছেলে তখন বইস্যা বইস্যা ভাবে।
আমি কী দেখি এই ঘোর কলিকালে, ধর্ম বুঝি সকল গেলে
বাপ কবে না শ্বশুর তারে কবে ॥
শ্বশুরের সিংহাসন, পিতায় যদি করে গ্রহণ
পিতা পুত্রে সম্বন্ধ কী হয়।
মা কবে না কবে শাশুড়ী, দেখে শুনে লজ্জায় মরি
বাবারে কি শ্বশুর কওয়া যায়।
বাপ কবে না শ্বশুর তারে কয় ॥

মাত্র এই একখানা গানেই বেশ বোঝা যাবে, নিরক্ষর গ্রামবাসীদের প্রগতির প্রতি তাদের বিমুখতা কতদূর!

দরিদ্রের চিকিৎসার জন্যই সৃষ্টি হয় দাতব্য-চিকিৎসালয়। সরকার থেকে খোলে 'হসপিটাল'। এই সব অবৈতনিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে যে রোগীর চিকিৎসা কতদূর হয় তা' আর অজানা নেই কারুই। শহরে খানিকটা চিকিৎসার প্রহসন দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু পাড়াগাঁয়ে আর সে সব বালাই নেই—দাতব্য চিকিৎসালয়ের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নালিশও বৃথা।

বৃটিশ শাসনে, দেশের অন্তঃস্থলে পর্যন্ত যখন এই ভাবে দুর্নীতি ঢুকল তখন জনসাধারণের মুখপাত্র ভাবে গাঁ'এর এই সব নিরক্ষর সমাজের লোকই সর্বপ্রথম এর প্রতিবাদ জানিয়ে গান বাঁধল :—

শুকায় পদ্মা মধুমতী, জল শূণ্য ঐ কুমার নদী
গাড়ি ঘোড়া কত চইলা যায়।
ঔষধ নাই রুগীর ঘরে, বহুলোক হসপিটালে রয় ॥

হাসপাতালের কর্মচারী, তারা দেয় মাথায় বারি
ক্ষুধা পাইলে পথ্য নাহি দেয়।
হাসপাতালের ডাক্তার যারা, ঔষধের মাত্রা কমায় তারা
শেষে কেবল রুগীরে ভোগায়॥
রাজা হইল ধর্মপুরুষ, কালির জীব হইয়াছে বেহুঁশ
চেনেনা সেই ধর্ম নিরঞ্জন।
চাল তেঁতুলে মেশে যেমন, দুধে লবণ খাইলে হয় যেমন
বিষের তুল্য হয় ভোজন॥

প্রসিদ্ধ ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা এবং তা'র ইতিবৃত্ত আজ সমগ্র বাংলা তথা সমগ্র ভারতের কাছে সুবিদিত। ভাওয়াল মামলার প্রাথমিক বিচার শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের কবিয়ালেরা গান বেঁধে ফেলল :—

দারুণ শীলা বৃষ্টির মাঝে, কী অঘটন ঘটে গেল,
ও ভাই ভাওয়ালের ঐ মধ্যম কুমার দার্জ্জিলিংএ গিয়েছিল,
আশু ডাক্তার যুক্তি করে ঔষধ দিয়ে প্রাণ হরিল
ও ভাই সাধুর দয়ায় প্রাণ বাঁচিল, সাধু বেসে দেশে গেল।
কিন্তু মেজ রাণী বিভাবতী, সতীর সে যে শিরোমণি
কাঠগড়াতে উঠে বলে—তুমি আমার স্বামী নও॥

পূর্ববঙ্গের ভিতর মাদারীপুর একটি পাট রপ্তানীর প্রসিদ্ধ স্থান। রপ্তানীটা ঠিক মাদারীপুরে নয়, তৎসংলগ্ন চরমুগুড়িয়াতেই হ'ল এর বড় গুদাম আড্ডা ও আড়ৎ। এখানে বড় বড় পাটের গুদামে দিনরাতই লোক খাটে, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা বারমাসই। এই দলে মজুর ও মজুরণী হিসেবে স্ত্রী পুরুষ উভয় শ্রেণীরই দেখা মেলে।

এরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে কিন্তু তাদের পরিশ্রমের ন্যাজ্য মূল্য কখনও পায় না। অনেক সময় মেয়েদের উপর অনেক অভদ্র আচরণের কথাও শোনা যায়। পেটের দায়ে বেচারীরা পরের দরজায় খাটতে এসে সহ্য করে এইসব লাঞ্ছনা। মুখ বুঁজে সহ্য করা ছাড়া এদের আর কোন পথই নেই। কিন্তু তাদের অব্যক্ত ব্যথা বেজে ওঠে এইসব পল্লী-কবির প্রাণে। তাই তাদের কণ্ঠে শোনা যায় তাদেরই মর্মবাণী :—

দেখ্‌লাম মাদারীপুরে কোষ্টার কারবার স্থানে স্থানে
দেখ্‌লাম ধন্য মান্য অধর গণ্য বিলাত সেখানে।
আমি তাই ভাবি মনে।
দেখ্‌লাম নদী নালা, পতিত জমি সকলি তোলে
তারা খাটে রাত্র দিনে॥
(আবার) মেয়ে লোকের কষ্ট বেশী হয়,
কোষ্টার আমলে তারা
সারাদিন কোষ্টা লইয়া ভাত খায় বৈহালে।
ভাইরে দিনে দিনে অন্ন বিনে হে
বুঝি লোকের জীবন যায়।

পল্লী-কবিদের সব চাইতে বড় সুবিধা তাদের গান কখনও কোন ছাপা কাগজে প্রকাশ পায় না। তাই তাদের কোনদিন 'মান হানী' মোকদ্দমায়ও পড়তে হয়নি। নতুবা তা'রা এভাবে নারী প্রগতিকে ব্যঙ্গ করতে পাবত না:—

দেশে সুখ হবে না ফিরে, মেয়ে লোক সব পূজার দেবা
স্বামী থাকে কর জোড়ে।
স্বামীটী যা'র আছে নরম, তার কি আছে লজ্জা সরম
চক্ষু দুটি তার সদায় গরম,
ঘরে গিয়ে গাল ফুলায়ে বাসন আছাড মারে॥
তখন দিশা বিশা না পেয়ে, উপযুক্ত ছেলে যদি ডাইনে বায় থাকে
কারো খায় মাথা মুড়া, আবার কেউ একাদশী করে।
স্বামীর কথা সহ্য হয় না, গায় মোটে রাগ ধরে না
ওঁরে কেন যমে নেয় না, আমার সঙ্গে মরে॥
মা বাপেরি চক্ষু খেয়ে কেন দিল এ সংসারে,
আমি মনোরঞ্জন তাই ভেবে বলি, দেশে সুখ হবে না ফিরে॥

কখনও কখনও এরূপও শেনা যায়:—

বাস্তু ভিটা বাঁধা রেখে ছেলেকে পাশ করায়ে আনে,
একখানা ভাঙ্গা কুঁড়ে ছিল
তাহা বন্ধক রেখে পাশ করবার জন্যে
ছেলেকে দেয় বিলাত পাঠায়ে।

আর এদিকে প্রতিবাসী, বন্ধু বান্ধব সবাই বলে,
ঐ বুড়া ভদ্র লোকের ছেলে যদি
কোন ভাবে করে বি, এ পাশ
তা' হলে অন্ততঃ আমাদের দেশের কাজে
দরকার হউক বা না হউক, লাইব্রেরীর কাজে পড়বে দরকার।
এদিকে দশজনার আশীর্বাদের চোটে
খাবার সঙ্গে করল বি, এ পাশ।
সেই বাড়ি, থালা, জুতো
পাশ করে গেছেন চাটের দোকানে
বাইস্কোপ দেখতে যাবেন
আর এদিকে সেই মা বাপ,
না খেয়ে গ্রামের উপর মরবার উপক্রম।
অবশেষে করল কিনা হ'ল তার জাতীর সর্বনাশ।
পিতা মাতার আদ্দি শ্রাদ্ধ না করালে॥

এইসব পল্লীকবিরা যে শুধু ব্যক্তি বিশেষের প্রতিই তাদের কটাক্ষ হানতেন তা' নয়। সমাজের যা'রা শ্রেষ্ঠ বলে দাবী করেন অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রেণীর কুলীন মহাশয়দের উপরেও ওদের খড় দৃষ্টির অভাব ছিল না:—

আর কি ভাই জাতী আছে, ভাইরে জাতীর গৌরব বৃথাই মিছে
দেশের খোদ মহাজন গেছে বেজাতে মিশে।
এই যে ঘোষ, বোস, গুহ, মিত্র, কুল সেজে ঘরে বসে আছে
আবার চাটুজ্যে বাড়ুজ্যে, গাঙ্গুলী, মুখুজ্যে, ডোম মুচীর ব্যবসা নিছে
আর কিরে ভাই জাতী আছে?
আবার মোল্লা মুন্সী শোনেনা কাজী
আল্লার কাজে খতম দিয়াছে।
আবার মোল্লা, মিঞা সারা দিচ্ছেন
মেঞাজীরা কত মাছ ধরতেছেন
আর কিরে ভাই জাতী আছে?
আবার মুরগীর আণ্ডা, বড়ই ঠাণ্ডা
ডাক্তার বাবু বলে গেছেন

এই যে শূদ্র, বৈশ্য, কুলনা ভণ্ড, লণ্ড ভণ্ড লাগিয়েছে
আমি মনোরঞ্জন কই ওরে মনা, সোনার বাংলা তোদের নয়।

অনেক সময় অভাব অভিযোগের জন্য বিধাতায় বিরুদ্ধেও নালিশ করতে শুনি :—

হবি দীনবন্ধু রহিলে কোথায়, ব্রহ্মার সৃষ্টি জীব না হয়।
বৃষ্টি তুমি নাহি কব তায়।
হল পাপে পূর্ণ ধবা-বসুমতী, নিরূপায় এদের ভারত রক্ষা করা দায়।
গেল জাতী, মান সব রসাতল
দেখিয়া এখন দুঃখে জীবন যায়।
পূবে ব্রাহ্মণগণেব এই ছিল নিয়ম,
যজ্ঞ-সূত্র গলে বেদপাঠে সদাই নিমগণ
ছিল তিলক ভালে সদা সর্বক্ষণ।
এখন আলপেট কাটা পৈতা আটা
সব চমৎকাব কবায় জোপ, মিথ্যা কথায় বিলক্ষণ।
ওরা বুট জুতা পায় পেণ্টুলেন পবে
কবে সদাই পাম্‌রুটী ভক্ষণ।
তাদেব ছিল একটা যাজনিক ব্যবসা
এখন হয়েছে তাদের দুর্দশা,
এখন নিয়ম তার বডই খাশা
ও সব শ্রাদ্ধ আদি কু-কার্য আর করবে না।
এখন পুরুত ঠাকুর দিয়া কাজ কর্ম নাই
ওসব কেবল ভণ্ডামীর ব্যবসা।
ছিল ইষ্টদেবের সম্মান বহুতর
এখন ঠাকুর দেখলে না করে কেয়ার।
যদি সাহেব দেখে মনের সুখে
সেকেণ্ড কবে গুড্‌ মর্নিং স্যার॥
গেল জাতী মান সব রসাতল, এখন দুঃখে জীবন যা
এমন সময় দীনবন্ধু রহিলে কোথায়।
এদেব ভারত রক্ষা করা দায়॥

তোমার চরণ স্পর্শে পবিত্র হয়ে, জন্ম সফল হ'ল আমার
হরি দীনবন্ধু রহিলে কোথায় ॥

অনেক সময় পারিবারিক অশান্তির কথাও এরা ব্যক্ত করে এদের গানের মাধ্যমে :—

বাড়ীর গিন্নী যদি চায় সোনার বয়লা
না দিলে হয় বিষম জ্বালা,
(বলি) না দিয়ে পারে কোন শালা।
যেমন ভারী দেখলে অন্তর জ্বলে
আর কিছু না চায়, খাদ্য-ভোজ্য, পুরু থালা চাল কলা,
দেখে সকল নব্য মেয়ের সভ্যতা
সে হয় পরাধীন, শাটিন, বোডিজ এঁটে গায়,
পাউডার মুখে আলতা হাতে পায়
ওরা মৃদু হেসে রাশ ভাষে, ত্রাশে টানে সমুদায়
ওদের দাপে ধরা রসাতল যায় ॥
চাবি-শিকল আঁচলে বেঁধে
যেমন ষাঁড় ঘোরে পাড়ায়।
পূর্বে শূদ্র আদির এই নিয়ম ছিল
আমি অধিক কী বলব বল ,
কালে সেই সব বিলুপ্ত হইল
বলে, রঙ ঢং-এ আর মাতিও না ভাই।
জপ হরি নামের মালা, দূর হবে ভবের জ্বালা,
অধম মনোরঞ্জন কয়, ওরে ভ্রান্ত মন,
ভাব বসে কী আর অকারণ, ভজ শ্রীগুরুর চরণ ॥

সময় সময় নিজের কথা নিজেকেই বলতে শোনা যায় :—

আমি বাদ্যকারের ছেলে, থাকি খালে বিলে
আমার ঢোল নিয়েছে চিলে।
আমি সাঁনাই বাজাইয়া যাই
বাজায়ে টাক্কা হুক্কা, টাক্কা দিই
দে—দে দই, টাটকা দই।

দিয়ে ঘিয়ে, দিয়ে চিঁড়ে, গুড় চাটু, নারকেল কোরা
আহা আমার টাটকা দই।
এই আমার ঢোলের বোলে, লোকে মনে মুখে বলে
এত রাজ্যের শগুন মরে, ওই শালার কেন মরণ নাই।
আমার মধুর কণ্ঠ শোনলে পরে, শূয়ারেরও মাথা ধরে
আর ভেড়ায় বলে, সাবাস ভাই॥
আমার রংটা কিছু কালো, আমি সানাই বাজাই ভালো,
কালো রূপে জগৎ আলো যেন আঙ্গারের গোসাঁই।
আমার রূপের গরিমা মায় করে, কামার পাড়া যাইনা ডরে
বুঝি হাফরে কবে বোঝাই॥

পূর্ববঙ্গের কোন কোন জেলায় 'পাগল চাঁদ' বলে এক শ্রেণীর লোক বা সম্প্রদায়ের দেখা মেলে। এরা আর পাঁচজন গৃহী-সন্ন্যাসীর মতই দিন কাটায়। এদেব জীবিকার উপায় হ'ল ঝার ফুঁক, তুক তাক, জল-পড়া, কখনওবা ভূত নামান, সাপের বিষ নামান, টোটকা অষুধ দেওয়া, আরও কত কি। এক কথায় নিরক্ষর, সভ্যতার আলোক রশ্মির বাইরে যে দরিদ্র জন সাধারণ বাস করে তাদের কাছে এরা পীর, পয়গম্বর অথবা কেষ্ট-বিষ্টুর মতই পূজনীয়। এরা এদের ভক্তের বাড়ি গিয়ে "দোতরা" বাজিয়ে গানও গায়:—

পাগল, পাগল, পাগল বলিস, আমায় শুধু পাগল বেটা
দিল দরিয়ায় ডুব দিয়ে দেখ পাগল ছাড়া ভাল কটা।
এক পাগল নারদ ঋষি, বীণা বাজায় দিবা-নিশি,
আর এক পাগল সে পঞ্চানন, সদায় থাকে শ্মশান ঘাটায়।
আর এক পাগল নন্দের কানু, দিবা-নিশি বাজায় বেণু
আর এক পাগল সে পঞ্চানন সিদ্ধিতে সে সদায় মগন।
পুত্র সুখে সুখী যা'রা, সুখের মর্ম জানে তারা,
এক জানে কৌশল্যা রাণী, রামকে দিয়ে বনে
ওগো পুত্র শোক না পাইলে
শোকের ব্যথা বোঝে কয়জনা।
পুত্র শোকে দুঃখী যারা, শোকের মর্ম জানে তারা

আগে যদি জান্তেম নিমাই, ফাঁকি দিয়ে যাবে
কখনও না দিতেম নিমাই তোরে আমি বিয়ে।
জীবন জ্বলে যায়, দারুণ পুত্র শোকের জ্বালায়
আমার জীবন ত' জ্বলে যায়।
অরুণ তুই বিহনে এ জীবন অস্থি চর্ম হ'ল সার।
আমার একা নয়, আছে বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ ঘরে
ও তা'রও জীবন রাখা দায়।
প্রবোধ মানেনা বিষ্ণুপ্রিয়া
(ও) সতীতো প্রবোধ মানেনা॥

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শহর কলকাতা মহানগরী। এখানকার সব কিছুই একটা অদ্ভুত ব্যাপার। এখানে যেমনি দেখা যায় লক্ষপতি, ক্রোড়পতি তেমনি দীন দরিদ্র ভিক্ষুরও অভাব নেই। গগনচুম্বী প্রাসাদ ও বস্তী, কেরাশিন তেলের আলোওয়ালা খোলার ঘর, আর নিয়ন ঘেরা প্রাসাদ সবই আছে। আছে বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, শিখ, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান। তাই এখানে একাধারে মহাপুরুষ এবং অপর দিকে দাগী বদমায়েসরও দেখা পাওয়া যায়।

কলকাতা এমনই একটা জায়গা যেখানে হঠাৎ কোন নূতন লোকের পক্ষে আশ্চর্যই ঠেকবে। বিশেষকরে যদি পূর্ববঙ্গের নিরক্ষর কোন চাষাভূষা হঠাৎ এসে হাজির হয় এখানে তা' হলে তা'র পক্ষে কী রকম ভাবটা হয় একবার তা'র মুখেই শোনা যাক ঃ—

এ দেশের পায়ে নমস্কার।
দেখলাম ঘোর কলিতে, কলকাতাতে
ভাল মন্দের নাই বিচার।
'হিয়ার ইজদি' হত ব্রাহ্মণ ভোজন
এখন দেখি পিতার শ্রাদ্ধে খায়না বাইয়ত জন।
তাদের নিত্য সেবার নাই নিয়ম।
সকলই দেখি অবিচারে
মা বাপে যায় চাকুরী করতে পরের বাড়িতে।
তার ছেলে হয় কাপ্তান রাস্তাতে॥

তাদেব বিষ্যাব নামে লবডঙ্কা
সেকেণ্ড করে গুড্ মনিং।
ছোট বড ছেলেবা সব সিং তোলা তেবি
ছেলে গুলিব চশমা চোক্ষে ঐ দুঃখে মবি॥
ও তাবা স্ফূর্তি কবে বেডায় ঘুবে
যেন মযলা গাডিব ষাঁড।
এ দেশেব পায়ে নমস্কাব॥
দেখলাম মাথাব চুলেব গন্ধে আমাব
ঘুম আসে না বাত্তিবে,
টম্‌টমে প্রাণ মজেছে কুসাব ললনা।
তাদেব হাঁচি তেলে মন মজেনা,
সদাই মাখে ল্যাভেণ্ডাব
এ দেশেব পাযে নমস্কাব।

কখনও কখনও এ বকমও বলতে শুনি:—

মবি হায়বে, ভবেব হাটে সাজিযে সব মায়াব মুটে
কেউ মবে ভাই মিছে খেটে, কেউ আখেব সাজী মজা লুটে।
ও তোব পুঁজিবাটা সব নিল লুটে
দেখলেম আব কিছু না বিকায় হাটে,
কাবও দিব্য দবে কাটে, কাবও লাভে কাটে
কাবওবা অনল ঘটে।
মবি হায়বে হায
এমন মজাব হাট দেখেছ কোথায়।

অভাব অভিযোগ, দুঃখ কষ্ট, মানুষেব ববাতেই আসে, মানুষই তা' সহ্য ক'ব, কিন্তু সহ্যেবও একটা সীমা আছে।

দুর্ভিক্ষেব সময় যখন হাজাব হাজাব নবনাবী বিধাতাব শ্রেষ্ঠ সন্তানেব মর্যাদা বক্ষা কববাব জন্য নির্বিকাব ভাবে খাবাবেব দোকানের দিকে চেয়ে চেয়েই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ কবেছে তখন পূর্ববঙ্গেব গেঁয়ো মুসলমান কবি (জাবী) দেব গাইতে শুনি:—

ভাইরে, দ্যাশে আছে দুইডা জাত।
একটি থাকে রাজ পাটেতে
আরেক জনের দুঃখেতে প্রাণ ফাটে।
ও ভাই চিনির লইগ্যা পথ্য হয় না
কেউবা খায় মিছরী পাক্।
কেউবা থাকে সুখের নিদ্রায়
কেউবা হাটে রাত্র দিন।
ও ভাই কামার কুমার, তাঁতী জোলা,
চাষাভূষা, নিঃসম্বল
আরও আছে যা'রা যা'রা, সবাই তারাবা একই দল।
আর যত আছেন বাবু ভূঁইঞা
ফুল কোচা টেরি কাটা
বইস্যা বইস্যা সুদ গোনেন আর
ওল্লা টিপ্পা গুড় বাড়ায়।
ও ভাই তারা হইল সুখের পায়রা
রহিম বলে শোন গো চাচা
বড লোকের বড কথা বেবাক দেখবা ফুশা ফাশা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

Have I not reason to lament
What man has made of man ?
—Wordswarth.

শুরু হ'ল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। একদিকে পরস্বাপহারী ইংরেজ ও তার মিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অপর দিকে জাপান ও জার্মান। ফলে ভারতের ৩৮ কোটী ৮০ লক্ষ জন সাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তা'কে জড়িয়ে পড়তে হল এই সর্বনাশা যুদ্ধের জ্বালে।

ভারতের রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ অনেক দিন আগেই নিঃশেষিত হয়েছিল এবার মানুষের দেহ নিয়ে শুরু হ'ল গেণ্ডুয়া খেলা।

এলো কণ্ট্রোল, ব্ল্যাক মার্কেট, ফুড কমিটি। অভাবের নূতন নূতন তাড়ায় বহু কুলনারী তার সতীত্বও বিক্রি করতে শুরু করল নরপিশাচদের লালসার কাছে। চাল উঠ্‌ল চল্লিশ টাকায়। একদিকে সরকার অপর দিকে ফুড কমিটি দুয়ে মিলে পল্লীবাসীর জীবন করে তুলল অতিষ্ঠ। খাদ্যাভাবে লোকে অখাদ্য খেতে আরম্ভ করল। দেশের তখনকার এই সব অবস্থা নিয়ে গাঁয়ের মুসলমান জারী গাইয়েরা শুরু করল গান বাঁধতে।

১৯৪১ সনের ডিসেম্বরে সিঙ্গাপুরে শুরু হল বোমা বর্ষণ। শহরের লোক পালাতে শুরু করল গাঁয়ে ও বনে জঙ্গলে। এই সময় কলকাতা প্রবাসী পূর্ববঙ্গীয়েরা সব গিয়ে জমায়েৎ হ'ল যে যার দেশে। এই সময়কার রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে শুরু হ'ল গান রচনা :—

উইড়াছে জাপানী উড়ু জাহাজ
বোমা ফ্যালে কাতার কাতার
মানুষ গরু একই সঙ্গে সব হইল কাবার।
সোনার দ্যাশ এই ভারত ভূমি
নাইরে দুঃখ, নাইরে ব্যাধি,

অলুক্ষনা সাগরপারের যতেক কাঙ্গাল
(ও) তারা জোট পাকাইয়া বাঁধাইছে জঞ্জাল।

ভারতের জন সাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘোষিত এই যুদ্ধে যা'রা বিরোধিতা করল সরকার তাদের আটকে ফেললেন জেলের ভিতর। নেতাজী তখন ভারতের বাইরে। মহাত্মাজী, নেহেরুজী, সর্দারজী, সবাই জেলে। ভারত তখন নেতার অভাবে তাদের এই বিপদে কী করবে না করবে কিছুই ভেবে ঠিক করে উঠতে পারছে না। এমন সময় ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে শুরু হ'ল ঐতিহাসিক গণ অভ্যুত্থান।

তা'রা নিজেরাই নিতে শুরু করল নিজেদের নেতৃত্ব। থানা পোড়াল, রাজ-কোষ লুঠ করল, হত্যা করল ইংরেজ রাজ কর্মচারী। মেদিনীপুর এবং ভারতের কোন কোন জায়গায় প্রতিষ্ঠিতও হয়ে পড়ল স্বাধীন সরকার।

কিন্তু নিরস্ত্র জনসাধারণের সাধ্য কি এত বড় বিশাল শক্তিব বিরুদ্ধে বেশীদিন টিকে থাকে? তাই চতুর ইংরেজ সৃষ্টি করল কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ। চাল, চিনি, কাপড়, তেল সব যেন ভোজবাজীর মত উবে গেল নিমেষের মধ্যে। রোগ, ব্যাধি এবং এই সঙ্গে আরও সব অবর্ণনীয় কাহিনীর মধ্যে দেশেয় চাষাভূষারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গান রচনা করল :—

এবার শ্যাত ইন্দুরে করল সারা
ভাইরে, ধানের বাজার হইল আক্কারা।
গরু বাছুর, মাইয়্যা মানুষ
ছাওয়ালপান, যুবা পুরুষ
একই ভাবে হইল সারা।

যুদ্ধ লাগছে রাজায় রাজায়
মধ্যের থিকা মইল পেরজায়,
নেতাগো সব ফাটক দিছে
উচিত কথা কইবে কে?
কইলে পরে জরিমানা, গারদ থানা,
ভাতে মারা, ছাশ ছাড়া,
আছে মোগো সগল জানা।
(আবার) এতেও নাকি সোয়াস নাই বসাইছে কন্‌টোল

(ও ভাই) চাউল হইয়াছে পঞ্চাশ টাহা
চৌদ্দ পুরুষে যা শুনি নাই।
কেরেচ ত্যাল পাওয়া যায় না
চিনিত চোখেই দেখিনা ;
গেরামের যত বাবু ভুঁইঞা
গুড় দিয়া চা খাইয়া
ফুড্ কমিটি করছে খাড়া।

শুধু জারী গাইয়েরাই নয়। স্বদেশী কোন কিছু বলা এমন কি যুদ্ধ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করলেও যেখানে শাস্তির ব্যবস্থা আছে, সেই বাংলা মুলুকেব নিভৃত অঞ্চলে আবার এতদিন পরে জেগে উঠল চারণ কবি মুকুন্দ দাসের দল। তা'বা তাদেব পূর্বাচার্যের অনুকরণে আবার শুরু করল স্বদেশী যাত্রা। পুলিশের শত বাধা সত্ত্বেও তা'রা আবার আগের মতই নূতন নূতন গান বচনা কবে পাড়ায় পাড়ায় শোনাতে শুরু করল :—

(ও) ভাইরে দেশের কী দশা হইল
ভারতবাসীব ঘরে ঘবে চাল নাই যে মেলে
ভাইবে দেশেব কী দশা হইল।
আলু, পটল, কলা, কচু, বাজারে যে না পাই কিছু
সব খেয়ে গেছে ঐ বানর ছুঁচো, বইতে নাহি দিল
(আব) দেশের কী দশা হইল।
ব্রাহ্মণাদি ভদ্র মুচি সব হয়েছে এবার শুচি
ভেবে দেখুন ভাই মিছা মিছি তারা একই হালে চলে
ভাইরে দেশের কী দশা হইল।
বাবু লোকের দফা সারা, অন্নাভাবে যায় যে মারা
এখন বলে ও'মা তারা তুমি কেন নিদয় হলে
ভাইরে দেশের কী দশা হইল।
যদি বলেন কেমন কথা, রেশন কার্ড যে পিতা মাতা
কণ্ট্রোলের লাইন ধরলে, আর দেশের কী দশা হইল।
অধম যতীন বলে বিনয় করে, এই ভাবতের ঘরে ঘরে
জেগে উঠুক হুহুঙ্কারে,

নেবে আসুন দলে দলে
নইলে দেশের কী দশা হইল।

কিংবা :— ওরে পাপ ঘিরিল বাঙ্গালা দেশে
বৈরাগী না ভিখ্ পায়, কাঁদিনু আপশোসে
ও ভাই পাপ ঘিরিল বাঙ্গালা দেশে।
বলে, ঘরের চাল বাড়ন্ত, দুঃখের নাহি অন্ত
দীনবন্ধু কী করিলে, এই ছিল কি অবশেষে
ভাইরে পাপ ঘিরিল বাঙলা দেশে।
(আবার) জীবন যুদ্ধ এল দেশে, লোকে মরে হায় হুতাশে
(আবার) কতক লোক যে আশায় বাঁচে, রেখে গেল তারা শেষে
পাপ ঘিরিল বাঙ্গালা দেশে।
কলিকালের শোনেন কথা, শুনলে মর্মে লাগবে ব্যথা
ছেড়ে দিয়ে পিতা মাতা, তারা গিন্নীর কথা ধরে বসে।
(আবার) কলিকাতা ঘুরি ফিরি, যখন বাবু গেলেন বাড়ি
গিন্নীর নিকট তাড়াতাড়ি চলেছেন বাবু মন হরিষে।
(আবার) বাবু যখন কথা বলে, গিন্নীর তখন মস্তক জ্বলে
(বলে) তোমার পিতা মাতার তোষানলে রইতে নাহি দিল মোরে।
পাপ ঘিরিল বাঙলা দেশে।
পিতা মাতা দিল ছাড়ি, গিন্নীর কথা সত্য ধরি
আলতা এসেন্ট, কাপড় পরি, তা'রা অহ্লাদেতে ভাসে,
(আবার) খুড়াওয়লা জোতা পায় দিয়ে—মোটর অমনি হাঁকাইয়ে
সিনেমার হলে গিয়ে টিকিট কাটে ফাস্ কেলাসে
পাপ ফিরিল বাঙলা দেশে।
আবার গিন্নী খান মিহি দানা, তাঁর পরনে ছেড়া টেনা
বাবুরা ইংলিশ ছাড়া কথা কয় না, মদের নেশায় সদায় ভাসে
পাপ ঘিরিল বাঙলা দেশে।
আইজ কাইলকার মেয়েরা, সোজা আলপেট কাটে তারা
কাপড় দিয়ে তাদের পিঠে বেড়া, সিঁদুর রেখে টিপ ঠাশে
পাপ ঘিরিল বাঙলা দেশে।

আইজ কালকের ছেলে ছোকরা
মাথায় আলপেট চুলে কোঁকরা
টর্চ্চ লাইট নিয়ে ঘোরা ফেরা
সিনেমায়তে সদায় বেহুশ
পাপ ফিরিল বাঙলা দেশে ।
(আবার) অল্প বয়সে চশমা চোক্ষে, উল্টা কোছা পিছনেতে
অতসী সেণ্ট পাঞ্জাবীতে, ভাত নাই পেটে দর্প ঠাশে
পাপ ঘিরিল বাঙলা দেশে ।
অধম যতীন বলে মনরসনা, মায়া বৃক্ষে ধরবে সোনা
মাতৃ পিতৃ কর ভজনা সময় থাকতে অবকাশে
পাপ ঘিবিল বাঙলা দেশে ॥

কিন্তু জারী গাইয়েরা এতটা রেখে ঢেকে বলবার লোক নয়। সত্যকথা সহজ ভাবে বলতেই তা'রা অভ্যস্ত। তাই তা'রা স্পষ্ট ভাষাতেই বলে :—

ভাইরে থাকা হ'লনা দেশে
বড লোক সব বড হইল, কাঙাল গরীব শুষে ।
বড লোকের এমনি ধারা, গরীব লোক করল সারা
তাদের নাই ভাই কুল কিনারা, একটু চিন্তা করুন বসে
ভাইরে থাকা হলনা দেশে ॥
গরীব লোকের রক্ত মাংস,—বড় লোকে করছে ধ্বংশ
তারাই এবার হবে নিব্বংশ, যখন সোনা ফেলে ধরবে সীসে
ভাইরে থাকা হলনা দেশে ।
এ দুনিয়ার জাল চালাকী, কতদিন চলবে ফাঁকি
ভেবে দেখুন দিবস রাতি, তারা ভুগিছে যক্ষাকাশে
ভাইরে থাকা হ'লনা দেশে ॥
(আবার) এই কটি ছড়িয়ে খেলে, আমরা সবাই দলে দলে
ফেলে দেব বড়াই করে, ছুটে যাব পয়সার নিশে
থাকা হলনা দেশে ।
বড় লোকের বাহ্য শৌষ্ঠব, এখন বল ভাই সকল

এবার মোদের জীবন গেল, রক্ষা কর একবার এসে
ভাইরে থাকা হলনা দেশে।
অধম যতীন বলে মা ভগ্নীরে, বসে আছেন কীসেব তরে
সতী সাজুন না এই বারে, সতীর সাজ ধরুন কশে
নইলে আর থাকা হবে না দেশে।

চোরাকারবার, গ্রাম্য ফুড-কমিটির চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণের দুর্নীতি-পরায়ণতার কাহিনী আমরা অনেক শুনেছি, অনেক হজমও করে ফেলেছি। মুখে মোটা মোটা বুলি কপচে এর বিরুদ্ধে আমরা অনেক সময় মতও প্রকাশ করেছি, মুখে এবং কাগজে। এমন কি এই সব শয়তান, নর পিশাচদের প্রকাশ্য রাজপথে বিচারের সুপারিশও কবেছি অনেক জায়গায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সব শয়তানদেব হাতে নাতে কোনদিন সাজা পেতে দেখেছেন কী? হয়ত না। কিন্তু আমরা শুনেছিলাম এর ব্যতিক্রম।

১৯৪৫ সালেব কোন এক মাসে (সম্ভবতঃ জুলাই, আগষ্ট) বরিশালের কোন এক গ্রামে গ্রামবাসী কৃষাণ-মজদুররা ক্ষেপে গিয়ে তাদের দুর্নীতি-পরায়ণ ফুড কমিটির-চেয়ারম্যান-প্রেসিডেণ্টকে কী ভাবে উচিত সাজা দিয়েছিল এব একটা কাহিনী (হয়ত কাগজেও দেখে থাকবেন) শোনা যায় এই জেলার গেঁয়ো চাষাভূষাদের মুখে :—

শোনরে বলি কাইলা চাচা, বরিশালের খবর খাশা
ফুড কমিটির প্রিসিডিংরে, জোতার মালা গলায় দিয়া
ঝুলাইছে রাস্তায়।
(আবার) নূতন খবর পাওয়া গেছে
(ও তার) রেশন কার্ড গলায় বাইন্ধ্যা।
চেনি এটটু হাতে দিয়া, কেরোশিন দেয় মাথায়।
(আবার) নূতন কাপড় দিয়া গলায় টাইন্যা বেড়ায় রাস্তায় রাস্তায়,
বলি উচিত সাজা হইল এত কাল, চাচা উচিত সাজা।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

Shed no tear-oh shed no tear ;
The flower will bloom another year
Adieu, Adieu ! I fly, adieu !
I vanish in the heaven's blue
Adieu, Adieu !!

—Keats.

১৯৪৬ (ইং) সালের আগষ্ট মাসে শুরু হ'ল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। ফলে সমগ্র বাংলা তথা সমগ্র ভারতব্যাপী দেখা দিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। আর এই দাঙ্গার অজুহাত নিয়েই শয়তান ইংরেজ সরকার গ্রহণ করাতে বাধ্য করল ভারত বিভাগের প্রস্তাব।

আর এই প্রস্তাবের ফলেই ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে ভারত মাতাব অঙ্গচ্ছেদ করে যখন গঠিত হ'ল সম্পূর্ণ দু'টো নূতন রাষ্ট্রের তখন পূর্ববাংলা থেকে শুরু হ'ল লোক পালান।

প্রথমে ধনী মানী, পরে ইতর-ভদ্র শেষটায় বাদবাকী প্রায় সকলেই এক বস্ত্রে ভিখারীর অধম হয়ে এসে জুটতে লাগল কলকাতা ও তার আশপাশের পল্লী অঞ্চলে।

কিন্তু এই দুর্দিনেও যে সহজ সত্য কথাটা বড কর্তাদের নজরে পড়েও পড়েনি, সেই কথাটা গিয়ে দানা বেঁধে উঠল পল্লী কবিদের কণ্ঠে। তারা দেশ ছেড়ে আসবাব আগে আর একবার তাদের দল সাজাল। শেষ বারের মত তাবা গান বাঁধল :—

আর রইল না মান, গেল মানীর মান
পান যদি ত্রাণ, এখন এক হন সকলে।
হিন্দু হয়ে হিন্দুজাতীর, নিন্দা ছাড়ুন সম্প্রতি
নচেৎ দেখুন হবে ইতি, সব আশা যাবে বিফলে।

যত ছিল আশা ভরসা, পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সবই নৈরাশা
এখন লোকের দিশা বিশা, হারা হৈল ভাই কর্মফলে।
বহুদিনের মাতৃ বলে, ভারতবাসীর চাপা কলে
সাদা ইঁদুর দলে দলে' ঠাণ্ডা হ'য়ে যান চলে॥
তাদের ছিল চক্ষু হ'ল অন্ধ, শেষে করে চক্রান্ত
ভাইয়ে ভাইয়ে লাগায় দ্বন্দ্ব সর্ব ক্ষেত্রে দেখা গেল।
শেষে সোনার ভারত করল শ্মশান
হিন্দুস্থান আর পাকিস্তান,
শেষে করে যায় এই বিধান
তাও বুঝি আজ যায় বিফলে॥
অধম যতীন বলে বিনয় করে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করে—
জেগে উঠুন ভাই হুহুঙ্কারে নেমে আসুন দলে দলে॥

কিন্তু এত যে আন্তরিকতা, এত যে উচ্ছ্বাস সবই গেল বিফলে। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর থেকেই শুরু হ'ল প্রবল ভাবে বাস্তু ত্যাগেব হিড়িক এবং তা' আজও সমানেই চলেছে।

পৌষমাস। খেজুর গাছগুলিতে ঝুলতে দেখা যায় রসের নতুন হাঁড়ি। কদিন পরেই নতুন গুড়ের গন্ধে ভরপুর হয়ে উঠবে বাড়ির আঙিনা। বন প্রান্তর মুখর হবে ভোরের শিশুদের কলগুঞ্জনে। শীতের সেরা খাদ্য রসের পায়েস। 'মুছি' পাটালি তৈরী করবার সময় আসে। কিন্তু সে সব আজ গল্প কথার সামিল। চতুর্দশ পুরুষের বাস্তু ভিটা ত্যাগ করে তারা চলতে শুরু করে অনির্দেশের পথে।

এই দারুণ দুর্দিনে শীতের কষ্টকে উপেক্ষা করে একবার শেষ চেষ্টা করবার জন্য মুসলমান জারী গাইয়েরা আবার তাদের যন্ত্রপাতি নিয়ে দল বেঁধে বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান গাইতে থাকে :—

স্বাধীন হ্যাশে লোক পালাইল
এমন খবর শোনছ কী ?
বাপ-দাদার ঐ ভিটা ছাইড়া
চলছে সবে কিন্যাশে কী।
হিন্দু মোছলমান একই জাইত ভাই
একই হ্যাহের দুইডা হাত,

কেউ কারও নয় শত্তুর রে ভাই
দুইএ দুইয়ে মিত্তির হয়।
রোজ সকালে আজান গান আর
বেরম্ভণের মোন্তর পাঠ,
সন্ধ্যাকালে নেমাজ পড়ে
কুলনারী পীদ্দিম ছায়,
এক সাথেতে রইছি মোরা,
এক সাথেতে করছি খেলা,
একই সঙ্গে চলছি ফিরছি
এখন কেন ভিন্ন ভাব ?
(ও ভাই) পরের কথায়, পরের ভবসায়
ছাইড়ো না দ্যাশ মাথা খাও।

কিন্তু সত্যই কি আমবা তাদেব কথা শুনেছি ?

নিশ্চয় নয়। আমরা তাদের মাথার দিব্যিকে গ্রাহ্যেব মধ্যেই আনিনি। সচ্ছল, অসচ্ছল সবাই আমরা এক জোটে ছেড়ে এসেছি আমাদেব জননী জন্মভূমিকে।

আজ নেই এখানে মুক্ত আলো বাতাস। নেই সেই প্রাণ খোলা দবাজ গলাব গান। চাঁদ, সূর্য এখানেও ওঠে, এখানেও অস্ত যায়—ঠিক যেন ঘড়িব কাঁটায় বাঁধা।

সন্ধ্যা এখানেও হয়। রাতও গভীর হয়! শেষটায় এক সময় ভোবও হয়। কিন্তু তা' ঐ শোনা কথা মাত্রই। আজ পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীব মত হয়ে উঠেছে আমাদের জীবন যাত্রা। আজ হঠাৎ ঝোপের আড়াল থেকে ডেকে ওঠা 'বউ কথা কও' পাখীব ডাকে আমাদের মন আকৃষ্ট করে না। চোখে পড়ে না কোন কুলনারীকে সন্ধ্যাবেলা তুলসী তলায় প্রদীপ দিতে। কানে আসেনা সেই গভীব নিশীথের বাঁশীর সুর :—

"এত বাইতে কেন ডাক দিলি (রে)
প্রাণ কুকিলা—"

তার পরিবর্তে চোখের সুমুখে বাস্তব সত্য অতি নিষ্ঠুর ভাবে দেখা দেয়—বেতারের বৈঠকী গান, ট্রাম বাসের বিরক্তিকর আওয়াজ ও ব্যথাভারাক্রান্ত মুখের কতকগুলি দীন ছবি।

———

পরিশিষ্ট—(১)

বারমেসে

॥ জারী ॥

(১)

নিশি প্রভাতকালে কুকিল ডাকে
ওবে ছাকিন।
এ বেশে আব ঘুমাইওনা
মাঝ দবিয়ায় ডুবলো সাধেব
লাল ডিঙ্গাখানা।
আমি ঘুমেব ঘোবে স্বপন দেহি
বিছানাব পব নাহেব সোনা,
গলাব হাব খসিয়া পড়ে
বিধিব একী কাবখানা॥

(অ-আহায়-এ)

আব ডাকিস না কাল কুকিল
তমালেব ডালে,
ঘুমে ছিলি, ছিলি নিবলে
ডাক দিয়া ব্যান শোকেব অনল
দিলি জ্বালাইয়ে।
আমাব একগুণ আগুন জ্বলছে ত্রিগুণ
নিব্রাণ (নির্বাণ) অয়না জলে গ্যালে
প্রাণপতি মোব গ্যাছে ছেড়ে
বসন্তের কালে।
জানাই এই নিবেদন হে নিরঞ্জন
তোমারই দরবারে

(তুমি) ভালবেসে দন্তি কর যাবে
মহালীলা প্রকাশিল এই বংশের পরে।
তুমি কেউরে হাসাও, কেউরে কাঁদাও
কেউরে ভাসাও ভাব সাগরে
বিয়ার রাইতে মরছে পতি কোন্ বা বিচারে॥
অধীন মোছলেম বলে অসীম লীলা
বিধির এ লীলা কে বুঝতে পারে?

(২)

বিয়াব কালে যুদ্ধে যাইতে ক্যান আকিঞ্চন
হে প্রাণনাথ, আর আমায় কান্দাইওনা।
হে অনাথিনী কইর‍্যা মোরে বিবাহ বাসরে
কোন্ প্রাণে প্রাণনাথ চইল্যাছ সমরে।
(হে প্রাণনাথ আর আমায় কান্দাইওনা)॥
হো মহাকর্তব্যের তরে ওরে ছাকিনা,
চইল্যাছি এ ঘোর সমরে কাইন্দোনা কাইন্দোনা।
হে যাইওনা যাইওনা নাথ আমারে ছাড়িয়া
যদি যুদ্ধে যাইতে ছিল সাধ ক্যান কইবল্যা বিয়া
(হে প্রাণনাথ আর আমায় কান্দাইওনা)॥
হো পানি বিনা শিশুগণে ভুইগ্যা ভুইগ্যা মরে
ক্যামনে দেখিয়া ইহা থাকিব শিবিরে হে।
হে উদয় অস্তে একই সাথে কে দেইখ্যাছে কোথায়
বিয়ার ঘরে স্ত্রী-রাইখ্যা সোয়ামী যুদ্ধে যায়
(হে প্রাণনাথ আর আমায় কান্দাইওনা)॥
হো রণে যদি না যাই প্রিয়া হাসরের দিনে,
ক্যামনে ছাখাব মুখ বাবাজী (আব্বাজান) সামুনে॥
হে যাও হে বীরেন্দ্র কান্দে রাত্র মধ্য কালে
ডুবাও হে এজিদের নাম ছেরাদেরি জলে
(হে প্রাণনাথ আর আমায় কান্দাইওনা)॥

হো হয়ত আর দেখা হবে হাসরের দিনে
বিরহ বিচ্ছেদ জ্বালা নাহিগো যেখানে (হে)।
হে তুমি যথা দাসী তথা জেন গো নিচ্চয়,
আসমুদ্র সীমাময় ঘোষিবে ধরায়
(হে প্রাণনাথ আর আমায় কান্দাইওনা) ॥

(৩)

হারে ও আমার প্রাণনাথ
এস এস এস প্রাণ হৃদি বাসরে।
কে রঙিলো সোনার তনু-গো
হা হা খুনখারাবী আবিহিরে ॥
এস এস গো পিয়া এসেছি পাণ পিতিয়া
বুকে বিন্ধা বিষের চিত দেখহ লজরে
(হারে) অঘোর ঘোরে ঘুম দিল গো
সাকিনালো তোর ঘরে,
এস এস ওগো বর
ধন্য আমার বাসর ঘর
আমিও লইব শয্যা তোমারি ধারে।
দাঁড়াও দাঁড়াও নাথ গো
আমি রক্ত চেলি লই পরে
(হারে ও আমার······)
এস তবে প্রেয়সী চল বাসরে বসি
রক্তজবার সয্যাপাতি গাঢ় তিমিরে।
নিবিড়ে ঘুমাব দোঁহে গো
বাসী বিয়ার হাসরে
(হারে ও আমার······)
ওকি এত সকালে সত্য সত্য ঘুমালে
চক্ষু চাইয়্যা ছাখ নাথ এই খঞ্জরে,
(হারে) হানিছে মোর সুখ নিদ্রা গো
হা হা সাকিনালো তোর ঘরে।

(৪)

আরে হোসেন কান্দে কান্দে হোসেন পানি হাতে লইয়্যা
কলেজা অঙ্গার হইল পানির লাগিয়া রে-এ-এ।
হোসেন কান্দে, কান্দে হোসেন পানি হাতে লইয়্যা॥
এই পানি বিনে মোর ফরজ-দ ইয়ার।
তামাম শহীদ হইল কারবালা মাঝার।
দুধের বাচ্চার বুকে তীর পানির লাগিয়া।
একেলা খাইব পানি সকলে হারাইয়া-রে-এ-এ।
হোসেন কান্দে, কান্দে হোসেন পানি হাতে লইয়্যা॥
এই বলিয়া পানি দিল ফোরাতে ঢালিয়া।
সোনার হোসেন পইড়্যা গ্যাল তীরেতে ঢলিয়া॥
তারপরে উঠিয়া মর্দ দুলদুলে চড়িল।
বেইমান এজিদ ফৌজ কতই মারিল॥
মারিতে মারিতে সৈন্য ঢলিয়া পড়িল।
দিন দুই পরে সারা দুন্যাই আন্ধাইরে ঘিরিল (রে)
হোসেন কান্দে, কান্দে হোসেন পানি হাতে লইয়্যা॥

॥ সারি ॥

(১)

গাজী, গাজী বল ভাই বদর বদর ভাই। (ধুয়া)
পাছার মাঝি হাইল ভালা
বাইছা সব সমান,
মাচ্ তালেতে ফালাইয়া বৈঠা
কেরামতি টাকা
আসমান করিয়া সাক্ষী
পারের দিকে চাইয়্যা
গাজীর নামে ফালাই বৈঠা
যাই সারি গাইয়্যা!

(২)

ওরে ও সুন্দইর‍্যা নাওয়ের মাঝি
কোন্ দিন ছাড়িবারে নাও
আমি যেন জানি (মাঝিরে)
আকাশেতে ওঠেরে চাঁদা
সঙ্গে লইয়্যা তারা,
আর কতকাল রইব আমি
দিশাহারা হইয়া।
বরাবর মাঝি, ঐনা বরাবর
ডালিম গাইছ্যা বাড়ি আমার
পুব দুয়াইর‍্যা ঘব।
আমার বাড়ি গ্যালেরে মাঝি
বইতে দিমু পিড়া,
খাইতে দিমু তোমায় আমি
শালিধানের চিডা।
শালি ধানের চিড়া দিমু-রে
বিন্নি ধানের খই,
মোটা মোটা শবরি কলা
গামছা বান্ধা দই।
(ও মাঝি-রে)—
বনের যত পশুপাখি
জোড়ায় জোড়ায় চলে আসি
বিধি দোষে আমার জোড়া
লেখে নাই কপালে (রে)।

॥ গাজীর গান ॥

(১)

দম দামাইয়্যা হাঁটে নারী চউখ পাকাইয়া চায়।
সেইনা নারী অভাগিনী আরো পতি খায়॥

রাইন্ধ্যা বাইড়্যা যে বা নারী পুম্ষের আগে খায়।
তার ভরনা কলসীর জল তরাসে শুকায়॥
আউলাইয়্যা মাথার ক্যাশ ঘোরে পাড়া পাড়া।
নিশ্চয় জানিবা তোমরা স্যাওত লক্ষ্মীছাড়া॥
নাইয়্যা ধুইয়্যা যে বা নারী উল্টা বাঁধে ক্যাশ।
তার ঘরে লাথি মাইর‍্যা লক্ষ্মী ছাড়ে দ্যাশ॥
ভাত খাইয়্যা যে বা নারী মুখে দ্যায় পান।
লক্ষ্মী বলে সেই না নারী আমার সমান॥
সতী নারীর পতি যেন পব্বতেরি চূড়া।
অসতীর পতি যেন ভাঙ্গা নায়ের গুড়া।
সকাল বেলা গোবর ছড়ায় সন্ধ্যাকালে বাতি।
লক্ষ্মী বলে সেই না নারী আমার মত সতী॥

(২)

মুসলমানে বলে গো আল্লা হিঁদু বলে হবি,
নিদান কালে যাবেরে ভাই একই পথে চলি,(রে)।
দোয়ানি করিবা আল্লারে—।
গোয়ালে যাইগো বন্দেক দিয়া,
গোয়ালিনী রয় চাইয়্যা (হায়রে)
গোয়ালে পড়িয়া বাছুর হাম্বা হাম্বা
ডাকিতে লাগিল রে,
দোয়ানি করিবা আল্লারে।
বড়গো মাঝি, ছোটগো মাঝি,
আইলা আরো গেলা (হায়রে)
মধ্যম মাঝি আইবার কালে আল্লা
চিপা মাইর‍্যা ধইরলারে।

(৩)

পরথমে বন্দনা করি পুবের ভানুশ্বর।
একদিগে উদয়গো ভানু চৌদিগে পশর॥

দক্ষিণে বন্দনা করি ক্ষীরনদী সাগর।
সেখানে বাইতো গো ডিঙা চান্দ সদাগর॥
পশ্চিমে বন্দনা করি মক্কা হেন স্থান।
যেখানে হইয়াছে পয়দা কিতাব আর কোরাণ॥
ইহার পশ্চিমের কথা কহনওনা যায়।
আঁডিয়ে বান্দিলে ভাত ররাস্তনে খায়॥
উত্তরে বন্দনা করি হিমালয় পর্বত।
যেখানে বাইখ্যাছেন আলী মাল্লামের পাথর॥
চাইর কোনা পিরথিমী বন্দিলাম মন করিয়া স্থির।
সুন্দরবন মোকামে বন্দিলাম গাজী জিন্দাপীর॥

॥ ম্যাঘারাণীর গান ॥

(১)

ও ময়না দ্যাখ আসিয়ারে
আসমানে ওই কালা ম্যাঘের দল,
ঢাক বাজে, শঙ্খ বাজে
আর বাজে মাদল।
চাষীর তরে আষাঢ় আইলো
সোনা ফলবে মাঠে
ধান ব্যাপারীর ডিঙাখানি
ভিরবে আইস্যা ঘাটে।
(আরে) ধান বেইচ্যা কিন্যা দিমু
তোর কানেরি ফুল,
কত নাইয়্যা নাও বাইয়্যা
গঞ্জে দেবে পাড়ি,
নাইওর যাইতে দিও মোরে
মোর বাপের বাড়ি।

মোর ক্ষ্যাতেতে সোনার ধান
ভাইঙ্গা দেবে কে,
ঘরে আছে ননদিনী
ভাইঙ্গা দেবে সে !
আসমানে ম্যাঘ রইলো
তোর চৌখেরি জল ॥

(২)

মেঘারাণী মেঘারাণী
হাত পা ধুইয়্যা ফ্যালাও পানি,
মেঘারাণীর সাত পুত
বৃষ্টি পড়ে ঝুপ্ ঝুপ
আল্লারে ভাই, আল্লারে ভাই,
এক ঘটি মেঘ দেরে ঘরে ভিজ্যা যাই।
চিনা ক্ষ্যাতে চিনচিনানী
বড় ক্ষ্যাতে হাটু পানি।

(৩)

হ্যাদে লো ম্যাঘারাণী
হাত পাও ধুইয়্যা ফ্যালাও পানি।
চিনা ক্ষ্যাতে চিন্‌চিনানী
ধান ক্ষ্যাতে হাটু পানি।
খরা না লো পূর্ণিমার চাঁদ
ঝর্ ঝরাইয়্যা বৃষ্টি নাম।

॥ আগমনী গান ॥

(১)

ঐ দেখগো মেনকারাণী নন্দিনী উমা এসেছে।
কাল অবধি যাত্রা করে বিল্বমূলে উমা রয়েছে।

হেম ঘটে পূরে বারি, বিল্বপত্র সারি সারি
এসেছে তোর প্রাণের গৌরী
কার্তিক গণেশ সঙ্গে আছে,
একপদ মহিষাসুরে, আর এক পদ সিংহ পরে
দশ করে অস্ত্র ধরে
বামে হেলে দাঁড়িয়েছে।
বামে কার্তিক সরস্বতী, ডাইনে লক্ষ্মী গণপতি
সিংহ পৃষ্ঠে ভগবতী
ঐ ত্যাখ এসে দাঁড়িয়েছে।

(২)

পুণ্য ধাম বাপের বাড়ি
যাইতে চাহে সকল নারী
ঐ দেখনা দুর্গাদেবী সিংহ বাহিনী।
গণেশেরে কোলত করি আইসেন জননী॥
সম্মুখেতে নন্দী আইয়ের আশা ছোটা ধরি।
ডিঙ্গি চলে পাছে পাছে ধুতুম্ তুতুম্ করি॥
মেনা আইলো করাই নিতে আদরের ঝি।
ঝি নাতি দেখি মেনা হাসে ভাসে সুখে।
বাটা ভরি আনে পান দিতে ঝিয়ের মুখে॥
আক বাডাইয়া নিল মায়ে বাড়ির ভিতর।
পূজা দিল, বলি দিল খাবাইল বিস্তর॥
তিন দিন রাখিয়া মায়ে বড় যতন করি।
চারি দিনের দিন বিদায় দিল যাইতে নিজের বাড়ি॥
শিবে বোলে কী আনিলা আমার কারণ।
আলুনি কচু শাক টুনি পোড়া পানি ভাত,
গরীব বাপের বাড়ি আমার ভোজন॥

(৩)

পাগল ভোলা আইলোরে,
গিরিপুরে সিংহদ্বারে ডম্বরু বাজাইলোরে।

লটপট বাঘের ছালে গলায় হাড়ের মালা।
আধেকো চাঁদের আলো জটা জুটা আলা।
পুরনারী কাঁপে ডরে, করে কানাকানি,
কেমনো জামাতা ঘরে আনলেন গিবিরাণী।
ভোলা কারো পানে নাহি চায়
কেবল উমার মুখে তাকায়,
উমার যাবার কথা ইশারায় জানাইলোরে ॥

॥ ভাটিয়ালি ॥

(১)

আরে ও ভাইটাল গাঙের নাইয়্যা
দুঃখিনীরে এই খবর কইও বন্ধুর বাড়ি যাইয়্যা।
ও নাইয়্যারে কইও, কইও মোর বন্ধুর কাছে
মোর প্রতিনিধি হইয়্যা।
আইব বইল্যা আইলনা বন্ধু গ্যাল দিন বইয়্যা।
হেমন্ত শীতান্ত গ্যাল মোর কান্দিয়া কান্দিয়া
রে বন্ধু বইয়্যা রইলাম বন্ধুর পথ চাইয়্যা।
মনের আগুন জ্বইল্যা উঠ্‌ল বসন্তের বাও পাইয়্যারে,
কইও, কইও তুমি মোর বন্ধুরে বুঝাইয়্যারে।
অবন্ধু মোর মাথার কিড়া দিয়া।
বন্ধু আইস্যা যদি দিত দেখা
আমি মরিতাম হেরিয়া।

(২)

হারে-ও……সুন্দর মাঝিরে
আমার কথা লইওরে মাঝি আমার কথা লইও,
ঝড় তুফান ছাখলে মাঝি কিনারে লগাইও।
আমার কথা লইওরে মাঝি আমার কথা লইও ॥

নদীতে উজান দ্যাখলেরে মাঝি ভাটিতে নাও বাইও,
মাঝি ভাটিতে নাও বাইও।
বেশী ভাড়া পাইলেরে মাঝি
উজান বাঁকে যাইও।
আমার কথা লইও।
হারে ও সুন্দর মাঝিরে
যদি উজান বাঁকে বাতাস পাও
তাইলে বাদাম তুইল্যা দিওরে মাঝি
পাল তুইল্যা দিও
আমারি কথা লইও।

(৩)

কে যাসরে রঙিলা মাঝি
সামের আকাশরে দিয়া,
আমার বাজানরে কইও খবর
নাইওরের লাগিয়াবে।
গলুইতে লিখিলাম লিখন সিন্তার সিন্দুর দিয়া
আমার বাপের দেশে দিয়া আইস গিয়া
—রে রঙিলা মাঝি।
আমার বুকের নিঃশ্বাস পালে নাও ভরিয়া
ছয় মাসের পন্থ যাইবা ছয় দণ্ডে চলিয়া
—রে রঙিলা মাঝি।
পরার ছেইল্যার লগে বাজান মোরে দিছিল বিয়া
এক দিনের তরে আমাক না দ্যাখল আসিয়া।

॥ বিচ্ছেদী গান ॥

(১)

এত রাইতে ক্যানে ডাক দিলিরে প্রাণ কুকিলা,
আমার নিভান অনল জ্বালাইয়া গেলি
(রে প্রাণ কুকিলা)।

(আমার) শিয়রে শাশুড়ী ঘুমায় জ্বলন্ত অগনি,
পৈথানে ননদী ঘুমায় তুবন্ত ডাকিনী।
আমার শাশুড়ী ননদী যদি থাকেরে জাগিয়া
এখনি মারিবেরে তোরে পাথারে ফেলিয়া।
আম গাছে আম ধরে জাম গাছে জাম,
আমি পন্থের পানে চাইয়া দেখি
আসে কিনা শ্যাম।
বন্ধুর বাড়ি, আমার বাড়ি মইধ্যে নলের বেড়া,
হাত বাড়াইয়া দিতে পান কপাল দেখি পোড়া।

(২)

সুখ বসন্ত আইসে যায়
কুকিল গাছে ডাকে হায়
খসম হামার গ্যালারে বিদ্যাশ
ফিরয়াত' আর আইলা না।
বাঘ-ভাল্লুকের দ্যাশেরে
খসম হারিয়া কি তায় গ্যালারে
আমার হাতের বান্ধা ছালুন চাইখ্যা গ্যালানা
খসম তুমিতো আমার ফির‍্যা আইলানা।
খসম আইলে বসতে দিমু
কাঁঠাল কাঠের পিঁড়া (রে)
কাইট্যা আনুম মানের পাত,
তাতে দিমু খাইতে ভাত
মানের গোড়ায় ছাই দিয়া
দিমু মাথার কিড়া (রে)।
ঝড় বাদলের শীতেরে
খসম তোষক নাহি পাও,
হামার শাড়ির আঁচল দিয়া
ঢাইকো তোমার গাও।

পুঁথির মালা কিনতে গ্যালা,
হাট হইতে আর ফিরলানা
খসম তুমিতো আমার ঘরে আইলানা।

॥ বারমাস্যা বা বারাসি গান ॥

ইহত ফাগুনমাস সখী ফাগুয়ার খেলা,
মোন করে আনচান সখী মোনে একী জ্বালা।
রাই কপালে তিলক ফোঁটা চোখে কাজল রেখা,
এমন দিনে বন্ধুর আমার নাই পাই দেখা।
(লো ফুল্লরা বন্ধু পরবাসীরে)

ইহত' চৈত্রমাস সখী বাজ পড়লো সুখে
চত্রি মন্দা বাও হইল সুন্দরী কইন্যার মুখে।
নাইওকো রাও মুখে সখী বাও নাইকো চৌক্ষে,
অনল যেমন দইগ্ধা মারে জ্বলে পরাণ দুঃখে।
এমন দিনে বন্ধুর আমার নাহি দরশন,
চত্রি মন্দা বাও হইল অনল পরাণ।
(লো ফুল্লরা বন্ধু পরবাসী রে) ॥

ইহত' বৈশাখ মাস হে কিষাণ মারে হালি,
লাফ্ দিয়া ধরে কইন্যা লাউ কুমারের জালি।
লাউ কুমারের জালি নয়রে ফল বানাইয়্যা থোব,
আমার বন্ধু ত্যাশে আইলে দুঃখের কথা কব।
(লো ফুল্লরা বন্ধু পরবাসী রে) ॥

ইহত' জ্যৈষ্ঠমাস সখী গাছে পাকা আম,
আর আছে বৃক্ষ ভইর‍্যা কালা কালা জাম।
আম খাব, জাম খাব, খাব গাইয়ের দুধ,
ঘরের বন্ধু দূরে আছে খাবার কিবা সুখ?
(লো ফুল্লরা বন্ধু পরবাসী রে) ॥

ইহত' আষাঢ় মাস হে গাছে পাকা লেওয়া,
হাবা কোণে ম্যাঘ লাগল গর্জি আসে দেওয়া।
বর্ষুক বর্ষুক দেওয়া বর্ষুক বর্ষুক পঞ্চ ধারে,
অবশ্যি আসিবে পতি আসিবে এই বারে।
(লো ফুল্লরা বন্ধু পরবাসী রে) ॥
ইহত' শাওন মাস সখী নদী নালায় পানি,
হাতের কাম নাহি সরে কাটে দিন রজনী।
ভাদ্দর মাসে ভাদ্দর বৌ নাহি যায় ঘরে,
তুরন্ত বাদলে কইন্যার চৌক্ষে বারি ঝরে।
(লো ফুল্লরা বন্ধু পরবাসী-রে) ॥
আশ্বিন মাসে মানত করে পুজে ভগবতী,
আবাগীর কপালে নাহি আইসে প্রাণ পতি।
(লো ফুল্লরা বন্ধু পববাসী রে) ॥
কার্তিক গ্যাল আঘন আইলো মডায় উঠলো ধান
অন্ন বিনা শুকনা হইল সাধের দেহ খান।
(লো ফুল্লরা বন্ধু পরবাসী-রে) ॥
পৌষ পাবণের পিঠাপুলি মাঘে হিমের বাও,
সর্ব অঙ্গে কাঁটা লাগে দুঃখে জীবন যায়।
(লো ফুল্লরা বন্ধু পরবাসী রে) ॥

॥ হোলির গান ॥

(১)

ও সই যাবেনি গো যমুনায় জল আনিবার ছলে,
কী রূপ দেখিয়া আইলাম কদম্বেরি মূলে।
ও সই যাবেনিগো যমুনায় জল আনিবার ছলে।
একদিন রাধে স্নানের বেলায় কিনা কাম করিল,
দেখ সোনার কলসী কাঁখে লইয়া যমুনাতে গেল।

কাহার পিন্ধন লাল, নীল কাহার পিন্ধন সাদা,
সুন্দর রাধিকার পিন্ধন কৃষ্ণ নামটি লেখা।
সখীগণ সঙ্গে রাধা জলকেলী করে,
কলসী গেল সুতে ভাইস্যা বসন নিল চোরে।
গলা পানিত থাইক্যা রাধা বসনখানি চায়,
কালা বলে এইরূপে কি বসন দেওয়া যায় ?
কোমর পানিত থাইক্যা রাধা চাহিল বসন,
শ্যাম বলে রাধে তোমার নাই কি সরম ?
তখন হাঁটুজলে থাইক্যা রাধা চাইল বসনখানি,
কৃষ্ণ বলে দেখি তোমায় তীরে আইস ধনি।
তীরে উইঠ্যা রাধা বলে বসন দাও হে শ্যাম,
কৃষ্ণ বলে আগে রাধা যৌবন কর দান ॥

(২)

তোরা দোল দেখবি আয়
যারা দোল দেখবি আয়,
(ও) যুগল মূর্তি দেখবি যারা
দোল যাত্রায় আয়।
অষ্ট রং, গোলাপী বরণ, আবির, কুম্ কুম, চন্দন,
(ওরা) রঙবেরঙে রাঙা হয়ে দোল খেলিয়া যায়।
তোরা দোল দেখবি আয়
যারা দোল দেখবি আয় ॥
(আর) কাজল বরণ আঁখি ওরে
ষোল কলার পূর্ণিমা,
দেখে যারে মন পাগলা প্রেমানন্দের ভঙিমা ॥

॥ ধামাইল ॥

আমি কী হেরিলাম জলের ঘাটে গিয়া
(লো নাগরী জলের ঘাটে গিয়া)।

দেখিলাম কালোরূপ লাগিল নয়নে
আমি কুক্ষণে চাহিয়া ছিলাম গো
গৌরচন্দ্রের পানে।
কলসীতে নাইরে পানি
আমি দিয়াছিলাম সুরধনী
কানেতে বা না শুনি শ্রবণে।
একদিন জলের ঘাটে দেখে তারে মজেছি পরাণে।
কাইলা থাকে রাজপথে,
তোমরা কেউ যাইওনা জল আনিতে গো,
দেখলে তারে মরিবে পরাণে,
শেযে আমাব মত ঠেকবি তোরা
এই আছে কপালে।

॥ আনুষ্ঠানিক গান ॥

[চিড়া কোটার গান]

চিডা কুটি, চিড়া কুটি বৌল গাছের তলেতে
ও দিদি কুটুম আইস্যাছে বাড়িতে।

বড বইনে চিড়া কুটে, মাইঝম বইনে ঝাড়ে
ছোট বইনে নদীর ঘাটে দেইখ্যা আইলো কারে।
(ও দিদি কুটুম আইস্যাছে বাড়িতে) ॥

আগ দুয়ারে কুটুম আইস্যা পানের বাটা চায়
পিছ দুয়ারে বড় বইনে ঘোমটা দ্যায় মাথায়।
(ও দিদি কুটুম আইস্যাছে বাড়িতে) ॥

সন্ধ্যাকালে কুটুম আইলো বইসতে দিলাম পিঁড়া,
জলপান করিতে দিলাম শাইল ধানের চিড়া।
(ও দিদি কুটুম আইস্যাছে বাডিতে) ॥

।। বিয়ের গান ।।

(১)

তোমার রামের অধিবাসের রাণী সময় গেল।
গা তোল কৌশল্যা রাণী নিশি প্রভাত হইল ॥
তোমরা সখী আনগো হলুদ, আনগো হলুদ সকলে।
আমার রামেরে সিনান করাও অতি সকালে ॥

(২)

জলে ঢেউ দিওনা গো সখী
ঢেউ দিওনা, ঢেউ দিওনা
আমরা জলের চাতকী।
জলের কালোরূপ নিরখি
জলে ঢেউ দিওনা গো সখী।
আগে সখী, পাছে গো সখী
মধ্যে রাধা চন্দ্রমুখী।
ঢেউ দিওনা সখী কৃষ্ণের কালোরূপ নিরখি।
কেহর পৈরন নীলাম্বরী
কেহর পৈরন সাদা ধুতি,
রাধার পৈরনে শাড়ি
তাতে কৃষ্ণের নামটি লেখা দেখি ॥

(৩)

আম তলায় ঝামুর ঝুমুর কলা তলায় বিয়া,
আইলো গো সুন্দরীর জামাই মুটুক মাথায় দিয়া।
মুটুকের তলায় তলায় চন্দনের ফোঁটা।
চল সখী সবাই মিল্যা জামাই বরি গিয়া।
(ও রাধে) ঠমকে ঠমকে হাটে
শ্যাম চাঁদের পাছে যেমুন ময়ুরে প্যাখম ধরে।
আগে যায় গো শ্যাম রাজা পাছে যায় গো রাধা,
তারও পিছে যায় গো পুরুত ভৃঙ্গার হাতে লইয়্যা।

একও পাক, দুইও পাক তিন পাক যায়,
সাত পাক গিয়া রাধা নয়ন তুইল্যা চায় ॥

(৪)

রাধা শ্যাম একাসনে সেজেছে ভাল,
লো সখী সেজেছে ভালো।
শ্যমের ভঙ্গীটি বাঁকা,
চূড়ায় ময়ূরের পাখা
ওলো রাই আমাদের হেমবরণী
শ্যাম চিকন কালো

॥ বাউল ॥

(১)

গুরু তোমার চরণ পাব বইল্যারে
মনে বড় আশা ছিল,
আমি আশা নদীর কূলে বইস্যারে
আমার আশায় জনম গ্যাল।
পার হব, পার হব বইল্যা
আমি বইস্যা রইলাম নদীর কূলে
পার হব বইল্যা।
আবার ছয়জনা বোম্বাইটা জুইটা
আমায় পাক জলে ঘুরাইলো।
চাতক রইল ম্যাঘের আশে
ম্যাঘ ভাইস্যা যায় অন্য দ্যাশে
চাতকী বাঁচে বা কিসে ?
(আবার) জল বিনা চাতক মইল গো
আমার তেমনি দশা হইল গো ॥

(২)

আইলোরে চৈতন্যের গাড়ি সোনার নদীয়ায়।
(আজি) রাই কোম্পানীর জংশন হৈল শ্রীবাস আঙ্গিনায়॥
জগাই মাধাই হয় প্যাসেঞ্জার,
নিত্যানন্দ টিকিট মাষ্টার
আইজ শ্রীগৌরাঙ্গ ড্রাইভার হইয়্যা
সেই গাড়ি চালায়।
আজি গরীব লোকের কী সুবিধা
ধনী বইল্যা নাইতো বাধা
আজি ভক্তি বিধান দান করিলে
টিকিট পাওয়া যায়।
ও দীন শরৎ বলে, যাবো কাছে
রাধারাণীর চালা আছে,
তারা ফাষ্ট কেলাসের টিকিট কাইট্যা
ব্রজধামে যায়॥

॥ মাণিকপীরের পাঁচালি ॥

আমার দুষ্কের ছাওয়াল পীর।
বারো বছরের কালে হইয়্যাছে ফকির॥ (ধুয়া)

আশা হাতে খড়ম পায় মুখে নুর-দাড়ি।
ধীরে ধীরে চললেন মাণিক কালু ঘোষের বাড়ি॥
দোম্ দোম্ বলে ফকির জানালেন জিগির।
কানুরমা বুড়ি বলে ওই আইলো ফকির॥

একেতো গোয়ালের নারী কত মকর জানে।
ভাঙা একখানা ডালায় কইর‍্যা গোডা দুই চাউল আনে॥

চাল কড়ি জাম্বিল বড়ি সব বাড়ি পাই।
ফটিক দুগ্ধ দেওগো মা দোয়া কইর‍্যা যাই॥

দোয়া পীরের ফকির তুমি দোয়া দিতি পার।
রাত পোয়ালে ক্যান তুমি হাবড় ভাইঙ্গা মর॥
হাবড় ভাইঙা মরি আমি লইয়ে আল্লার নাম।
তেরা বাড়ির ভিক্ষা নিতে নাইকো কোন কাম॥
আমার বাড়ি আছে দুগ্ধ কনতে এলে শুনে।
হাকিমে ফরমাজে দুগ্ধ তাও যোগাই কিনে॥
বেশলি পোরা আছে দুগ্ধ হাঁড়ি পোরা দই।
আমাকে যে ফাঁকি দিয়ে থাকবা তুমি সুখী।
গোরু-বাছুর মইরে যাবে, ছাই লাগবে তোর মুখি॥
কানুর বউ বলে ঠাকুরণ দুধ-ননী দেও।
সব দুধ দই কিছু দোয়া চেয়ে নেও॥
আমি বললাম কিছু নাই তুই দিলি কয়ে।
তোর বাপের গাই থাকেত তাই দিগে দুয়ে॥
আসুক আগে কানু বাড়ি সব দেবো কয়ে।
তোর বাপের দেশের ফকির বলে দরদ গেল বয়ে॥
দেয়ান বলে, মা তুমি কথা বলো না।
উচিত মত সাজা না দিলে জাহির হবে না॥
দুধ যদি খাও ফকির গোয়াল দোরে যাও।
গোয়ালে আছে বাঁঝো গাই তাই দুয়ে খাও॥
বাঁঝো গাইর দুধ তুমি কখনও খেয়েছো।
এত বলি মাণিক জেন্দা গোয়াল দোরে গেল।
দেখিয়া বাঁঝুয়া গাই উঠিয়া খাড়া হোল॥
দেয়ান বলে, গাই মা একটু দুধ দ্যাও।
থোড়া দুধ দিয়ে আমার ইজ্জত বাঁচাও॥
বার বছরের বাঁঝো আমার আগুন-বিগুণ নাই।
আমার মত পোড়া কপালি এ ত্রিভুবনে নাই॥
দেয়ান বলে গাইমা ভেবোনা তুমি।
আল্লার দরবার হতে দুধ চেয়ে নেব আমি॥
হাত উঠাইয়া দোয়া চাহেন জেন্দা-পীর।

গায়ের খবর দিল আল্লার উকীল।
মন্নুরথ রথ বলে তিন ডাক দিল।
স্বর্গ থেকে মন্নুরথ আসিয়া পৌছিল॥
দেয়ান বলে কান্নুরমা, একটা ভাঁড় দেও।
গাই দুয়ে দিয়ে যাই জন্মের মত খাও॥
মাচার তলে ছিল একটা সাত ছেঁদা ভাঁড়।
দেয়ানেরে এনে দিল হারামজাদা রাঁড়॥
আস্তে আস্তে দেয়ান তখন গোয়ালে যায় হেঁটে।
পানাইল বাঁঝো গাই ছাদন দড়ি এঁটে।
দুইতে দুইতে দুধ দোলেন সাত মেঠে॥
ছাড়িয়া দিলেন মন্নুরথ গেল যে চলে।
দেখিয়া নগরের লোক ধন্য ধন্য বলে॥
এত দুধ দুয়ে দেলেন কান্নুরমা তবু দেলে না।
ফকির গায়েব হল কেহ জানেনা॥
ফকির গেল গায়েব হয়ে মড়ক এল দেশে।
দুই একটি মরিতে লাগিল গ্রামের আশে পাশে॥
পরে এল মড়ক কান্নু ঘোষের পালে।
মড়ক দেখিয়া বুড়ির মাছি গেল গালে॥
আগে যদি জানতাম আমি মানি সত্যপীর।
আগে দিতাম দধি দুগ্ধ পাছে দিতাম ক্ষীর॥
ও আমার মাণিক সনাতন।
কোন্ পথে গেলি তোমার পাব দরশন॥
কারুর ফোলে হাঁটুর মালা কারুর ফোলে পা।
অসার হয়ে থাড়' আছে ফুলেছে কেবল গা॥
মরিতে লাগিল গোরু লেখাপড়া নাই।
পঞ্চাশ হাজার দামড়া এক লক্ষ গাই॥
আঁড়ে বক্না কত মোলো তা'কে গোনে।
সহস্র সহস্র শকুনি বাথানে পড়ে ধোনে॥
আহার নিদ্রা ত্যাগ করে কাঁদে উভরায়।

কোথা গেলে মাণিক জেন্দা ধরি তোমার পায় ॥
সাতদিন অনাহারে পড়িয়া রহিল।
স্বপনে দেয়ান তখন বুড়িকে কহিল ॥
গলায় কুড়লি বেঁধে দোরে দোরে মেগে।
হাজত আদায় কর জবন সব ডেকে ॥
নির্জলা দুধের ক্ষীর ঘি মাখন দই।
ভিক্ষা করে দিবি যাহা ঘরে ছিল নাই ॥
ঘট পুরে পানি থুবি আসনের সামনে।
সেই পানি হাড়ের উপর দিবে।
আল্লার হুকুমে সব বেঁচে যাবে ॥

পরিশিষ্ট (২)

সাময়িকী

।। ছাদপেটার গান ।।

(১)

চাঁদবদনী তুইলো আমার জীবন মরণ কাঠি,
তোরে না দেখিলে পরে মরিলো দম ফাটি।
তালুক মুলুক তুইলো আমার তুইলো ট্যাহার তোড়া।
নামাবলী তুইলো আমার তুইলো ভাঙ্গা বেড়া।
তুই যে আমার রসগোল্লা মণ্ডা মিঠাই ছানা,
শীতের কাঁথা তুই যে আমার রইদের মিছরীপানা।
বর্ষাকালে তুইলো আমার তালপাতার ছাতি,
তোরে না পাইলে ফরশা হয়লো আন্ধার রাতি।
তুই যে আমার পাঁজি-পুথি বেদ কোরাণের যুক্তি,
সাধন ভজন তুই যে আমার সাতপুরুষের মুক্তি।
ট্যাহা পয়সা দিয়া তোরে কইর‍্যা ছিলাম বিয়া,
বিনা খতে অইচি গোলাম গাঁইটের ট্যাহা দিয়া।
আমার কাছে আয়লো হেসে চাইনা আরও কিছু,
আমি লো তোর বান্দার বান্দা ওই চরণেব পিছু।

(২)

তুই আমার চান্দের কোণা (কণা)
আন্ধার কইর‍্যা কই গেলি লো
পাগল কইর‍্যা কই গেলিলো।
আইন্যা দিমু ঢাহাই শাড়ি,
পইর‍্যা যাবি বাড়ি বাড়ি,
তুই তাল্লাতে রাখব তোরে
খেড়ি ঘরে রাখবনা লো।

পরিশিষ্ট (ঙ)

অকস্মাৎ

।। বয়াতীর গান ।।

(১)

মোর খসম গেছে যুদ্ধে চলিয়া,
ওগো ননদী আমারে একলা ঘরে থুইয়্যা।
ও ননদীগো উড়ুয়া জাজে যুদ্ধ করে
জাপানে আসিয়া।
উপর তনে পড়ল বোমা হুকুম দারাম করিয়া
আমারে একলা ঘরে থুইয়্যা।
ননদীগো ঘরের পিছে সিয়াৎ বাইগুণ
জ্বইল্যা উঠে চিত্তের আগুন
বুঝাইলে মন বুঝ মানে না
ও মনে বুঝাই আমি কী দিয়া।
আমারে একেলা ঘরে থুইয়্যা॥

(২)

বসরার পোষ্ট অফিস অইল ছারা।
খসম আমার গেল গৈ ছাড়ি
লড়াইয়ের ডাক পাই ত্বরা॥
দিন গেল, মাসরে গেল, গেলরে বছব
আইলনারে খসমের মোর চিডির উত্তর।
অকালে পরিল ঠাডার কান্দের ভাইবোন দেশ পারা
হায়-হায়রে মাতা কান্দেন পিতারে কান্দেন,
কান্দে সোদর ভাই
বসরার কোনরে সন্ধান নাই।
মাইজ্যা ভাইয়ের বৌ-এ কান্দে
খুইল্যা ভাইয়ের বৌ-এ কান্দে
সোয়ামী আমার গেল মারা,
পোয়া কান্দের মাইয়্যা কান্দের
বাপজান তারার গেল মারা।

পরিশিষ্ট (ঘ)

॥ ছড়া ॥

(১)

আয়রে কাউয়া কা কা,
মণির দুধ খাইয়্যা যা।
মণি খায় দুধ ভাত,
তুই বইয়্যা পাতা চাট্।

(২)

ঘুম যারে ঘুম যারে ঘুমেব যাদুমণি।
ঘুমের থুন উঠ্‌লে যাদু কত খাইবা লনি॥
ঘুম যারে ঘুম যারে ঘুমের যাদুমণি।
ঘুম গেলে গডাইয়া দিমু সোনার যাদুমণি॥
ঘুম যারে চাতকীর বাছা ঘুম যাবে তুই।
ঘুমেব থুন উঠ্‌লে বাছা লনী দিমু মুই॥

(৩)

আবু আমার পক্ষীটি গো
কোন্ না বিলে চরে।
আবু কইয়্যা ডাক দিলে
উড্যা আইয়্যা পড়ে॥
আয় চাঁদ লৈড়্যা,
ভাত দিবাম বাইডা,
সোনার কপালে আমার
টুক্ দিয়া যারে।

(৪)

আইজ ঢুপীর অধিবাস, কাইল ঢুপীর বিয়া
ঢুপীরে যে নিতে আইছে সোনার পালকি নিয়া।
সোনার পালকি ভাইঙ্গা পড়ল খেওয়া ঘাটে গিয়া॥
পালকির তলে ঢোরা সাপ
ফাল্ (লাফ) দিয়া ওঠে বউয়ের বাপ।
বউয়ের বাপে তামুক খায়
নাক বরাবর ধোঁয়া যায়।
সেই ধোঁয়া কালা
বউয়ের বাপ শালা।

(৫)

যৈবনে ছিলাম আমি চম্পাফুলের সাজি
ভাল বাসত আমায় বড় নৌকার মাঝি।
এহন আমার বয়স হইয়্যাছে বছর চাইর কুড়ি,
এহন আমার গাইল পাড়ে বুড়া মাথারী।